মাতাল সমগ্র

তারাপদ রায়

মমতা প্রকাশনী
৯৯, পারমার রোড
ডাকঘর : ভদ্রকালী
জেলা : হুগলী

প্রকাশিকা :
শ্রীমতী মমতা দাঁ
মমতা প্রকাশনী
৯৯, পারমার রোড
ডাকঘর : ভদ্রকালী
জেলা : হুগলী

প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন, ১৩৬৪

প্রচ্ছদ চিত্রণ : শ্রীপূর্ণেন্দু পত্রী

মুদ্রক :
শ্রী সুরেন্দ্রনাথ দাস
বাণীরূপা প্রেস
৯ এ, মনোমোহন বসু স্ট্রীট
কলিকাতা—৬

মদ্যপ কুলচূড়ামণি

শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়

করকমলেষু

সূচি

মত্ত

একটা মামলার প্রয়োজনে একটা জেলা শহরে যেতে হয়েছিল। যথারীতি জেলা আদালতের উঠোনে এবং গেটের পাশে অনেকগুলি ভাতের হোটেল, পান-সিগারেট এবং মিষ্টির দোকান। এরই মধ্যে সবচেয়ে বড় মিষ্টির দোকানটায় গিয়ে দোকানের মালিককে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা এখানে সবচেয়ে বড় উকিল কে? আমি বাইরে থেকে এসেছি, একটু জানতে পারলে উপকার হয়।'

আমার জিজ্ঞাসা শুনে প্রবীণ মিষ্টান্ন বিক্রেতা কি যেন একটু ভেবে তারপর বললেন, 'সবচেয়ে ভাল উকিল?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ। আমার একটা মামলার ব্যাপারে বিশেষ দরকার।'

'সবচেয়ে ভাল উকিল হলেন বলাইবাবু, আমাদের এই জেলার মধ্যে,' তারপর ভদ্রলোক কিঞ্চিত ইতস্তত করে বললেন, 'অবশ্য তিনি যদি মাতাল অবস্থায় না থাকেন।'

আমি একটু চিন্তিত হলাম। 'মাতাল উকিল'! উকিলের আগে মাতাল বিশেষণটা খুব ভাল ঠেকছে না। সুতরাং আবার জিজ্ঞাসা করলাম, 'দু নম্বর ভাল উকিল কে?'

মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী বললেন, 'দু নম্বর ভাল উকিল হলেন ওই বলাইবাবুই, তিনি যখন মত্ত অবস্থায় থাকেন।'

বলা বাহুল্য ভদ্রলোকের এই ধাঁধা আমার পছন্দ হয়নি, আমি অন্য উকিলের খোঁজ করেছিলাম।

এই উকিলবাবু আদালতে মদ খেয়ে আসেন। জানি তাঁকে যদি প্রশ্ন করা হয়, 'আপনি এত মদ খান কেন?' তিনি বলবেন, 'আমি এত-শত মদ কিছু খাই না। আমি অল্প-অল্প খাই, বারবার খাই।'

সে যা হোক, আদালত নয়, বিদেশী এক শহরে দেখেছি পানশালার নাম 'অফিস' (The Office)। প্রথমে এই চমকপ্রদ নামকরণের ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি। পরে রহস্যটা বুঝেছিলাম, এই পানশালা থেকে যত দেরি করেই বাড়ি ফেরা যাক, মিথ্যে না বলে সত্যি কথাই বলা যাবে, 'অফিসে দেরি হয়ে গেল।'

মদ ও মদ্যপের গল্পের শেষ নেই। আগে অনেক বলেছি, পরে অনেক বলব।

আপাতত একটি অনুকাহিনী উপস্থাপন করছি।

এক পানশালায় তিনজন বাঁধা খাদ্দের। বেয়ারারা তাদের নাম দিয়েছে, বড়দা, মেজদা, ছোড়দা।

যথারীতি একদিন সন্ধ্যায় এই তিনজনে বসে পান করছিলেন। বড়দা একটু বেশি বেশি খাচ্ছিলেন। কিছুক্ষণ বাদে ডোজের মাত্রা বেশি হয়ে যাওয়ায় বড়দা বেহুঁশ হয়ে চেয়ার থেকে গড়িয়ে মেঝেতে পড়ে গেলেন।

মেজদা এবং ছোড়দার কিন্তু এতে ভ্রূক্ষেপ নেই, বরং বড়দার এই বেহুঁশ হয়ে পড়ে যাওয়ার ব্যাপারটা দুজনে খুব তারিফ করতে লাগলেন এই বলে যে, 'বড়দার একটা মাত্রাজ্ঞান আছে, ঠিক কখন থেমে যেতে হয় সেটা বড়দা জানেন।'

এইসময় এক আগন্তুক পানশালায় প্রবেশ করে ছোড়দা-মেজদার টেবিলের সামনে বসলেন। তাঁকে বেয়ারা এসে, 'কি দেব?' প্রশ্ন করার আগেই তিনি অধঃপতিত বড়দার দিকে আঙুল দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইনি কে?'

বেয়ারা বলল, 'ইনি বড়দা।'

আগন্তুক বড়দাকে খুব ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে তারপর প্রায় ষড়যন্ত্রকারীর মতো গলা নামিয়ে বেয়ারাকে বললেন, 'ওই বড়দাকে যা দিয়েছিলে, ভাই আমাকেও তাই দিয়ো।'

পুনশ্চ :

গঙ্গারাম, আমার পোষা চরিত্র, অবশেষে তার মাতলামির গল্পই বলি। রোববার সকালে অনেক বেলায় ঘুম থেকে উঠে হ্যাং-ওভারগ্রস্ত গঙ্গারাম বেশ কয়েকবার আড়মোড়া ভাঙার পর বৌকে জিজ্ঞাসা করল, 'হ্যাঁগো, কাল রাতে আমি বাড়ি ফেরার সময় কি কোন হইচই করেছি।'

'না তুমি করোনি।' গম্ভীর মুখে গঙ্গারামের বউ বলল, 'হইচই করার মতো অবস্থা তোমার ছিল না। তবে যারা তোমাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে তারপর চ্যাংদোলা করে, বাড়ির মধ্যে দিয়ে গেল তারা খুব হইচই করেছিল। পাড়ার সমস্ত লোক জেগে উঠেছিল।'

নৈশকাহিনী

আমার এই নৈশকাহিনী রাত্রির কোনো ঘটনা নিয়ে নয়। আমার এই কাহিনীর বিষয়বস্তু হলো নেশা।

আমার বিষয় অবশ্য ঠিক নেশা নয়, নেশার পরিমাপ নিয়ে এই আলোচনা। এক টিপ নস্যি, আড়াই প্যাকেট সিগারেট, তিন হেঁচকির জর্দা, সাত ছিলিম গাঁজা কিংবা চার পেগ হুইস্কি—একেক রকম নেশার সামগ্রীর মাপ হয় একেকভাবে—অন্তত এতকাল এই ছিলো আমার সাবেকি ধারণা।

আমার এই ধারণা গত রবিবার ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। যথারীতি রবিবার দিন বিকেলে হাঁটতে বেরিয়েছিলাম। ফেরার পথে, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে, হঠাৎ প্রায় বিনা নোটিশে প্রবল ঝড়-বৃষ্টি শুরু হলো। জায়গাটা জগুবাবুর বাজারের কাছাকাছি, চারদিকে পাতাল রেলের গর্ত, কাদা-জল, লোহা ইট। দৌড়নো দূরের কথা, এর মধ্যে তাড়াতাড়ি হাঁটাও বিপজ্জনক। একটু দূরেই ডি. এন. মিত্র স্কোয়ার, যা লোকমুখে বহুদিন হলো গাঁজা পার্ক বলে পরিচিত। স্কোয়ারটি কয়েক বছর হলো পাতাল রেলের দখলে, কিন্তু তার নাম বা নামকরণের কারণ এখনো বদলায় নি।

কোনো উপায় ছিল না। জলে ভিজে একেবারে চোপসানো অবস্থার স্কোয়ারের সামনের ছাদ-ঢাকা, বাঁশের বেড়া দেওয়া পুরনো ঘরটার চাতালে যথাসাধ্য ছুটে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। বৃষ্টি ও বাতাসের হাত থেকে সামান্য রক্ষা পাওয়া গেলো।

চাতালের এদিক-ওদিকে কয়েকটি চক্র বসেছে। আট-দশ জন করে একেকটি চক্র। নানা বয়েসের, নানা চেহারার অনেক রকম লোক, সকলেই ঘাস খাচ্ছেন। ঘাস মানে ইংরেজি গ্রাস, গ্রাস মানে গাঁজা। মদের আড্ডার সঙ্গে গাঁজার আড্ডার পার্থক্য হলো যে এখানে সকলেই নিঃশব্দ। নিঃশব্দে একজনের হাত থেকে অন্যের হাতে কলকে চলে যাচ্ছে, তিনি চার-পাঁচ টান দিয়ে পরের জনের হাতে তুলে দিচ্ছেন। রাস্তার মুচি, অফিসের বাবু, বাসের পকেটমার সকলে পাশাপাশি গোল হয়ে বসে। রসদ ফুরিয়ে

গেলে, সঙ্গে সঙ্গে সবাই পয়সা দিয়ে আবার পুরিয়া এনে কলকে ভরে নিচ্ছে। সকলেই শিবনেত্র, কেউ কেউ সম্পূর্ণ চোখ বুজে আত্মস্থ, শুধু সময়মতো হাত উঠে যাচ্ছে পার্শ্ববর্তীর কাছ থেকে কলকে গ্রহণের জন্য। বৃষ্টিভেজা বাতাস আমোদিত হয়ে উঠেছে গঞ্জিকাধূম্রের ঘন গন্ধে।

এখানে খুব বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে একা একাই নেশা হয়ে যাবে। অথচ বৃষ্টি আরো জোরে এসেছে এবং বাতাস অন্তত একশো কিলোমিটার বেগে বইছে। বাইরের ঝড়-বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচিয়ে এবং গঞ্জিকাচক্রের ধোঁয়া থেকে নাক বাঁচিয়ে একটা পাশে কোনোরকমে দাঁড়িয়ে ছিলাম, এমন সময়ে একটা ভদ্রলোক আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন।

একটু আগেই ভদ্রলোককে দেখেছি নিমীলিত নয়নে খুব আয়েসের সঙ্গে দুজন মাতাল রেলের মিস্ত্রীর মাঝখানে বসে ধূমপান উপভোগ করছিলেন। তাঁর বোধহয় নেশা করা শেষ হয়েছে, এবার বাড়ি ফিরবেন বলে উঠে এসেছেন।

বৃষ্টির মধ্যে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকলে যা হয়, একটু পরেই আমাদের মধ্যে আলাপ শুরু হলো। ভদ্রলোক নিজেই উপযাচক হয়ে আমার সঙ্গে আলাপ করলেন।

ভদ্রলোকের উপাধি ভুলে গেছি। যতদূর মনে পড়ছে নাম বলেছিলেন ভূপতি। ভূপতিবাবু মধ্যবয়সী, রোগা পাকাটে চেহারা। সামান্য ময়লা তাঁতের ধুতি ও আদ্দির পাঞ্জাবি গায়ে। দেখলেই বোঝা যায় উৎসব-অনুষ্ঠানে এঁরা পাঞ্জাবিতে গিলে করা থাকে এবং গলায় পাকানো চাদর থাকে। মোটামুটিভাবে কলকাতার আধা বনেদি পুরনো লোক। কথাবার্তায় প্রকাশ পেলো শ দেড়েক হাতে-টানা রিকশা ছিলো ভূপতিবাবুর এই দু-চার মাস আগেও। তার মধ্যে একটির মাত্র লাইসেন্স ছিলো। সেই একটি লাইসেন্সেই দেড়শোটি গাড়ি চলতো। এখন পুলিসের অত্যাচারে সত্তরটা রিকশা নিজেদের পুরনো বাড়ির উঠানে লুকিয়ে ফেলেছেন। গোটা তিরিশেক রিকশা ভবানীপুর আর বালিগঞ্জ থানায় ধরে নিয়ে গেছে। দিনকাল ভালো যাচ্ছে না, তাই সময় পেলেই দুঃখ-চিন্তা ভুলতে এখানে এসে এক ছিলিম গাঁজা টেনে যান।

কিছুক্ষণ কথাবার্তার পরে, বৃষ্টি তখন একটু ধরে এসেছে, হাওয়ার বেগও বেশ কম, ভূপতিবাবু রাস্তায় নামলেন, আমিও নামলাম। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, ভদ্রতার খাতিরে এমনি একটা প্রশ্ন, 'বাড়ি যাচ্ছেন?' ভূপতিবাবু একটু থেমে উত্তর দিলেন, 'এই সন্ধ্যাবেলা বাড়ি যাবে কি মশায়? ঐ গলির মধ্যে ময়রার দোকানে একটু দুধ খেতে যাচ্ছি। গাঁজার সঙ্গে দুধটা দরকার।' হঠাৎ ভূপতিবাবু কথা পালটিয়ে আমাকে বললেন, 'আপনি বোধহয় ভাবছেন ভদ্রলোক গাঁজা খায় কী করে?' আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'না না, সেকি কথা!' ভূপতিবাবু কিন্তু আমার দিকে এগিয়ে এলেন, বললেন, 'দেখুন মশায়, আমাকে ভুল বুঝবেন না। সব রকম নেশা-ভাং করে দেখেছি, অনেক মদ খেয়েছি, নামকরা মাতাল ছিলাম আমি, এই ভবানীপুরের সব ডাকসাইটে মাতালেরা আমাকে দেখে লুকিয়ে পড়তো। কিন্তু গাঁজা, গাঁজার সঙ্গে কারো তুলনা হয় না।'

ভর সন্ধ্যায়, বৃষ্টির মধ্যে গেঁজেলের পাল্লা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে ভদ্রতাসূচক

কি একটা মৃদু আপত্তি জানিয়ে আমি কেটে পড়ার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু ভূপতিবাবু ছাড়ার পাত্র নন। তিনি আমাকে চেপে ধরলেন, সত্যি সত্যি আমার হাত ধরে দাঁড়িয়ে পড়লেন, বললেন, 'কোন্ নেশা বড়, কোন্টা ছোট—এ নিয়ে যার যা ইচ্ছে বলে কিন্তু এ বিষয়ে আমি বিস্তর চিন্তা করেছি, মনে মনে অনেক গবেষণা করেছি, অবশেষে একটা বৈজ্ঞানিক হিসেব বের করেছি আর সেই হিসেবে গাঁজাই সর্বোত্তম।'

'আপনার এই বৈজ্ঞানিক হিসেবটা কী রকম?'

বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে ভূপতিবাবু বললেন, 'আরে মশায়, নেশা মাপতে হবে আঙুল দিয়ে।'

'আঙুল দিয়ে!' আমি একটু বিস্মিত হলাম, তারপর একটু ভেবে নিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ, মদ কিংবা সিদ্ধির সরবত আঙুল দিয়ে মাপা যেতে পারে। মদের বেলায় দু' আঙুলে এক পেগ, তিন আঙুলে দেড় পেগ, এ রকম হিসেব হতে পারে।'

আমাকে কথা শেষ করতে দিলেন না ভূপতিবাবু, উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'থামুন তো, খালি মদ আর মদ। আপনারা ফরসা জামা-কাপড়ওলা লোকেরা খালি মদের কথা বলেন। মদ তো পাঁচ-আঙুলে নেশা।'

আমি আকাশের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললাম, 'পাঁচ-আঙুলে নেশা আবার কী?'

'অশত্থতলার নেশা বুঝতে পারছেন না', ভূপতিবাবু এবার নিজের বিষয় পেয়ে গিয়ে আমাকে প্রাঞ্জলভাবে বোঝাতে লাগলেন, 'যত বেশি আঙুল তত বেশি উচ্চমানের নেশা। সবচেয়ে খারাপ নেশা হলো এক আঙুলের। দেখবেন ওড়িয়া পানের দোকানে পাওয়া যায়, কালো মতন খবরের কাগজে জড়িয়ে বেচে, গুড়াকু, আঙুলে লাগিয়ে দাঁত মাজতে হয়, এটা হলো সবচেয়ে নিকৃষ্ট নেশা।' একটু থেমে ভূপতিবাবু বললেন, 'এর চেয়ে খারাপ অবশ্য চা। মাত্র আধ আঙুলের ব্যাপার। একটা আঙুল অর্ধেক করে পেয়ালার হাতলে ঢুকিয়ে দিলেই হলো। তবে চা ঠিক নেশা নয়।' বলে ভূপতিবাবু আমার দিকে তাকিয়ে একটু শুকনো হাসলেন, বোধহয় ওঁর সন্দেহ হচ্ছিল আমি খুব চা-খোর, ওঁর বিশ্লেষণে দুঃখিত হতে পারি। কিন্তু তিনি আর আমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ব্যাখ্যা করে যেতে লাগলেন, 'এর পরেই আসে নস্যি, দু' আঙুলের নেশা। দু'আঙুল দিয়ে এক টিপ নাকে ঢোকানো, অতি বিশ্রী, নিচু নেশা মশায়। এর চেয়ে সিগারেট একটু ভালো। বিড়িও ঐ একই। দু' আঙুলে ধরে বুড়ো আঙুল অর্ধেক কাত করে মুখে দিয়ে টান, ঐ আড়াই আঙুলের নেশা খুব উঁচু জাতের নয়, তবে ফেলনাও নয়।'

ভূপতিবাবুর এই বিশ্লেষণ কখন শেষ হবে কে জানে, এদিকে আবার বৃষ্টি এসে গেলো মনে হচ্ছে অথচ শুনতেও খারাপ লাগছে না, এরকম আগে আর কখনো শুনিনি তো। ভূপতিবাবু সামান্য বিরতি দিয়ে আবার শুরু করে দিয়েছেন, 'এর মধ্যে আরো অনেক রকম নেশা আছে সে সব বাদ দিচ্ছি। আপনি মদের কথা বলছিলেন, মদ হলো পাঁচ-আঙুলে নেশা। পাঁচ আঙুলে গেলাস ধরে মুখে তুলতে হবে। সোজা, বোতল

থেকে গলায় ঢেলে খেলেও ঐ পাঁচ আঙুল। সিদ্ধির সরবতও অবশ্য তাই। দুটোই ভালো জাতের নেশা। তবে গাঁজার কাছে কিছু নয়।' এই বলে দুটো হাত জোড় করে একটি কাল্পনিক কলকে মুখের কাছে ধরে দুবার জোরে জোরে টান দিয়ে বললেন, 'একেবারে পুরো দশ আঙুলের নেশা। দু' হাতের দশ আঙুলে কলকে ধরতে হবে। এর চেয়ে বড় নেশা হয় না।'

বৃষ্টি প্রায় এসে গেলো আবার, চলে আসছিলাম, ভূপতিবাবু হাতের মুঠোটা দিয়ে আমার কবজিটা শক্ত করে ধরে বললেন, 'শেষ কথাটা শুনে যান, কুড়ি আঙুলের নেশা, সেও ঐ গাঁজাই। কাটিহারের মেলায় গেলে দেখবেন, অশত্থতলায় দারুণ ভিড়, ছিলিম মহারাজ গাঁজা খাচ্ছেন। দুই হাতে এক কলকে, দুই পায়ে এক কলকে। দুই হাত, দুই পা, দুই কলকে এসে গেছে মুখে, বৃশ্চিকাসনে গঞ্জিকা সেবন করছেন ছিলিম মহারাজ, দুই কলকে দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া বেরোচ্ছে।'

এতক্ষণে প্রচণ্ড বৃষ্টি এসে গেছে। ভূপতিবাবুর হাত এক ঝাঁকুনি দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে আবার ভিজতে ভিজতে বাড়ির দিকে এগোলাম।

মকারান্ত

এক. লুজ ক্যারেকটার

আমার নিন্দুকেরা অবশ্যই এই ভেবে খুশি হবেন যে তারাপদ এতদিনে উপযুক্ত বিষয় পেয়েছেন। তা তাঁরা যাই বলুন আমি লুজ ক্যারেকটার দিয়েই শুরু করছি। 'লুজ ক্যারেকটার' শব্দটি খাঁটি বাংলা শব্দ। এ প্রসঙ্গে পরে আসছি। তার আগে বলে রাখি ইংরেজি 'Character' এবং বাংলা 'চরিত্র' শব্দ দুটি এক নয়, দুইয়ের মধ্যে অতিশয় সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে।

সে যা হোক। আমাদের বিষয় চরিত্র নয়, চরিত্র-দোষ। বাংলা অভিধানে, রাজশেখর বসুর চলন্তিকায় চরিত্রদোষের অর্থ দেওয়া আছে, 'লাম্পট্য, সুরাসক্তি।'

আমার এই ক্ষুদ্র রম্য নিবন্ধে এই দুটো বিষয়েই মনোনিবেশ করব। প্রথমে লাম্পট্য এবং সেই সূত্রে এই খণ্ড অধ্যায়ের নামকরণ হয়েছে লুজ ক্যারেকটার বা স্খলিত চরিত্র।

শ্রীযুক্ত তপন সিংহ পরিচালিত 'বাঞ্ছারামের বাগান' চলচ্চিত্রটি যাঁরা কখনও দেখেছেন, তাঁদের কাছে 'লুজ ক্যারেকটার' শব্দটির অর্থ ব্যাখ্যা করার মানে হয় না। ওই সিনেমায় অভিনেতা দীপঙ্কর দে এক বৃদ্ধের ভূমিকায় ছিলেন, তিনি তাঁর নিজস্ব অননুকরণীয় ভঙ্গিতে কাউকে গালাগাল দেওয়ার জন্য 'লুজ ক্যারেকটার' বলে অভিহিত করতেন। লুজের উচ্চারণ ছিল, 'লূ উ-উ-জ্'।

তা এই সব লুজ ক্যারেকটার বা লম্পট চরিত্রের লোকেদের আমরা সবাই মোটামুটি অল্প-বিস্তর চিনি। আমার আপনার মতোই এঁরাও সংসারে বেশ বহাল তবিয়তে রয়েছেন। এঁরা সাধারণত ফিটফাট থাকেন। এঁরা সর্বদাই হাসিমুখ। ঘাড়ে পাউডার, চুলে টেরিকাটা, রুমালে সুরভি। এঁরা রমণী-মোহন। ওঁদেরই জন্য শাস্ত্রে উপদেশবাক্য রচিত হয়েছিল, 'পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ দেখবে।'

এই সব 'লুজ ক্যারেকটার' বা লম্পট বিষয়ে বিশেষ কিছু লিখবার অধিকার বা যোগ্যতা আমার নেই। বহুকাল আগে 'দেশ' পত্রিকায় 'বিদ্যাবুদ্ধি'তে লাম্পট্য নিয়ে কিঞ্চিত অনধিকার চর্চা করেছিলাম।

সে-ও করেছিলাম বিলিতি বই টুকে। আমাদের দেশে এরকম গুরুতর বিষয় নিয়ে মজার গল্প হয় না। লাম্পট্য নিয়ে মজা করতে গেলে সবাই ছি ছি করবে।

এই সব কাহিনীমালার নায়ক ছিলেন সেই ভদ্রলোক, যিনি বাঁকাচোখে নিজের বিবাহিত স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলতেন, 'মাইরি বলছি, তোমাকে আজ যা দেখাচ্ছে না, একেবারে পরস্ত্রীর মতো।

এই ভদ্রলোক সম্পর্কে অন্য একটি গল্পে দেখা যায় যে তাঁর সেই পরস্ত্রীর মতো সুন্দরী স্ত্রী তাঁর এক বান্ধবীর কাছে স্বামীর ব্যাপারে অভিযোগ করছেন।

ভদ্রমহিলার সঙ্গে একদিন সন্ধ্যাবেলা তাঁর এক পুরনো বান্ধবী দেখা করতে এসেছেন। বলা বাহুল্য, ভদ্রমহিলার পতিদেবতা তখন বাসায় নেই। বান্ধবী ভদ্রলোকের কথা জিজ্ঞাসা করাতে স্ত্রী বললেন, 'ও কোনদিনই সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরে না। ফিরতে অনেক রাত হয়ে যায়। কোথায় যে যায়? কী যে করে? আমি খুবই চিন্তায় থাকি।'

এ পর্যন্ত শুনে অভিজ্ঞা বান্ধবী বললেন, 'কোথায় যায়, কী করে—ওসব না জানাই ভাল। জানতে পারলে আরও বেশি চিন্তায় থাকবে।'

কোন বিবাহিত ব্যক্তির চরিত্রদোষ হলে তা তিনি যতই বুদ্ধিমান হোন, যতই কায়দা-কানুন করুন শেষ পর্যন্ত তাঁর স্ত্রী সেটা ধরে ফেলবেন।

মিস্টার চৌধুরী গত কয়েক মাস ধরে অত্যন্ত সংগোপনে এবং সযতনে অফিসে তাঁর সহকর্মিনীর সঙ্গে প্রবল প্রেমলীলা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সুবোধ বালকের মতো দৈনিক যথাসময়ে বাড়ি ফিরতেন যাতে তাঁর স্ত্রী কোনরকম সন্দেহ না করেন।

এবং তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে মিসেস চৌধুরী কিছু টের পাচ্ছেন না।

কিন্তু গোলমাল হল মিস্টার চৌধুরীর জন্মদিনে। সেদিন মিসেস চৌধুরী এক বোতল একটি বহু বিজ্ঞাপিত চুল পড়ে যাওয়ার ওষুধ স্বামীকে উপহার দিলেন।

মিস্টার চৌধুরী মধ্যযৌবনে পৌঁছেছেন কিন্তু এখনও তাঁর ঘনকৃষ্ণ কেশ, ব্যাকব্রাশ করলে মাথায় ঢেউ খেলে যায়। তিনি জন্মদিনে স্ত্রীর কাছ থেকে এই উপহার পেয়ে কিঞ্চিত বিস্মিত হয়ে স্ত্রীকে বললেন, 'এটা কী দিলে আমাকে? আমার কি চুল উঠছে?'

'তোমার উঠছে না,' মিসেস চৌধুরী খুব গম্ভীরভাবে বললেন, 'কিন্তু তোমার প্রেমিকার খুব চুল উঠছে। রোজই তোমার কোটে লেগে থাকে। আমাকে বুরুশ করে পরিষ্কার করতে হয়।'

এর পরের গল্পটি নিতান্ত ঘরোয়া।

একটি শিশুর জন্য গৃহশিক্ষিকা নিযুক্ত হয়েছে। নবযুবতী এক মহিলা বাসায় শিশুটিকে পড়াতে আসেন। তখন বাসায় শিশুটি এবং একটি কাজের মেয়ে ছাড়া আর প্রায় কেউই থাকে না।

এর মধ্যে একদিন শিক্ষিকা পড়াতে এসেছেন সেদিন শিশুটির বাবা-মা দুজনেই বাসায় রয়েছেন, কী যেন একটা ছুটির দিন ছিল সেটা।

সে যা হোক, সেদিন শিক্ষিকা যখন পড়ানো শেষ করে চলে যাচ্ছেন, তখন শিশুটির মা দাঁড়িয়ে। মাতৃদেবী শিশুকে বললেন, 'দিদিমণিকে টা-টা বাই-বাই কর। দিদিমণিকে একটা চুমো খাও।'

অত্যন্ত নিস্পৃহভাবে 'টা-টা বাই-বাই' করে শিশুটি বলল, 'আমি কিন্তু কিছুতেই দিদিমণিকে চুমু খাব না।'

মা অবাক, 'সে কী? কেন?'

শিশুটি বলল, 'চুমু খেলে দিদিমণি আমাকে চড় মারবে।'

মা বললেন, 'ছি! ছি! চুমু খেলে দিদিমণি চড় মারবে কেন?'

শিশু জানাল, 'একটু আগে বাবা দিদিমণিকে চুমু খেয়েছিল। বাবাকে দিদিমণি একটা চড় মেরেছে।'

লাম্পট্য অবশ্য সদাসর্বদাই একতরফা বা পুরুষালি ব্যাপার নয়। এক হাতে তালি বাজে না। মহিলারাও চরিত্রদোষে ভোগেন।

এক ভদ্রমহিলাকে একদিন তাঁর স্বামী একদিন দিনদুপুরে নিজের বাড়িতে শয়নঘরের মধ্যে এক ব্যক্তির সঙ্গে আপত্তিকর, অশালীন অবস্থায় ধরে ফেলেন।

হইহই কাণ্ড! ফাটাফাটি ব্যাপার!

ঘটনাটা শেষপর্যন্ত থানা পুলিশ পর্যন্ত গড়াল। প্রবীণ বিচক্ষণ দারোগাবাবু সব ঘটনা শুনে তারপর ভদ্রমহিলাকে বললেন, 'আপনি তাহলে আপনার স্বামীকে ঠকাচ্ছিলেন?'

ভদ্রমহিলা ফোঁস করে উঠলেন, 'আমি ঠকাচ্ছিলাম? আমার বরই আমাকে ঠকিয়েছে।'

দারোগাবাবু বললেন, 'সে আবার কী ব্যাপার?'

ভদ্রমহিলা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন, 'ও আমার বেরনোর সময়ে বলে গিয়েছিল, ফিরতে রাত হবে। দুপুরের মধ্যেই ফিরে এসে আমাকে জব্দ করল। ওই তো ঠকাল। আমি আর কী ঠকালাম।'

এরকম সব গোলমেলে গল্প বেশি না বলাই বোধহয় উচিত। শুধু আরেকটি এবং সেটি পুরনো গল্প।

সকালের খবরের কাগজে একটি রোমহর্ষক সংবাদ বেরিয়েছে। চা খেতে খেতে সংবাদটা পড়ে বিনতা শিউরে উঠল, 'কী সাংঘাতিক ব্যাপার।'

তার রুমমেট সুরমা এই শুনে কাগজটা হাতে নিয়ে সংবাদটা পড়ে খুব গম্ভীরভাবে বলল, 'ব্যাপারটা আরও সাংঘাতিক হতে পারত।'

এই শুনে বিনতা বলল, 'আর কী সাংঘাতিক হবে? ফিল্‌মস্টার ভুবনমোহন এক মহিলার সঙ্গে একটি হোটেলকক্ষে ছিলেন, এমন সময় দরজায় করাঘাত। ভুবনমোহন উঠে দরজা খুলে দিতেই ভুবনমোহনের স্ত্রী বিউটিরানি দেবী ঘরের মধ্যে অতর্কিতে প্রবেশ করে ভুবনমোহনের সঙ্গিনীকে রিভলভার দিয়ে ছয়টি গুলি করে ঝাঁঝরা করে দেন। সঙ্গে সঙ্গে মহিলার মৃত্যু হয়।'

সংবাদপত্রের খবরটি সংক্ষিপ্ত করে বলে বিনতা আবার বলল, 'আর কী সাংঘাতিক হবে?'

সুরমা বলল, 'গতকাল ভুবনমোহনের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল আমার। মাথা ধরেছে বলে যেতে পারিনি। গেলে ওই হোটেলের ঘরে আমিই বিউটিরানির রিভলভারের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যেতাম।'

শুনে বিনতা বলল, 'সর্বনাশ!'

তখন সুরমা বলল, 'তাহলে বল, ব্যাপারটা আরও সাংঘাতিক হতে পারত।'

দুই. পানাসক্তি

'যদ্যপি আমার গুরু
শুঁড়ি বাড়ি যায়,
তদ্যপি আমার গুরু
নিত্যানন্দ রায়।'

লম্পটের পরে আমাদের দ্বিতীয়াংশ মদ্যপ নিয়ে।

কথায় আছে, 'মাতালের সাক্ষী শুঁড়ি।' শুঁড়ি হল মদ বিক্রেতা। শুঁড়িবড়িতে লোকে মদ খেতে যায়।

এ নিয়ে আলোচনার আগে একটা জিনিস স্পষ্ট করা দরকার। লম্পট আর মদ্যপ, এক জিনিস নয়। বহু লম্পট আছে যারা সুরা স্পর্শ করে না। আবার প্রকৃত মদ্যপের লাম্পট্য আসক্তি নেই। যে মদ খায় সে শুধুই মদ খায় আর মদ তাকে খায়, তার

আর কিছুই করার থাকে না। তবে এমন অনেক লোক আছে, যারা কিছু পরিমাণ মদ্যপান করে খুন-ডাকাতি করতে যায়, বলাৎকারের চেষ্টা করে কিংবা বলাৎকার করেই ফেলে, তাদের কথা আলাদা।

এদিকে লম্পটের মদ্যপ হলে বিপদ। তাকে ভেবেচিন্তে, মেপে চলতে হয়। তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাকে নানারকম অভিনয় করতে হয়, মুখোশ পরতে হয়।

মাতালের মুখোশ নেই। সে অভিনয় করতেও অপারগ। তার পক্ষে রমণীর মন জয় করা কঠিন। তবে কখনও কখনও দেখা যায় (মদ্যপের প্রতি সহানুভূতি চিন্তা) অনুকম্পাবশত অনেক মহিলা কোন কোন মাতালের জন্য দুর্বলতা পোষণ করেন, অবশ্য সেই মদ্যপ যদি কোন কবি বা শিল্পী কিংবা বখে যাওয়া প্রতিভা হয়।

এসব তত্ত্বকথা, কচকচি মোটেই সুবিধের নয়। বরং এবার মাতালের গল্পে চলে যাই।

তবে এখানে আমার একটা বিশেষ অসুবিধে আছে। মদ ও মাতাল নিয়ে আমি এযাবৎকাল এত বেশি গল্পকথা লিখেছি যে পাঠক-পাঠিকাদের সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক—গল্পগুলো নতুন তো? নাকি নতুন বোতলে পুরনো মদ।

সত্যি কথা এই যে, শুধু মদ আর মাতাল নয়, যে-কোন বিষয়েই নতুন গল্প পাওয়া কঠিন। তবু এরপরে যে গল্পগুলি পাঠকের দরবারে পেশ করছি তার একাধিক গল্প টাটকা এবং আনকোরা।

প্রথম গল্পটি আজ থেকে চল্লিশ বছর আগের, এ গল্পটি জ্ঞানত অদ্যাবধি কোথাও লিখিনি।

মধ্য কলকাতায় পুরনো জানবাজার অঞ্চলে একদা বারদোয়ারি নামে একটি দিশি মদের পানশালা অর্থাৎ শুঁড়িখানা ছিল। হয়ত এখনও আছে, বাজার-ভাঁটিখানা-মেলা-বেশ্যাপাড়া-ধর্মস্থান এগুলো সহজে অবলুপ্ত হয় না। উঠে গেলেও আশেপাশে টিকে থাকে।

সে যা হোক, নবীন যৌবনে বন্ধুবান্ধব সহযোগে কখনও কখনও ওই বারদোয়ারিতে যেতাম। সেখানে এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। সুধামাধববাবু। মিলের ধুতি আর নীল ফুল শার্ট, নেহাত ছাপোষা গৃহস্থ। তিনি বেলঘরিয়া থেকে এই বারদোয়ারিতে আসতেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'এত দূর আসেন?' তিনি বলেছিলেন, 'পাঁইটে চার আনা সস্তা হয়।' এরপরে যখন আমি বললাম, 'যাতায়াত খরচা তো আছে।' সুধামাধববাবু বলেছিলেন, 'যাতায়াত খরচা হিসাব করে যতক্ষণ পর্যন্ত মদের দামে উশুল না হয় খেয়ে যাই। ঠকবার লোক আমি নই।'

এরকম যুক্তি মাতালের পক্ষেই সম্ভব।

এই মাতালই ড্রেনে পড়ে গেলে পুলিশকে বলে, 'এখন আর আমি তোমার এলাকায় নই, যাও জলপুলিশ ডেকে আন।'

এই রকম এক মাতাল রাস্তায় ভিক্ষে করছিল। তাকে এক পথচারী জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভিক্ষে করছ কেন?' সে জবাব দিল, 'মদ খাওয়ার জন্য।' এরপর আবার প্রশ্ন, 'মদ খাবে কেন?' জবাব, 'ভিক্ষে করার সাহস সঞ্চয় করার জন্য।'

অবশেষে পানাসক্তি এবং ল্যাম্পট্যের একটি যুগ্ম গল্প বলি। দুঃখের বিষয় গল্পটি পুরনো, কিন্তু অসামান্য।

গভীর রাতে মত্তাবস্থায় অনিমেষবাবু বাড়ি ফিরছিলেন। বাড়ির সদর দরজায় চাবিটা লাগানোর চেষ্টা করছেন, এমন সময় পুলিশের জমাদার তাঁকে ধরে।

জমাদারকে দেখে অনিমেষবাবু তাঁকে বাড়িটা একটু শক্ত করে ধরতে বলেন কারণ বাড়িটা এত কাঁপছে যে তিনি চাবি লাগাতে পারছেন না।

জমাদার সাহেব অনিমেষবাবুর অনুরোধ উপেক্ষা করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'এত রাতে এখানে কী হচ্ছে?'

অনিমেষবাবু বলেন, 'এটাই আমার বাড়ি। আমি বাড়ির মধ্যে যাওয়ার চেষ্টা করছি।'

ঘুঘু জমাদার সাহেব কোন কথা সহজে বিশ্বাস করেন না, তিনি অনিমেষবাবুকে বললেন, 'চলুন আপনাকে ভেতরে দিয়ে আসি।' টলটলায়মান অনিমেষবাবুকে বললেন, ধরে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে জমাদার সাহেব দেখলেন ঘরের মধ্যে বিছানায় এক মহিলা এক ব্যক্তিকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছেন। সেই দৃশ্য দেখে নিশ্চিত হয়ে অনিমেষবাবু বললেন, 'এবার বুঝছেন তো এটা আমার বাড়ি। ওই বিছানায় শুয়ে আছেন আমার মিসেস, আর যাকে জড়িয়ে ধরে আছেন সে হলাম আমি।

ইঁদুর ও মদিরা

চঞ্চলা পাঠিকা, এরকম অপ্রকৃত এবং খটমটে শিরোনাম দেখে চট করে পাতা উলটিয়ে দিয়ো না। আসলে এই রচনার নাম অনায়াসেই দেওয়া যেতো সুরা ও রমণী অথবা নারী ও মদিরা। কিন্তু অনিবার্য কারণে এবং একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে ইঁদুর বাদ দিয়ে নামকরণ করা গেলো না।

তবু ইঁদুরের রহস্যে প্রবেশ করার আগে ভদ্রতাবশত দু-একটা মদিরার গল্প বলে নিই।

প্রথমে গল্পটি শুনেছিলাম শ্রীযুক্ত হিমানীশ গোস্বামীর কাছে, পরে অবশ্য সেটা আমি অন্যত্র পাঠ করেছি। নার্সিংহোমে হাত-পা ভেঙে এক ভদ্রলোক শয্যায় শায়িত। আগের দিন রাতে কি এক অজ্ঞাত কারণে ভদ্রলোক দোতলা থেকে লাফিয়ে পড়েছিলেন এবং তারই ফলে এই অবস্থা। বিকালের দিকে এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু দেখা করতে এলেন আহত ব্যক্তির সঙ্গে। 'কাল আমার কি হয়েছিল বল তো?' আহত ব্যক্তি বন্ধুকে প্রশ্ন করলেন। বন্ধুটি বললেন, 'আর বলিস না, সাংঘাতিক ব্যাপার। সেই যে আমরা তোর জন্মদিন উপলক্ষে তোদের গাড়িবারান্দার ছাদে বসে সন্ধ্যারাত থেকে কয়েকজনে মিলে কয়েক বোতল মদ খেলাম।' আহত ব্যক্তি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'আরে, সে পর্যন্ত আমার মনে আছে। কিন্তু তারপর পড়লাম কী করে? কোথায় পড়লাম?'

বন্ধুটি বললেন, 'তুই তো নিজে থেকে নিজের দোষে পড়লি। রাত বারোটার সময় তুই বললি যে আমি এবার পাখির মতো উড়তে পারবো। এই জন্মদিন থেকে ভগবান আমার একটা নতুন ক্ষমতা দিয়েছেন, আজ থেকে আমি ইচ্ছে করলেই পাখির মত উড়তে পারবো।' আহত ব্যক্তির কিছুই মনে নেই, সে চোখ গোল-গোল করে বললো, 'সর্বনাশ! তারপর?'

'তারপর আর কী?' বন্ধুটি বললেন, 'তুই উড়তে পারবি শোনামাত্র মানিক আর

বলাই বাজি রাখলো যে, তুই কিছুতেই উড়তে পারবি না, কোনো মানুষ কখনো উড়তে পারে না। এই শুনে তুই ক্ষেপে গেলি। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি বারান্দার কার্নিসে উঠে দুই দিকে দুই হাত ছড়িয়ে পাখির মত উড়তে গিয়ে নিচে ধপাস করে পড়ে গেলি।'

আহত ব্যক্তি অনেকক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে রইলেন, 'তারপর ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, 'কিন্তু তুই তো ছিলি সেখানে। তুই তো আমাকে বাধা দিতে পারতিস।' বন্ধুটি অধোবদনে স্বীকারোক্তি করলেন, 'কি আর বলবো, আমি তো নিজেও ভেবেছিলাম যে তুই নিশ্চয় উড়তে পারবি তোর ওড়ার উপরে আমিও তো পঞ্চাশ টাকা বাজি রেখেছিলাম।'

দ্বিতীয় গল্পটি আমাকে বলেছিলেন এক পুলিশের দারোগা। দারোগা সাহেব একদিন রাত বারোটার সময় থানায় ফোন পেলেন, এক খ্যাতনামা অভিনেতা (নাম বলা উচিত হবে না) তাঁকে ফোন করছেন, 'আমার গাড়ি রাস্তায় রেখে আমি একটু অমুক-হোটেলে গিয়েছিলাম। এখন সেই হোটেল থেকেই ফোন করছি। ভীষণ ব্যাপার হয়েছে।'

দারোগা সাহেব ভাবলেন, গাড়ি নিশ্চয় চুরি হয়েছে। হামেশাই হয়। সুতরাং জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার গাড়িটা রাস্তায় নেই?' অভিনেতা বললেন, 'আরে গাড়ি না থাকলে তবু অন্য কথা ছিলো। গাড়িটা আছে কিন্তু স্টিয়ারিং-হুইল, ড্যাস বোর্ড, ব্রেক পেডাল এমন কি সামনের কাচটা পর্যন্ত নেই।'

দারোগা সাহেব তাঁর চাকুরি জীবনে অনেক রকম চুরির কথা শুনেছেন, এটা একটু বেশি অভিনব বলে মনে হ'লো তাঁর, তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, আপনি ওখানে থাকুন আমি আসছি।' কিন্তু দারোগা সাহেবকে যেতে হলো না, তিনি বেরোতে যাচ্ছেন এমন সময় বিখ্যাত অভিনেতা টলতে টলতে থানার মধ্যে ঢুকলেন, 'দারোগাবাবু কিছু মনে করবেন না। আপনাকে অযথা বিরক্ত করছি। আমার গাড়ির সব কিছু ঠিকঠাক আছে, কিছুই চুরি যায়নি। ভুল করে পিছনের সিটে গিয়ে বসেছিলাম, তাই ওরকম মনে হয়েছিলো। ফোন করে ফিরে এসে সামনের সিটে বসতেই সব ঠিকঠাক হয়ে গেলো।'

মদের এই প্রভাব এ কি শুধু মানুষদের ওপর? অন্য জীবজন্তুর সঙ্গে মদের কি সম্পর্ক? ঘোড়াকে রাম খাওয়ালে বেশি ছোটে এতো পুরনো কথা। মদ খেলে কুকুরও মাতাল হয় এ আমার স্বচক্ষে দেখা। একবার আমার একটা কুকুর রাস্তায় গাড়ি চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে যায়, বিশেষ চোট লাগেনি কিন্তু মৃত্যুভয়ে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলো। সামনের বাড়ির এক ভদ্রলোক দয়াপরবশ হয়ে তাকে নিজের বরাদ্দ থেকে দু আউন্স হুইস্কি চামচে করে খাইয়ে দিয়েছিলেন। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কুকুরটি চাঙ্গা হয়ে উঠলো এবং রাস্তায় ছুটে গিয়ে সমস্ত গাড়িকে তাড়া করতে লাগলো। সেদিন বহু কষ্টে তাকে দ্বিতীয়বার চাপা পড়ার হাত থেকে আমরা রক্ষা করতে পেরেছিলাম।

কুকুর বা ঘোড়া নয়, সামান্য ইঁদুরের ওপর মদ নিয়ে গবেষণা করেছেন এক মার্কিন

মনস্তত্ত্ববিদ, প্রোফেসর গেলর্ড এলিসন। এলিসন সাহেবের গবেষণা কোনো ভুয়ো বা ফাঁকা ব্যাপার নয়। এই গবেষণার ফলশ্রুতি নিউ ইয়র্ক টাইমসের মত সংবাদপত্রে বিশদভাবে বেরিয়েছে।

এলিসন সাহেব দেখতে পেয়েছেন যে যদি মদ ঠিকমত সরবরাহ করা হয় তবুও ইঁদুরের মধ্যে কিছু সংখ্যক কখনোই মদ খাবে না। বাকি কিছু সংখ্যক অল্পস্বল্প মদ খাবে। আর অল্প কিছু ইঁদুর যাকে বলে অ্যালকলহিক অর্থাৎ পুরোপুরি মদ্যপ তৈরি হবে। এর একটা হিসেবও দিয়েছেন অধ্যাপক এলিসন, শতকরা দশ ভাগ মদ্যপ, শতকরা পঁচিশ ভাগ মদ স্পর্শ করে না, বাকিরা সময়-সুবিধামত পরিমিত পান করে, সবচেয়ে মজার কথা, মানুষের সমাজেও মদ্যাসক্তির ভাগাভাগিটা প্রায় একই রকম।

পরিমিত মদ্যপায়ী ইঁদুরেরা সাধারণত পান আরম্ভ করে নৈশাহারের দু ঘণ্টা আগে। নৈশাহারের পরে তারা জল ছাড়া কোনো পানীয় খায় না। অবশ্য ঠিক ঘুমুতে যাওয়ার আগে তারা কেউ কেউ আরেকটু মদ খায়।

সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার মদ্যপ ইঁদুরদের নিয়ে। তাদের স্বভাব-চরিত্র আচার-আচরণ ঠিক মদ্যপ মানুষদের মতই। এই অ্যালকলহিক ইঁদুরেরা সকাল থেকেই মদ্যপান শুরু করে, যত দিন গড়াতে থাকে, তারাও মদ খেয়ে যায়। এরা অধিকাংশই খুব আলসে, এদের ঘুম ভালো হয় না। তার চেয়ে বড় কথা অন্য ইঁদুরেরা এদের মোটেই সম্মান বা গ্রাহ্য করে না। যে সব ইঁদুর মদ খায় না বা পরিমিত মদ্যপান করে ইঁদুর সমাজে তাদের বেশ সম্ভ্রমের সঙ্গে দেখা হয়।

ইঁদুরের কথা আর নয়, মানুষের কথায় আসি। আরম্ভে সুরা ও রমণীর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, সেখানেই আসছি।

ওমর খৈয়াম এক স্বপ্নসম্ভব পুষ্পকুঞ্জের কথা বলেছিলেন সেখানে খাদ্য ও কাজ, সাকী ও সুরা সবই ছিলো। দুঃখের বিষয় এ নিতান্তই পদ্যের পৃথিবী, মানুষের জীবনে এসব একসঙ্গে জোটে না।

এক বিদেশী পানশালার কথা মনে পড়ছে। সেখানে এক বেআক্কেলে মদ্যপের সঙ্গে আমার ক্ষীণ পরিচয় হয়েছিল। একদিন দেখি সে শুকনো মুখে বসে আছে। আমি সহানুভূতি দেখাতে তার পাশে গিয়ে বসলাম, 'কি হলো, কি হয়েছে' জানতে চাইলাম। সে যা বললো সাংঘাতিক, আগের রাতে একজনের কাছে এক বোতল হুইস্কির জন্য তার বউকে বেচে দিয়েছে। আমি তখন বললাম, 'তা হলে এখন বউয়ের জন্য অনুশোচনা হচ্ছে।' সে বললো, 'তা হচ্ছে। বউ না থাকায় আজ খুব কষ্ট হবে, আজ মদ খাবো কি বেচে?'

দ্বিতীয় গল্পের নায়কের দেখা পেয়েছিলাম এই শহরেরই এক ক্লাবে। সেও শুকনো মুখে বসেছিলো। জিজ্ঞাসা করাতে বললো, বউয়ের সঙ্গে গোলমাল চলছে। আমি বললাম, 'তা, ব্যাপারটা কি?' সে বললো, 'বউ বলেছে তিরিশ দিন আমার সঙ্গে কথা বলবে না।' আমি বললাম, 'তা হলে তোমার ভালোই তো হলো।' 'ভালোই তো হয়েছিলো', সে গেলাসে একটি দীর্ঘ চুমুক দিয়ে দীর্ঘতর নিঃশ্বাস ছাড়লো, 'আজকেই

মাস শেষ হয়ে গেলো, আজকেই তিরিশ দিনের শেষ দিন।'

মদিরা কথামালার আপাতত শেষ গল্পটি অবশ্যই ইঁদুরকে নিয়ে। একটি ইঁদুর একটি বিড়ালকে নিয়ে একটি হোটেলে গেছে। সেখানে ইঁদুরটি পরিমিত এবং বিড়ালটি আকণ্ঠ মদ্যপান করছে। যখন নেশাগ্রস্ত বিড়ালটি এলিয়ে পড়েছে, তখন ইঁদুরটি বেয়ারাকে ডেকে নিজের জন্য এক প্লেট কড়াইশুঁটির অর্ডার দিলো। বেয়ারাটি ভদ্রতা করে জিজ্ঞাসা করলো, 'আপনার বন্ধু মিস্টার ক্যাট কিছু খাবেন না, ওঁর খিদে পায়নি?' ইঁদুরটি বেয়ারাকে থামিয়ে দিয়ে বললো, 'ওঁকে নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না, মিস্টার ক্যাটের খিদে পেলে আমি কি আর এখানে থাকবো?'
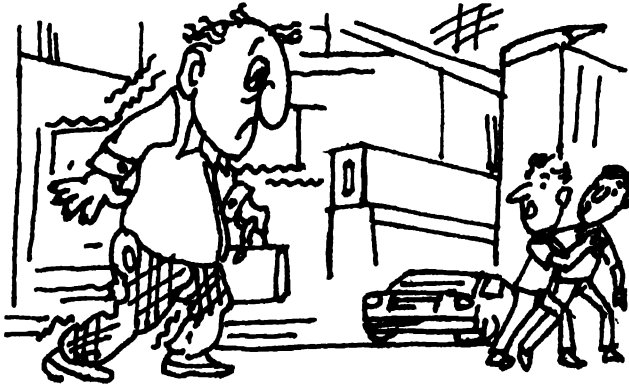
মদমত্ত

মদ যে খায় এবং মদ যে খায় না উভয়েরই মদের গল্পের প্রতি আসক্তি অতি প্রবল এবং সকলেরই জানা আছে অন্তত একটি না একটি কাহিনী যেটা তাদের ধারণা মাতাল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ গল্প।

একটা খুব ভালো কাহিনী আমাকে শুনিয়েছেন এক প্রবীণ, সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক, অবসরপ্রাপ্ত বিচারক। তাঁর আদালতে অনেকদিন আগে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোককে তিনি পেয়েছিলেন। আগের দিন রাতে রাস্তায় মদ খেয়ে মাতলামি করার দোষে পেটি কেসে পুলিস পরদিন সকালে আদালতে চালান দিয়েছে।

ধুতিতে, পাঞ্জাবিতে ধুলো-কাদা মাখা, চোখের চশমার কাচ ভাঙা, কপালের কাছে কিছুটা ছড়ে গেছে কিন্তু আসামী অত্যন্ত নিরীহ ও ভদ্রপ্রকৃতির। হাতজোড় করে দোষ কবুল করলেন আসামী। আরো অন্যান্যদের সঙ্গে তাঁরও পঁচিশ টাকা জরিমানা হলো।

আদালতের নির্দেশ শুনে আসামী বিনীতভাবে প্রশ্ন করলো, 'হুজুর, এই যে পঁচিশ টাকা দেবো, এর একটা রসিদ পাবো তো?'

বিচারক একটু বিস্মিত হয়েছিলেন এই প্রশ্নে। তিনি বললেন, 'তা পাবেন না কেন? নিশ্চয়ই পাবেন।' তারপর একটু থেমে জানতে চেয়েছিলেন, 'কিন্তু আপনি এই রসিদটা দিয়ে কী করবেন? কী কাজে লাগবে আপনার রসিদটা?'

আসামী ভদ্রলোক অধিকতর বিনীত হয়ে বললেন, 'বাড়িতে নিয়ে বৌকে দেখাবো।' বিচারক আরও বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'আপনার স্ত্রীকে আদালতের রসিদ দেখিয়ে কী করবেন?' আসামী এবার পরিষ্কার করে বললেন, 'বৌকে রসিদটা দেখালে সে বুঝতে পারবে যে সব টাকাই মদ খেয়ে উড়িয়ে দিইনি। কিছু টাকা অন্য কাজেও ব্যয় হয়েছে।'

সুরাপায়ীর জগৎ অত্যন্ত লম্বা এবং চওড়া। প্রাসাদ থেকে পর্ণকুটির, রাস্তাঘাট, বাজারহাট সর্বত্র তার অবস্থিতি। দিন ও রাতের যে কোনো সময়ে তাকে যে কোনো স্থানে আশা করা যেতে পারে। হয়তো সে সাতসকালেই মদ খায়নি কিন্তু গত রজনীর খোঁয়ারি সকালেও চলছে এবং বেলা বাড়তে বাড়তে সুরাবিলাসীর সংখ্যা রাত দুপুর নাগাদ তুঙ্গে পৌঁছাচ্ছে।

আদালতের কাঠগড়ায় প্রকাশ্য দিবালোক থেকে আমরা এবার একবার হাসপাতালের ওয়ার্ডে গভীর রজনীতে ঘুরে আসি। এক গুরুতর অসুস্থ রোগী বিছানায় চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে রয়েছেন। তিনি আজকেই একটু আগে এই ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে ভর্তি হয়েছেন। দুদিক থেকে দুজন ডাক্তার তাঁকে দেখতে ঢুকেছেন। দুজনারই নৈশ ডিউটি, কিঞ্চিৎ টলছেন। টলতে টলতে রোগীর বিছানার দুপাশে এসে দুজনে দাঁড়িয়েছেন। তারপর দুজনেই প্রায় একসঙ্গে রোগীর চাদরের নিচে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন নাড়ি দেখার জন্যে। রোগীর হাত চাপা পড়ে রয়েছে তার কাত হয়ে থাকা শরীরের নিচে। যা হোক, একটু এদিক-ওদিক করে দুই ডাক্তার চাদরের নিচে পরস্পরের কব্জির সন্ধান পেলেন এবং একজন অন্যজনের নাড়ি ধরে বসলেন নিজেদেরই অজান্তে।

তারপর দুজন ডাক্তার চাদরের নিচে পরস্পরের নাড়ি ধরে এরকম কথোপকথন করলেন—

'দারুণ মাতাল দেখছি।'

'খুব মদ খেয়েছে আজ।'

'সাত আট পেগ মদ খেয়েছে অন্তত।'

'তার চেয়েও বেশি হতে পারে।'

'যত সব মাতালের কাণ্ড।'

'যত সব মাতালের কাণ্ড।'

এরপরের উপাখ্যানটি নির্জলা প্রভাতকালের, এক সরল মদ্যপের। ভদ্রলোকের সেদিন অফিস যাওয়া হয়নি। অবশ্য দোষ তাঁর নয়। একটা ছোট গোলমালের জন্য তিনি কাজে যেতে পারেননি।

আগের রাতে খুব মদ খেয়েছিলেন ভদ্রলোক, সকালবেলায়ও বেশ নেশা ছিল কিন্তু তবুও ঘুম চোখে অভ্যাসবশত অফিস যাওয়ার জন্যে তৈরি হতে লাগলেন। প্রথমেই দাড়ি কামানো। দাড়ি কামাতে গিয়ে গোল আয়নাটা তুলে নিয়ে তিনি দেখলেন আয়নায় নিজেকে দেখতে পাচ্ছেন না, নিজের কোনো ছায়া পড়ছে না। তখন তাঁর

ধারণা হলো নিশ্চয়ই তিনি অফিসে চলে গিয়েছেন। বেলাও বেশ বেড়ে গেছে, এতক্ষণ তো অফিসে চলে যাওয়ারই কথা, আর সে জন্যেই আয়নায় নিজেকে দেখতে পাচ্ছেন না। তবে অধিক বেলায় তাঁর এই ভ্রম সংশোধন হয়েছিলো, যখন তাঁর মনে পড়লো যে দাড়ি কামানোর আয়নার কাচটা আগের দিনই ফ্রেম থেকে খুলে পড়ে ভেঙে গিয়েছে।

অন্য এক সম্ভ্রান্ত মদ্যপকে জানি, যাঁর ভীষণ আত্মসম্মান বোধ। নতুন একটা পাড়ায় বাড়ি করে উঠে এসেছেন। আগের পাড়ায় মাতাল বলে তাঁর কুখ্যাতি ছিলো। প্রতিদিন সন্ধ্যার পরে টলতে টলতে বাড়ি ফিরতেন, পাড়ার লোক টিটকিরি দিতো।

নতুন পাড়ায় এসে ভদ্রলোক ঠিক করলেন আর টিটকিরি নয়, আর ধরা দেবেন না। এখনো তিনি সন্ধ্যার অনেক পরে, অনেকদিনই মধ্যরাতে নেশাতুর অবস্থায় বাড়ি ফেরেন কিন্তু এ পাড়ার লোকে আর তাঁকে মাতাল বলে টিটকিরি দেয় না। ভদ্রলোক একটা চমৎকার বুদ্ধি বার করেছেন লোকে যাতে টলটলায়মান পায়ের ভিতরে পা! অবস্থাটা ধরতে না পারে। নিজের গলির মুখে এসেই তিনি উল্টোমুখ হয়ে যান। এবার পিছন দিকে পা ফেলে ফেলে সন্তর্পণে বাড়ি ফেরেন। তাঁর এই পিছুহাঁটার ব্যাপারটা নতুন পাড়ার লোকেরা কয়েকদিনের মধ্যেই ধরে ফেলে। কিন্তু তারা তাঁকে মাতাল বলে টিটকিরি দেয় না, পাগল কিংবা উচ্চাঙ্গের রসিক ভেবে হাসাহাসি করে। নতুন পাড়ার অল্পবয়েসীরা ভদ্রলোককে আজকাল রসিকদা বলে ডাকে। তিনিও বিনা বাক্যব্যয়ে নতুন নামকরণ মেনে নিয়েছেন।

এই রসিকদা সম্পর্কে আরো একটু বিস্তৃত করে বলা দরকার। রসিকদার বিয়ের কিছুদিন পরেই রসিকদার স্ত্রী তাঁর স্বামীর গভীর মদ্যাসক্তির ব্যাপারটা অনুধাবন করেন। তারপরে যথারীতি, 'তুমি আর মদ খাবে না,' 'তুমি আবার মদ খেয়ে বাড়ি এলে আমার মরামুখ দেখবে,' ইত্যাদি নানা দেয়াল রসিকদাকে টপকাতে হলো। সহস্র অনুনয় বিনয়, রাগ-গোঁসা-ক্রোধ ইত্যাদি উপেক্ষা করে রসিকদা নিয়মিত গভীর রাতে টলটলে অবস্থায় বাড়ি ফিরতে লাগলেন।

তখন রূপালি পর্দায় সাহেব-বিবি-গোলাম সিনেমার খুব রমরমা চলছে। রসিকদার স্ত্রী অর্থাৎ রসিকবৌদি পাড়ার মহিলাদের সঙ্গে সিনেমাটি কয়েকবার দেখেছেন। এবং এই সিনেমা থেকেই তাঁর মাথায় একটু চমৎকার বুদ্ধি খেলে গেলো। সাহেব-বিবি-গোলামের নায়িকার মতো তিনিও মদ খাওয়া ধরবেন, স্বামীকে বাড়িতে আটকিয়ে রাখা যাবে। মদ খাওয়ার জন্যে আবার শিক্ষাও দেওয়া হবে। ঘরের বৌ মাতাল হলে যদি লোকটার হুঁশ ফেরে, মদ খাওয়া ছেড়ে দেয়, তাহলে তো ভালোই।

রসিকদা এক বাক্যে রাজি হয়ে গেলেন। সেই দিনই অফিস থেকে ফেরার পথে এক বোতল দু নম্বর ধেনো মদ কিনে আনলেন। সন্ধ্যাবেলা ঘরের মেঝেতে শীতলপাটি বিছিয়ে রসিকদা রসিকবৌদিকে মদ্যপানে হাতে খড়ি দিতে প্রস্তুত হলেন। মোড়ের পানের দোকান থেকে এক কেজি বরফ, দু বোতল সোডা ওয়াটার এনে

স্বামী-স্ত্রী বেশ জমিয়ে বসলেন। রসিকদা খেয়াল করে রসিকবৌদিকে দিয়ে কয়েকটি বেগুনি ভাজিয়েছেন।

কিন্তু এক চুমুক মুখে দিয়েই রসিকবৌদি প্রচণ্ড একটা হেঁচকি তুললেন, তারপরে ক্রমাগত হিক্কা আর হিক্কা। রসিকবৌদি ক্ষেপে গিয়ে বললেন, 'সর্বনাশ, এই সাংঘাতিক জিনিস কী করে খাও তুমি? আমার বুক জ্বলছে, মাথা ঘুরছে, বমি আসছে। তুমি কি আনন্দে এটা খাও। এই ছাইপাঁশ গেলো।' রসিকদা তখন মুখ খুললেন, 'তা হলে ভেবে দেখো। তুমি ভাবো আমি মদ খেয়ে খুব আনন্দে থাকি। তোমার এক চুমুক খেয়েই এই অবস্থা আর আমাকে দিনের পর দিন কত কষ্ট করে গেলাসের পর গেলাস এই জিনিস খেয়ে যেতে হচ্ছে।'

আবার মদমত্ত

এক দফায় মদমত্ত কুলোলো না। মাতাল কাহিনীর আদি অন্ত নেই, কূলকিনারা নেই, তাই আবার লিখতে হলো এই শেষ।

এই শেষ মদমত্তে সোবার নামে একটি শব্দের ব্যবহার করবো। শব্দটি ইংরেজি, সোবার অর্থাৎ sober, দুঃখের বিষয় বহু চেষ্টা করেও বাংলায় এর কোনো যথার্থ প্রতিশব্দ খুঁজে বার করতে পারিনি।

সেবার মনে শান্ত নরম বা বাধ্য নয়। চেম্বার্স বিশ শতকীয় এবং অক্সফোর্ড অভিধান সোজাসুজি সোবার অর্থে উভয়ে লিখেছে মাতাল নয়। 'মাতাল নয়' এই কথাটিতে কিন্তু কিছু স্পষ্ট হলো না, আসলে সোবার বলতে বোঝায় মদ খেয়েছে কিন্তু মাতাল নয়।

মাতাল আর সোবারের মধ্যে একদা এক সূক্ষ্ম পার্থক্য করেছিলেন এক মদ্যপ, স্বয়ং তাঁর ভাষায়, 'আমি যখন মাতাল এবং বুঝতে পারছি আমি মাতাল, তখন আমি সোবার। আর যখন আমি মাতাল কিন্তু বুঝতে পারছি না আমি মাতাল, তখন আমি মাতাল'।

জানি না মাতাল ও সোবারের এই ভেদাভেদ সরলবুদ্ধি সাদামন সাদাচোখ পাঠক-পাঠিকাদের কতখানি বোধগম্য হলো। না হলে না হয়েছে, মাতাল বনাম সোবারের একটা অতি পুরনো ঘটনা বলি।

ঠিক ঘটনা নয়, এটি একটি বিয়ের সঙ্গে জড়িত। স্বীকার করি, আমার অন্য অধিকাংশ গল্পের মতোই এটি আমার স্বকপোলকল্পিত নয়। তার চেয়েও মারাত্মক গল্পটি সম্ভবত আমি নিজেই আরো একবার ব্যবহার করেছি।

তবু গল্পটি লিখছি; গল্পটি বড় রহস্যময়। গল্পটি এক ভদ্রমহিলার যিনি দেখতে সুন্দরী নন, যতটা সুন্দরী হলে পাণিপ্রার্থী পুরুষেরা ভিড় জমিয়ে ঘিরে থাকে। এই অনতি সুন্দরীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিলো এক ধনী মদ্যপের। ধনী ব্যক্তিটির মদ্যাসক্তি ছাড়া কোনো দোষ ছিলো না।

এই ভদ্রমহিলার সঙ্গে উক্ত মদ্যপ ধনীটির বিয়ে হয়েছিলো প্রায় দশ বছর জানাজানির পর। কিন্তু বারবার বিয়ে ঠিক হতে হতে ভেঙে যায় আবার ভাঙতে ভাঙতে ঠিক হয়ে আসে। মেলামেশা চলছে, কিন্তু বছরের পর বছর যায়, বিয়ে আর হয়ে ওঠে না।

দুজনের বিয়ে হতে কেন এত দেরি হচ্ছিলো? এ বিষয়ে ভদ্রমহিলার কন্যার জবানিতে ব্যাখ্যাটা এই রকম, 'আমার বাবা আর মার বিয়ে হওয়ার তো কোনো উপায়ই ছিলো না। বাবা মাতাল হলেই মা-কে বিয়ে করতে চাইতো। আর বাবা মাতাল হয়েছে বলে বাবাকে মা তখন বিয়ে করতে চাইতো না। আবার বাবার নেশা কেটে গেলে, বাবা যখন সোবার হতেন তখন মা বাবাকে বিয়ে করতে বিশেষ আপত্তি করতেন না, বরং রাজিই হতেন কিন্তু সাদা চোখে মাকে বাবার ভীষণ অপছন্দ, কিছুতেই বিয়ে করবেন না মাকে। সে এক মহা ঝামেলা, মিঞা যখন রাজি বিবি তখন গররাজি, বিবি যখন রাজি মিঞা তখন গররাজি।'

এই ভিসাস সার্কেল, এই বিষচক্রের কী করে অন্ত হয়েছিলো, কী করে এই দুজনের বিয়ে শেষ পর্যন্ত হয়েছিলো সে এক দীর্ঘ কাহিনী, অল্প পাতায় কুলোবে না।

মদের গল্প অনেক অনেক পুরনো। সভ্যতার সমান বয়েসী। মানুষের প্রচীনতম বই ঋগ্বেদ, রমেশচন্দ্র দত্তের ঋগ্বেদের অনুবাদে পড়েছি, মাতাল ইন্দ্রকে বলা হচ্ছে, 'ইন্দ্র, তুমি মদ খেয়েছো (অর্থাৎ মাতাল হয়েছো), যাও এবার বাড়ি যাও, বাড়িতে তোমার বৌ রয়েছে।' (৩ মণ্ডল, ৫৩ সূক্ত, ৬ ঋক্)।

উপনিষদের ঋষি মদের ঘোরতর বিরোধী। মদ হলো পানের অযোগ্য, দানের অযোগ্য, গ্রহণেব অযোগ্য, আদয়ম আপয়ম অগ্রহাম।'

ইসলাম ধর্মে মদ্যপান মহাপাপ। শুধু পান নয়, যে এর রস নেয়, যে রস নেবার জন্যে নিযুক্ত, যে পান করে, যে বহন করে, যে পান করতে দেয়, যে বেচে, যে কেনে, যার জন্যে কেনে, তারা প্রত্যেকে অভিশপ্ত। হাদীস শরীফে আছে হজরত মুহম্মদকে এক ব্যক্তি বলেছিলো, 'আমি মদ ওষুধের জন্যে তৈরি করি।' হজরত বলেছিলেন, 'মদ ওষুধ নয়, মদই ব্যাধি।'

ধর্মের উপদেশ, শাস্ত্রের নিষেধ, সমাজের অনুশাসন, স্ত্রীর অশ্রুজল, প্রতিবেশীদের গঞ্জন, লোকনিন্দা সবকিছু উপেক্ষা করে তবু মানুষেরা মদ খেয়ে যাচ্ছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে।

মদ মানুষকে কি দেয়—জীবনের একঘেয়েমি থেকে ক্ষণিকের পলায়ন, মুহূর্তের বিস্মৃতি, তার ক্লান্ত, শ্রান্ত, অপমানিত জীবনে একটু প্রসন্নতার ছায়া। এক অফিসের কেরানীকে একজন বলেছিলো, 'তুমি মদ খেয়ে কেরিয়ার নষ্ট না করলে এতদিনে বড়বাবু হতে পারতে।' তখন সে বলেছিলো, কিন্তু বড়বাবু কেন, মদ খেলে আমার নিজেকে তো বড়সাহেব মনে হয়।'

এ সব বেদনার কথা যাক। কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে।

তার চেয়ে রসিকবাবুর কথায় যাই। এর আগে রসিকবাবুর কাহিনী পাঠ করে কেউ

কেউ তাঁকে চিনে ফেলেছেন। ইতিমধ্যে এই সূত্রেই তাঁর সম্পর্কে আরো দু-চারটি কথিকা আমার কর্ণগোচর হয়েছে।

আমি মাত্র দুটি বলবো। তার মধ্যে আবার শেষেরটি হলো একটি শোকসংবাদ এবং সেই শোকসংবাদেই কথামালার সম্পত্তি।

দুটি ঘটনার একটি রসিকবাবুর শেষ জীবনের, আর একটি জীবনশেষের।

বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রসিকবাবুর চাকরিতে উন্নতি হলো। হাতে পয়সা এলো। তখন বাংলা মদ ছেড়ে বিলাতি মদ মানে হুইস্কি, ব্রান্ডি এসব খাওয়া ধরলেন। তবে যে রকম হয়, মদে তাঁর শরীরের দফারফা হয়ে গিয়েছিলো, লিভার নার্ভ সবই বেসামাল।

রসিকবৌদি ডাক্তার ডাকলেন। এ সব ক্ষেত্রে ডাক্তারবাবুদের যা কাজ ডাক্তারবাবু তাই করলেন, প্রথমেই বললেন, 'মদ একেবারে বন্ধ।' অনেক অনুনয়-বিনয় করলেন রসিকবাবু, 'ডাক্তারবাবু, একেবারে ছাড়তে পারবো না। চল্লিশ বছরের অভ্যেস, একদম না খেলে পেট ফুলে ফেটে মরে যাবো।' রোগীর এই রকম মরিয়া অবস্থা দেখে ডাক্তারবাবু বললেন, 'ঠিক আছে কিন্তু দেড় পেগের বেশি নয়।' কিন্তু দেড় পেগ নস্যি রসিকবাবুর কাছে, তিনি পুরো পাঁইটের খদ্দের। শেষ পর্যন্ত ডাক্তার আর রোগীর মধ্যে মাছের বাজারের দাম-দর শুরু হলো, 'দেড়-সাত, দুই-ছয়, আড়াই-পাঁচ এইরকম নেমে উঠে অবশেষে তিনে সাব্যস্ত হলো।

কয়েকদিন পরে রোগীর অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপ হচ্ছে শুনে ডাক্তারবাবু রসিকদাকে দেখতে এলেন। তখন বেশ রাত হয়েছে। এসে দেখেন রোগীর পদপ্রান্তে মদের বোতল গড়াচ্ছে, রোগী মদে চুর হয়ে বালিশে হেলান দিয়ে বসে আছে। তাঁর মাথার কাছে সাশ্রুলোচনা রসিকবৌদি।

রসিকদার বিশেষ জ্ঞান নেই। ডাক্তারবাবুকে ঘরে ঢুকতে দেখে হাতজোড় করে উঠে বসতে গিয়ে বিছানায় গড়িয়ে গেলেন। কোনোরকমে তাঁকে সাব্যস্ত করে মাথার নিচে একটা বালিশ গুঁজে দিয়ে ডাক্তারবাবু রসিকবৌদিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওঁর এ অবস্থা হলো কী করে?'

রসিকবৌদি জানালেন, 'সন্ধ্যা থেকে এক বোতল মদ খেয়েছে'। ডাক্তারবাবুর চোখ কপালে উঠলো, 'এক বোতল? আমি না মাত্র তিন পেগ খেতে বলেছিলাম!'

রসিকবৌদি এবার বললেন, 'সেদিন আপনি তো তিন পেগ বলে চলে গেলেন। তারপর উনি চাকর পাঠিয়ে গলির মোড়ের মহেশ-ডাক্তারকে ডাকলেন এবং মহেশবাবুর সঙ্গেও আপনার মতো দাম-দর করে তিন পেগ বরাদ্দ করিয়ে নিলেন। বিকেলের দিকে বাজারের রমেশডাক্তারকে ফোন করে আনলেন, আবার তাঁর সঙ্গে দাম-দর ধস্তাধস্তি, সেখানেও তিন পেগ বরাদ্দ হলো। তারপর থেকে আর আমার কথা গ্রাহ্য করছে না, কেবলই বলে ডাক্তারেরা আমাকে তিন ইনটু তিন নয় পেগ পথ্য বরাদ্দ করেছে। তুমি মূর্খ মেয়েছেলে, এর মধ্যে মাথা গালাচ্ছো যে। তোমার জন্যে মারা পড়বো না কি? আমি মারা গেলে তোমার খুব ফুর্তি হবে, না?'

শ্রীযুক্ত রসিক মদ্যপের কিন্তু সেবার শেষ পর্যন্ত মৃত্যু হয়নি। প্রাণে বেঁচে উঠেছিলেন। তবে ডাক্তার এরপর তাঁর মদ্যপান সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেন এবং তখনই তিনি মারা পড়েন, তবে সেটা মদ না খাওয়ার জন্যে নয়। ঘটনাটি বিয়োগান্ত তাই কালো বর্ডারে লিখছি।

> শ্রীযুক্ত রসিক মদ্যপ ইহলীলা সংবরণ করেছেন। তিনি ডাক্তারের পরামর্শে মদ্যপান সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু কয়েকদিন আগে কাঁধে তাঁর খুব ব্যথা হয়। ডাক্তার সেই ব্যথার জায়গায় অ্যালকহল লাগাতে বলেছিলেন। বহুদিনের পিপাসার্ত রসিকবাবু মাথা উলটিয়ে কাঁধের সেই অ্যালকহল জিব দিয়ে চাটতে গিয়ে ঘাড় ভেঙে মারা গিয়েছেন।
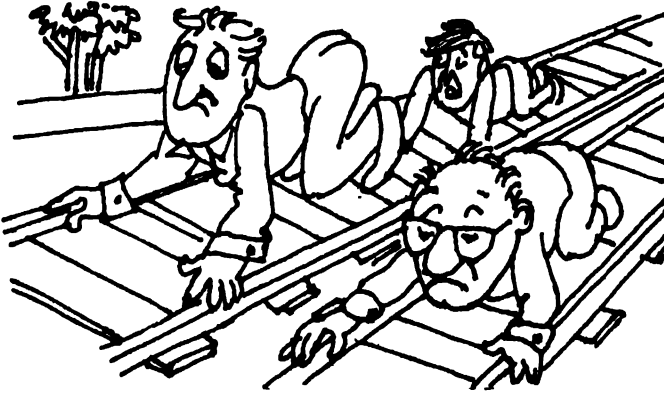
মাতাল-রহস্য

মদের মতই মদের গল্পও অতি উত্তেজক। কুকুর-বেড়াল, চোর-ডাকাত, ছাতা-মাথা কত না খুচরো গল্প শুনে, বানিয়ে বা অন্য বই থেকে টুকে তো এতোকাল লিখলাম, কিন্তু আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা থেকে ইতিমধ্যে টের পেয়েছি মাতাল কথামালা যত জমজমাট হয়, কিছুই আর তেমন জমে না। মদ ও মাতালের আকর্ষণের কোনো তুলনা হয় না।

আমার পরম বন্ধু রসরঞ্জন শ্রীযুক্ত হিমানীশ গোস্বামী আমাকে অনুগ্রহপূর্বক তিনটি সুরাসিক্ত রসিকতা প্রেরণ করেছেন, সেগুলি নিবেদন করছি। সুরা রসপিপাসু পাঠকপাঠিকাবৃন্দ সে সব মন দিয়ে পাঠ করুন যদি কিঞ্চিৎ গোলাপি আবেশ তাঁদের স্পর্শ করে, সমস্ত কৃতিত্ব হিমানীশবাবুর, আমার নয়।

স্কচ হুইস্কি দিয়ে আরম্ভ করা যাক। এটাই নাকি জগৎ-সংসারের সেরা মদ। এক বিখ্যাত ফৌজদারি উকিলের বাড়িতে এক মক্কেলের আবির্ভাব। উকিলবাবুর টেবিলের ঠিক সামনের চেয়ারে বসে মক্কেল মহোদয় বললেন, 'স্যার, এক কেস স্কচ

কাহিনীটি পুরনো। জনৈক সুরাপায়ী বারে এসে মদের অর্ডার দিয়ে পকেট থেকে একটা পোষা গিনিপিগ বার করে টেবিলের ওপর রাখতেন। তারপর কয়েক পাত্র পান করার পরে গিনিপিগটিকে তুলে ভালো করে দেখে আবার পকেটে পুরে চলে যেতেন। একদিন বেয়ারা কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইলো, 'দাদা, গিনিপিগটাকে নিয়ে আসেন কেন?' দাদা বললেন, 'দ্যাখো, আমি তো একটা গিনিপিগ আনি। যখন খেতে খেতে দেখি দুটো গিনিপিগ হয়েছে, তখন দুটোকে দু পকেটে পুরে বাড়ি ফিরে যাই।'

কিছুদিন পরে গিনিপিগটা মারা গেছে। গিনিপিগ ছাড়া ভদ্রলোক এসেছেন। বেয়ারা বললেন, 'দাদা, এবার কী করবেন?' দাদা বললেন, 'সামনের টেবিলের লোকটা যেই ডবল হয়ে যাবে, আমি উঠে পড়বো।' এইভাবে ভালোই চলছিলো, কিন্তু হঠাৎ একদিন দাদা এক পেগ খেয়েই উঠে পড়লেন। বেয়ারাটি ছুটে এলো, 'দাদা, আজ এতো তাড়াতাড়ি?' দাদা বললেন, 'তাই তো, আজ বড় তাড়াতাড়ি নেশা হয়ে গেলো। সামনের টেবিলের লোকটা এক পেগ খেতেই দেখি ডবল হয়ে গেছে।' বেয়ারা হেসে বললো, 'দাদা, ও দেখে ভয় পাবেন না। ও টেবিলে একজন নয়, দুজনই আছে। ওরা যমজ ভাই। তাই ডবল মনে হচ্ছে।'

দাদা এবার শান্ত হয়ে টেবিলে বসলেন এবং ডবল রিডবল না হওয়া পর্যন্ত, দুজন চারজন না হওয়া পর্যন্ত মনের সুখে সুরাপান করতে লাগলেন।

আরো রহস্য

মাতাল রহস্য নামে প্রকাশিত রোমাঞ্চকর এবং গোলমেলে আগের লেখাটায়, পরশুরাম ত্রৈলোক্যনাথ সবই বলা হয়েছে, কিন্তু আসল কথাটা মাতালের রহস্যটা যে কী সেটাই ভাল করে বলা হয়নি। এবার সর্বপ্রথমে আমি যথাসাধ্য সেই রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করবো।

যে কোনো গল্পকথায় মদ ও মাতালের প্রবেশ একটা নতুন মাত্রা বা গতি এনে দেয়। মাতালকে দিয়ে যাচ্ছেতাই করানো যায় ; অসংলগ্ন অসম্বদ্ধ অকল্পনীয় সব কিছুই

মাতাল করতে পারে। শুধু তাই নয়, একজন সাধারণ মানুষ সরলভাবে যা করতে পারে, সেটাই একজন মদ্যপায়ী করলে যথেষ্ট হাসির কারণ হতে পারে।

এক মদ্যপ প্রতিদিন অফিসের শেষে প্রচুর মদ্যপান করে বাড়ি ফেরে। সারাদিন তার অফিসে কাটে কখন অফিস ছুটি হবে, ফাইল-টাইল গুটিয়ে সোজা পানশালায় গিয়ে পান করা আরম্ভ করবে এই প্রতীক্ষায়।

এর মধ্যে হয়েছে কি, অফিসে বহু ছুটি জমে গেছে, তাই মদ্যপ অফিস থেকে এক মাসের ছুটি নিয়েছে। কিন্তু সেটাই হয়েছে বিপদ। তার দিন আর কাটে না। এতদিন তবু অফিসের কাজকর্মে দিন কাবার হয়ে যেতো, কিন্তু এখন সারাদিন অস্থির লাগে। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত হা-পিত্যেশ করে বসে থাকা কখন সন্ধ্যায় আবার পানশালায় যাওয়া যাবে। বলা বাহুল্য, আমাদের এই মদ্যপের দিনের বেলায় মদ্যপান পছন্দ নয়, অভ্যাসও নেই।

সে যা হোক, দিন কাটানোর জন্যে মদ্যপ একটি বুদ্ধি বার করলো। সে সকাল বেলা খাতা পেনসিল হাতে নিজের বাড়ির সামনে বারান্দায় বসে এবং রাস্তা দিয়ে যত লোকজন যায়, স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ সকলের হিসাব রাখে, তালিকা প্রস্তুত করে। অফিসেও তার কাজের ধরন মোটামুটি একই রকম—শুধু সেখানে মানুষজনের বদলে কোম্পানির মালপত্রের হিসাব রাখতে হয়, তালিকা বানাতে হয়। সুতরাং এখন আর তার দিন কাটাতে তেমন অসুবিধা হয় না।

এর মধ্যে একদিন সকালবেলা মদ্যপের স্ত্রী দেখলো আজ আর সে রাস্তার লোক গুনছে না। চিন্তিতা স্ত্রী মদ্যপকে জিজ্ঞাসা করলো, 'ওগো, তোমার কাগজ পেন্সিল কোথায়? আজ রাস্তার লোক গুনবে না।' মদ্যপ গম্ভীর হয়ে উত্তর দিলো, 'আজ গুনবো কেন? আজ তো ছুটি, আজ যে রোববার।'

এই গল্পটি তেমন ভালো নয়। শুধু লিখলাম একটা জিনিস দেখানোর জন্যে। মূল গল্পটি এক অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তির সময় কাটানোর সমস্যা নিয়ে, সে মাতাল-টাতাল কিছু নয়। কিন্তু মাতালের চরিত্র ও গল্পে একটা অন্য আমেজ এনে দিচ্ছে।

মদ জিনিসটা কী? এ বিষয়ে পাতার পর পাতা লেখা যেতে পারে। মদের বিকল্প চাঙ্গায়নী সুধার বর্ণনা আছে পরশুরামের গল্পে। বিখ্যাত জটাধর বকশী এক বিজয়া দশমীর সন্ধ্যায় দিল্লির ক্যালকাটা টি ক্যাবিনে এক দশসেরা রুদ্র-কমণ্ডলু ভর্তি চাঙ্গায়নী সুধা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, সে সুধার ব্যাখ্যা করছে, 'এতে আছে কুড়িটি গাছ-গাছড়া, কুড়ি রকম ডাক্তারি আরক, কুড়ি রকম হোমিও গ্লোবিউল, কুড়ি দফা হেকিমি দাবাই, তা ছাড়া তান্ত্রিক স্বর্ণ ভাম হীরক ভাম বায়ু ভস্ম ব্যোম ভাম, রাজ্যের ভিটামিন, আর পোয়াটাক ইলেকট্রিসিটি। আর আছে হিমালয়জাত কোমলতা যাকে আপনারা সিদ্ধি বলেন, আর কাশ্মীরী মকরন্দ এই সব মিলিয়ে বকযন্ত্রে চোলাই করে প্রস্তুত হয়েছে।'

জটাধর আরো বলেছে, 'এতে সিদ্ধি আছে বটে। কিন্তু তা মামুলি ভাঙ নয়, বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় শোধন করে তার মাদকতা একেবারে নিউট্রালাইজ করা

হয়েছে...খেলে শরীর চাঙ্গা হবে, ইন্দ্রিয় আর বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হবে, চিত্তে পুলক আসবে সব গ্লানি আর অশান্তি দূর হবে।'

এই বর্ণনা থেকে দেখা যাচ্ছে মদ খেলে যাহয়, জটাধর বকশীর চাঙ্গায়নী সুধ খেলেও ঠিক তাই হয়। তবে মদের প্রস্তুত প্রণালী চাঙ্গায়নী সুধার মত অত কঠি কিংবা জটিল নয়।

মদের বর্ণনা থেকে মাতালের বর্ণনা বেশি চিত্তগ্রাহী। আমরা অতঃপর মাতালের দিকেই যাচ্ছি, মদের গুণাগুণ বিষয়ক একটি ছোট গল্প সেরে নিয়ে।

সদ্যযুবক কয়েকজনকে মদ খাওয়ার বিষময় পরিণাম সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করার জন্যে একটা বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছিলো। বক্তা করিৎকর্মা ব্যক্তি। তিনি হাতে হাতে মদ্যপানের কুফল দেখানোর ব্যবস্থা করেন। দুটো ফাঁকা কাচের গেলাস নিয়ে তিনি সে দুটোর মধ্যে কয়েকটা করে পোকা ছেড়ে দেন। তারপর একটা গেলাসের মধ্যে পাশের বোতল থেকে পরিষ্কার সাদা জল নিয়ে ঢেলে দিলেন, গেলাসের পোকাগুলো সাবলীলভাবে সেই জলে সাঁতরাতে লাগলো, কিলবিল করতে লাগলো।

এবার একটা মদের বোতল থেকে মদ নিয়ে দ্বিতীয় গেলাসটায় বক্তা ধীরে ধীরে ঢাললেন। কড়া মদের বিষক্রিয়ায় গেলাসের মধ্যের পোকাগুলো কুঁকড়িয়ে, কুঁচকিয়ে অবশেষে মারা গেলো।

চোখের সামনে মদের এই বিষময় পরিণাম ছেলেদের দেখিয়ে উত্তেজিত বক্তা বললেন, 'তাহলে এটা দেখে এবার তোমরা মদের ব্যাপারটা বুঝতে পারলে?' ছেলেদের দলের এক নেতা উঠে দাঁড়ালো, সে জানানো, 'হ্যাঁ পেরেছি'। বক্তা আবার প্রশ্ন করলেন, 'কী বুঝতে পারলে?' ছেলেটি বললো, 'স্যার, যদি আমরা মদ খাই তবে আমাদের পেটে পোকা থাকবে না, সব মরে যাবে। আর মদ না খেলে পেটের মধ্যে পোকা কিলবিল করবে।'

মদ যাক, এবার মাতাল। কলকাতার কাছাকাছি এক বিদ্যায়তনে এক মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক পড়ান, তাঁর কিঞ্চিৎ ম-কার দোষ আছে, তাঁকে আমরা মবাবু বলবো। সেই প্রতিষ্ঠানের যিনি অধ্যক্ষ তিনি কিন্তু ভীষণ প্রাচীনপন্থী, রক্ষণশীল, গোঁড়া প্রকৃতির। বিদ্যায়তনটিতে সম্প্রতি এক নবীনা শিক্ষিকা নিযুক্ত হয়েছেন। তাঁর সঙ্গে অল্পদিনের মধ্যেই মবাবুর খুব মাখামাখি ভাব। অধ্যক্ষ একদিন মবাবুকে বললেন, 'দেখুন, মিস চক্রবর্তী নিতান্ত নাবালিকাপ্রায়।' মবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'ঠিক আছে।'

কিন্তু আসলে ঠিক নেই। একদিন অধ্যক্ষ মহোদয় কি একটা কাজে চৌরঙ্গীর রাজপথ দিয়ে সন্ধ্যার একটু পরে হেঁটে আসছিলেন ; সহসা তিনি স্বচক্ষে দেখলেন সামনের একটি পানশালা থেকে মবাবু বেরিয়ে আসছেন, তাঁর টলমল অবস্থা, সঙ্গে মিস চক্রবর্তী।

অধ্যক্ষ প্রমাদ গনলেন। তখন আর মুখোমুখি না হয়ে পরের দিন নিজের ঘরে মবাবুকে ডেকে বললেন, 'দেখুন, মিস চক্রবর্তী নিতান্ত অল্পবয়সী, সব ব্যাপারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞাই মনে হয়। ওকে ভালোমন্দ বোঝানোর দায়িত্ব তো বলতে গেলে

আমাদেরই। সঙ্গে সঙ্গে মবাবু রাজি হয়ে গেলেন, 'ঠিক আছে, সেই কথাই রইলো। আপনি ওকে ভালোটা বোঝাবেন, আর আমি ওকে মন্দটা বোঝাবো। নমস্কার।'

আরেকবার কলকাতা ময়দানের প্রাচীন মনুমেন্ট অর্থাৎ শহিত মিনারের চূড়ায় উঠেছিলাম। সেখানে চূড়ান্ত অলিন্দে দেখি জনাকয়েক সুরারসিক সরাসরি বোতল থেকে নির্জলা মদ ঢকঢককরে গলায় ঢেলে খাচ্ছে। তাদের চোখ ঈষৎ রক্তিম, আচরণ কিঞ্চিৎ আলুথালু।

কিছুক্ষণ পরে মদ খাওয়া শেষ করে শূন্য বোতলটি তাদের একজন মহাশূন্যে নিক্ষেপ করে বললো, 'শূন্যে শূন্য'। দুঃখের বিষয় নিউটন সাহেবের প্রবর্তিত মাধ্যাকর্ষণের অন্যায় আইনে শূন্য বোতলটি শূন্যে না বিলীন হয়ে একটু পরেই নিচে ময়দানে পতিত হোলো এবং অচিরাৎ নিচ থেকে একটি ক্ষীণ আর্তনাদ ওপরে ভেসে এলো। একজন মাতালের সংবিৎ ফিরলো, তার মাথায় এখন অন্য চিন্তা ঢুকেছে। সে রেলিংয়ের কাছে ছিলো, একটু পিছিয়ে এসে বললো, 'আচ্ছা ভাই, আমার কেমন ভয় করছে। মাঝে-মধ্যে কোনো মাতাল-টাতাল এই রেলিং টপকে নিচে পড়ে যায় না তো?' যাকে জিজ্ঞেস করা হলো তার জ্ঞান টনটনে। সে বললো, 'মাঝে-মধ্যে নয়, পড়লে একবারই পড়ে। পড়বি?' এরপরে আর দাঁড়ানো যায় না। দ্রুতপদে আমি নিচে নেমে এলাম।

পানশালার দরজা বন্ধ করার আগে শেষমেশ একটা করুণ কাহিনী বলি। এক ছন্নছাড়া ভদ্রলোক সন্ধ্যা থেকে বারের আলো না নেবা পর্যন্ত একা একা এক টেবিলে বসে গেলাসের পর গেলাস মদ খেতেন। তারপর শেষ মুহূর্তে টলতে টলতে উঠে অন্য কোথাও চলে যেতেন পানীয়ের সন্ধানে। বছরের পর বছর এই রকম। আমার সঙ্গে এক সময় তাঁর সামান্য মুখ-পরিচয় ছিলো। একদিন আধা মত্ত অবস্থায় তিনি আমাকে বলেছিলেন, 'দ্যাখো, যাকে ভুলবার জন্যে এই চালচুলোহীন এলোমেলো জীবনযাপন করি, গেলাসের পর গেলাস মদ খেয়ে কেটে যায় সন্ধ্যার পর সন্ধ্যা; আসল কথাটা কী জানো, কবে তার নাম ভুলে গেছি, হাজার চেষ্টা করলেও এখন আর তার মুখটা মনে করতে পারি না।'

হেপি নিউইয়ার

নববর্ষের উৎসবের পরদিন সকালে একটি শিশু তার মাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "মা, প্রতিদিন কেন নিউইয়ার হয় না? প্রতিদিন আমরা কেন হ্যাপি নিউইয়ার করি না?"

আমাদের 'হেপি নিউইয়ার' বলার ভদ্রলোকটি কিন্তু ঐ শিশু নন। তিনি সফল এবং সুপ্রতিষ্ঠিত এক ব্যবসায়ী। যে বঙ্গজ উচ্চারণ দোষে তিনি দুষ্ট, সেই উচ্চারণ দোষে একদা আমার মধ্যেও ছিল, এখনও হয়ত আছে।

আমি সচেষ্ট ও সতর্ক হয়ে কিছুটা কাটিয়ে উঠেছি। কিন্তু সেই স্বদেশী বন্ধু এ নিয়ে মাথা ঘামাননি। তবে তাতে তাঁর কিছু আসে যায় না, তিনি এ সবের পরোয়া করেন না, বরং আমরাই মাঝেমধ্যে খটকায় পড়ি।

একেক সময় ধরাই কঠিন হয় তিনি ইংরেজিতে কী শব্দটা বলছেন। তার সঙ্গে আমার সবসময় যোগাযোগ থাকে না। তবু এখানে ওখানে কাজের বাড়িতে, উৎসবের মঞ্চে হঠাৎ হঠাৎ দেখা হয়ে যায়। আমরা একই স্কুলের দু-এক ক্লাস নিচে উপরে পড়েছি, জন্মেছিলাম একই মফঃস্বল শহরের একই পাড়ায়। ধনবান মানুষ হলেও তিনি আমার সম্বন্ধে কৌতূহল ও উৎসাহ দেখান সবসময়েই।

কয়েক মাস আগে একদিন দেখা। বললেন, "তোমার ফেটটা একটু বেড়ে গেছে মনে হচ্ছে।" আমি-ধরতে পারিনি, ভাবলাম বোধহয় তিনি বলতে চাইছেন যে আমার ভাগ্য এখন প্রসন্ন। কিন্তু কিছু পরেই বুঝতে পারলাম যে তিনি বলতে চাইছেন, আমি মোটা হয়ে যাচ্ছি। ফেট মানে ইংরেজি **Fate** নয়, ফ্যাট (**Fat**) অর্থাৎ মোটা।

অবশ্য এই প্রথম নয়। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের সুবাদে তিনি বহুলোকের স্বনিযুক্ত পরামর্শদাতা। একদিন এক বিয়েবাড়িতে আমি প্যান্ট-শার্ট পরে গিয়েছিলাম। ঐ ভদ্রলোক, নামটা বলেই ফেলি করুণাবাবু, তিনি বললেন, "তুমি পেন্ট পরে বিয়ে বাড়িতে আসো কেন? লেখক-মানুষ বিয়ে বাড়িতে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে আসবে, তোমাকে মানাবে।" আমাকে কিসে মানাবে আর কিসে মানাবে না, তা নিয়ে আমি

তেমন মাথা ঘামাই না, তবে পেন্ট মানে যে প্যান্ট, এটা সেদিন হৃদয়ঙ্গম করতে আমার মিনিট দুই সময় লেগেছিল।

নববর্ষের সুবাদে এই করুণাদার প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে আরেকটা অনুরূপ অভিজ্ঞতার কথা বলে নিই। অনেকদিন আগে উচ্চারণ নিয়ে বোধ হয় একটা লেখা লিখেছিলাম। সেখানে এই প্রশ্নটা তুলেছিলাম। যে লোকটা ফ্যাটকে ফেট, ক্যাটকে কেট, স্ন্যাককে স্নেক বলে, সেটা কি তার জিহ্বার দোষ? য-ফলা আকার সে কেন 'এ' উচ্চারণ করে?

কিন্তু আমি অনুধাবন করে দেখেছি, যে ব্যক্তি ট্যাপ রেকর্ডার বলে সে-ই বলে টেপ ওয়াটার। আসলে সে ট্যাপ আর টেপ দুইই চমৎকার উচ্চারণ করতে পারে, শুধু যেখানে যেরকম করা উচিত সেখানে সে রকম করে না। এ তার শিক্ষার অভাব না অভ্যাসের দোষ, নাকি মানসিক বিশৃঙ্খলা?

করুণাদার ব্যাপারটাই ধরা যাক। করুণাদা আগে পার্টনারশিপে ব্যবসা করতেন। যথারীতি বাঙালির আর দশটা যুগ্ম বা যৌথ উদ্যোগের মতো একদিন পার্টনারের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য দেখা দিল।

করুণাদার পার্টনারের নাম ছিল শ্যামবাবু। শ্যামবাবুও আমাদের দেশের লোক, তাঁকেও আমি জন্মাবধি চিনি। ফলে করুণাদা এবং শ্যামবাবুর ব্যবসায়িক কলহে আমাকে কিঞ্চিৎ মধ্যস্থতা করতে হয়।

সেই কলহের পরিণতি কী হয়েছিল সেটা এ কাহিনীর বিষয় নয়। সে আলোচনা এখানে করব না। তবে যে কারণে এ প্রসঙ্গের উত্থাপন করেছি সেটা বলি।

কী একটা হিসেবে গোলমাল হয়েছিল। করুণাদার ধারণা হয়েছিল যে শ্যামবাবু বোধ হয় কিছু একটা কারচুপি করেছেন। শ্যামবাবুর হয়ত কিছু দোষ ছিল, তিনি গুম হয়ে মাথা নিচু করে বসে করুণাদার গালাগাল হজম করছিলেন। করুণাদা বারবার একটা কথা বলেছিলেন, "ছিঃ ছি! আপনার ওপর আমি এত বিশ্বাস করেছিলাম, এত আস্থা রেখেছিলাম। ছিঃ! ছিঃ! শ্যাম, শ্যাম, শেমবাবু।"

এই শেষোক্ত শব্দত্রয় নিয়েই আমাদের সমস্যা, 'শ্যাম, শ্যাম, শেমবাবু।' প্রথম শ্যাম, শ্যাম হল শেম, শেম (Shame, Shame) আর শেষের শেমবাবু হল শ্যামবাবু। মোট কথা করুণাদা যখন বলছেন, 'শ্যাম, শ্যাম, শেমবাবু', তখন তাঁর বলার কথা হল, 'শেম, শেম, শ্যামবাবু।'

এই কটূক্তি শ্যামবাবুকে কতটা লজ্জিত করেছিল তা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়, কিন্তু আমার যে প্রশ্নটা তখন ছিল এবং এখনও আছে, করুণাদা পরিষ্কারভাবে শেম আর শ্যাম দুই যদি উচ্চারণ করতে পারেন তবে শ্যামকে শেম আর শেমকে শ্যাম বলেন কেন?

জানি আমার এ সমস্যার সমাধান কোনোদিন কেউ করতে পারবে না। সুতরাং শুভ নববর্ষে করুণাদার 'হেপি নিউইয়ার'-এ প্রত্যাবর্তন করি।

করুণাদা ব্যক্তিটি ভুল বা অমার্জিত উচ্চারণ করতে পারেন, কিন্তু তিনি নির্বোধ

বা অশিক্ষিত নন, তাছাড়া তিনি বিত্তবান। বিত্তবানের সর্বদাই সাতখুন মাপ।

নববর্ষের দিন-সাতেক আগে করুণাদা আমাকে ডাকলেন। দেখি হাতে বিরাট এক লিস্ট, তাতে শহরের যত নামজাদা জ্ঞানীগুণী লোকের তালিকা। কবি, লেখক, আমলা, চিত্রতারকা এমনকি অধ্যাপক, উপাচার্য পর্যন্ত।

আমি বললাম, "কী ব্যাপার?" করুণাদা বললেন, "নববর্ষে বাড়িতে একটা পার্টি দিচ্ছি, ভাবলাম তোমাকে একবার নামের লিস্টটা যাচাই করিয়ে নিই।" আমি সাধ্য ও বুদ্ধিমতো দু-একটা নাম তালিকায় যোগ-বিয়োগ করলাম। তারপর পুরোনো শুভানুধ্যায়ীর যা করা উচিত, একটু ভেবেচিন্তে করুণাদাকে বললাম, "দাদা, একটা কথা।" করুণাদা বললেন, "কী কথা?" আমি বিনীতভাবে বললাম, "আপনি ইংরেজিটা পার্টির রাতে একটু কম বললেন।"

নববর্ষের দিন গিয়ে দেখি একে একে বিশিষ্ট অভ্যাগতেরা আসছেন আর করুণাদা তাঁদের 'হেপি নিউইয়ার' বলে অভ্যর্থনা করছেন। আমি করুণাদাকে বললাম, "দাদা, হেপি নয়, হ্যাপি বলুন। লোকে কী ভাববে?" করুণাদা হেসে বললেন, "দ্যাখো তারাপদ, আমার ইংলিশ কেউ মাইন্ড করবে না, যদি আমার স্কচ ভালো হয়।"

কুকুর ও বিয়ার

এ গল্প কুকুরের গল্প। কুকুরে বিয়ারপানের গল্প। তবে গল্প খুব ছোট, তার আগে বিয়ারের অন্য কথা একটু বলি। রসরাজ বলেছিলেন,

> 'আমি আর গুরুদেব
> যুগল ইয়ার,
> বিনির বাড়িতে গিয়া
> খেতেম বিয়ার।'

এই বিখ্যাত উদ্ধৃতিটি স্মৃতি থেকে তুলে আনতে একটু বোধহয় ঘুলিয়ে গেল।

যাক।

সে গুরুদেবও নেই, সে বিনিও নেই। আর বিয়ারও যথেষ্ট দুর্লভ। গুরুদেব কবে শ্বেত দ্বীপে পাড়ি দিয়েছেন, শ্বেতাঙ্গিনীদের নিয়ে তাঁর আশ্রম ভালই চলছে। আর বিনিও এই দুঃখীর দেশ ছেড়ে বিলেতে হাউস অফ কমনসে গিয়ে নাকি গবেষিকার কাজ নিয়েছে। এখন রাজারাজড়া শেখ কাউন্টদের সঙ্গে তার রঙ্গতামাশা, ওঠাবসা-শোয়া।

আর বিয়ার ? বিয়ারের দাম বাড়তে বাড়তে আরও বাড়ছে, আরও বাড়বে। বাড়ছে, বাড়বে। গত গছর এই রকম সময়ে একটি চমৎকার কার্টুন এঁকে, 'ছিঃ ছিঃ করে কুট্টি আজকালের পাতায় বিয়ারের মূল্যবৃদ্ধিকে ধিক্কার জানিয়েছিলেন।

ইচ্ছে করলে সম্পাদক মহোদয় সেই কার্টুনটি এ বছরেও পুনর্মুদ্রণ করতে পারেন। সামনের বছরও এই সময়ে করতে পারবেন। প্রত্যেক বছরই বিয়ারের দাম বেড়ে যাচ্ছে, যাবে। কেউ ঠকাতে পারবে না। এর থেকে সহজভাবে শুল্ক আদায় আর কোথাও সম্ভব নয়।

আমরা বড় হয়েছিলাম সোনালি ঈগলের তিন টাকার যুগে। সেই তপ্তকাঞ্চন বর্ণ, হিমশীতল, তিক্তমধুর সফেন পানীয়ের আস্বাদে অভ্যস্ত হতে আমাদের মফঃস্বলী ঠোঁটের অনেকদিন লেগেছিল, যেমন প্রথম প্রথম লেগেছিল কফির বেলায়।

* * *

অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়—ভদ্রলোক বাঙালির তিনটি বিষয়ে অহঙ্কার খুব বেশি। এক তার ইংরেজি জ্ঞান, প্রত্যেকেরই ধারণা তার মত ইংরেজি কেউ লিখতে পারে না। কোনও কোনও ক্ষেত্রে অবশ্য কেউ কেউ এ ক্ষেত্রে শ্বশুর এবং বাবাকে ছেড়ে দেয়, তাদের থেকে ভাল ইংরেজি শুধু তাদের শ্বশুর কিংবা বাবা লিখতে পারে, আর কেউ পারে না।

এর পরেই হল গাড়ি চালানো। যে সব বাঙালি ভদ্রলোকের গাড়ি আছে এবং নিজে চালায় তাদের প্রত্যেকেরই মনে মনে ধারণা যে তার চেয়ে ভাল গাড়ি জগৎসংসারে আর কেউ চালাতে পারে না। পারবে না।

তৃতীয় হল বিয়ার। বিয়ার পান নয়, বোতল থেকে বিয়ার গ্লাসে ঢালা। যে দুচারজন বিয়ারপায়ী বাঙালি এই দুর্মুল্যের বাজারে এখনও বিয়ারে আসক্ত রয়েছেন তাঁদের প্রত্যেকেরই দৃঢ় বিশ্বাস যে তার চেয়ে ভাল বিয়ার ঢালতে কেউ পারে না।

সে যে কি চূড়ান্ত কসরৎ, যোগব্যায়ামের কোন মার্গে উঠলে এই কৃতিত্ব, এক বিন্দুও বিয়ারের ফেনা উপচিয়ে পড়তে না দিয়ে বোতল থেকে ফেনিল বিয়ার গেলাসে ঢেলে টইটম্বুর ভরে ফেলা, এই অসাধারণ ক্ষমতা কত দিনে আয়ত্ত করা যায় তা আমার জানা নেই। গেলাস, বোতল এবং সেই সঙ্গে সমস্ত শরীর একই সঙ্গে বিভিন্ন দিক থেকে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কাত করে তিল তিল করে প্রতিটি ফেনাকে বিয়ারবিন্দুতে রূপান্তর করার যে সাধনা, প্রত্যেক বিয়ারসেবীর ধারণা সেই সাধনায় সে একাই সিদ্ধিলাভ করেছে।

কিন্তু শ্যাম্পেনের যেমন বিয়ারের ক্ষেত্রেও তাই, তার ফেনিল উচ্ছলতা তাতে যদি একটু বিয়ার নষ্ট হয় হোক, তবু সেই উপচিয়ে পড়ার মধ্যে যে মাদকতা আছে তা পান করার মাদকতার চেয়ে কিছু কম নয়।

অনেকের কাছে গ্রীষ্মের দুপুরে ঠাণ্ডা বিয়ার এক অমৃত আসব, স্বর্গীয় পানীয়। বিয়ার সম্পর্কে আমার যে স্মৃতি আছে সে এক তুষারশীতল সন্ধ্যার। ওয়াশিংটন ডি সিতে এক বিপদগামী মার্কিন প্রৌঢ়ের পাল্লায় পড়েছিলাম। মধ্য জানুয়ারির ঠাণ্ডা হিম রাত্রি. হঠাৎ তুলোর আঁশের মত হাল্কা বরফপাত শুরু হল। সেই ভদ্রলোক আমাকে নিয়ে গেলেন শহর থেকে দূরে একটি আইরিশ বারে। একটি ছোট প্রায়ান্ধকার ঘর, যার অর্ধেক দখল করে রেখেছেন অতিশয় স্থূলবপু মেমমালিকা।

সেখানে আইরিশ বিয়ার অর্ডার দেওয়া হল। রাতের অন্ধকারে অদূরবর্তী পটোম্যাক নদীর কালোজলের চেয়েও কালো সেই বিয়ার, ঘন ব্ল্যাক-কভির চেয়েও কৃষ্ণতর সেটা। ঠাণ্ডা হিম, ডিপ ফ্রিজ থেকে বড় ক্যান বার করে মোটা কাচের গ্লাসে সেটা ঢেলে দেওয়া হল। অন্য বিয়ারের মত তত ফেনা নেই। আর কি ভয়াবহ স্বাদ তার, নিমপাতা, কুইনিন, উচ্ছে সব একসঙ্গে মিশিয়ে ঘন করে সরবত করলে যে রকম স্বাদ হবে তার চেয়েও মর্মান্তিক। সেই সঙ্গে চিলি সসেজ, কালো লঙ্কার গোলায় চোবানো ছোট ছোট সসেজ, একটা জিবে ছোঁয়াতে আপাদমস্তক ঝিনঝিন করে উঠল। যেমন বিয়ার তেমনি সসেজ, সেই বরফঝরা রাতকে মনে হয়েছিল : খর নিদাঘের দ্বিপ্রহর।

বিস্তারিত বিররণে প্রয়োজন নেই। আসল গল্পটায় আসি। আমার অন্য গল্পের মতই এ গল্পটা পুরনো, বহুবিদিত, তবু না লিখলে অন্যায় হবে।

তারিখ দোসরা এপ্রিল রবিবার। আগের দিনই আন্যান্য মদের সঙ্গে বিয়ারের বাৎসরিক মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে। বেলা দ্বিপ্রহর, চৌরঙ্গী রোডে সুরাভাণ্ডার নামক পানশালায় আজ ভিড় খুব কম, পুরনো ম্যানেজার জগবাবু প্রায় একা একা বসে হাই তুলছেন।

এমন সময় একটা কুকুর প্রবেশ করল, সুরাভাণ্ডারে। সে বেশ সাব্যস্তের মত একটি চেয়ারে গিয়ে বসল এবং এক বোতল বিয়ার অর্ডার দিল। বেয়ারা গেলাস, বোতল নিয়ে এসে গেলাস ভরে বিয়ার ঢেলে দিয়ে গেল। কুকুরটি চুকচুক করে বিয়ার খেল। তারপর ধীরেসুস্থে উঠে বেয়ারার কাছে বিল চাইল। বিল দেখে দাম মিটিয়ে যখন বেরোতে যাচ্ছে, ম্যানেজার জগাবাবু আর কৌতূহল দমন করতে পারলেন না। ছুটে গিয়ে কুকুরটিকে বললেন, 'স্যার, আজ প্রায় তিরিশ বছর মদের দোকানের ম্যানেজারি করছি, কিন্তু কোনদিন কোনও কুকুরকে বিয়ার খেতে দেখিনি।'

ম্যানেজারের কথা শুনে কুকুরটি বলল, 'আর দেখতেও পাবে না। এই শেষ। বিয়ারের যা দাম হয়েছে, কুকুরদের আর কি সাধ্যি যে বিয়ার খাবে।' এই বলে কুকুরটি রাস্তায় বেরিয়ে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।
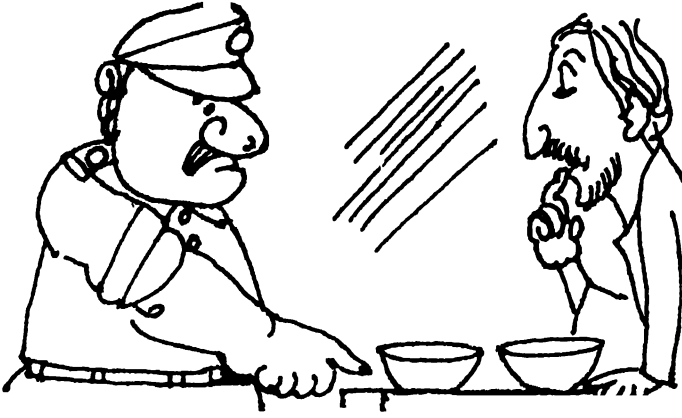
জল

জলই জীবন।

জলের কথা লিখব না, তা হতে পারে না।

ভাতের কথা যে খুব বেশি লিখেছি তা বোধ হয় নয়। কিন্তু একটা কথা সত্যি যে আজ পর্যন্ত যা কিছু হালকা লেখা লিখেছি সমস্তই ভাতের জন্যে। হয়ত সত্যিতর কথাটা হল ঠিক ভাত নয়, এটা ঘিভাতের জন্যে। শিরায় মজ্জায় রক্তে, নাড়িতে পেশীতে ধমনীতে বহমান নিতান্ত নিম্নমধ্যবিত্ত বাসনার এই হল প্রাপ্য।

এ সব বাজে কথা আপাতত থাক। এবারের বিষয়বস্তু জল। জলের কথাই বলি।

কিন্তু জলভাতের জল ঠিক সেই জল নয় যে জলের কথা সপ্তদশ শতকের এক ইংরেজ ধর্ম বিশারদ টমাস কুলার বলেছিলেন, 'জলের মূল্য আমরা কখনই বুঝতে পারি না যতক্ষণ পর্যন্ত না কুয়ো শুকিয়ে যায়।'

এই মহৎ মন্তব্যের আধুনিক ভাষান্তকরণ হওয়া উচিত, জলের মূল্য তখনই বোঝা যায় যখন গলির মোড়ের নলকূপ ভেঙে যায় এবং সেই সঙ্গে নোটিশ বেরয় খবরের কাগজে 'টালা পাম্প আগামী ছত্রিশ ঘণ্টা অনিবার্য কারণে বন্ধ থাকবে।'

আসল কথায় ফিরে আসি।

এই অনুচ্ছেদ শুধু তাঁদের জন্যে যাঁরা ভাল কিংবা মাঝারি ব্যাকরণ জানেন।

বাংলায় আলিঙ্গনাবদ্ধ দুটি শব্দের অনেক সময় অনেক রকম মানে হয়। স্থাবর সংস্কৃতে কিংবা মন্থর প্রাকৃতে ও সুযোগ ছিল না।

'সর্বনাশ! না বুঝে এ কী লিখে ফেললাম। প্রাণাধিকা পাঠিকাঠাকুরানী, তোমার পড়ার পরে আজকের লেখার পাতা পুড়িয়ে কিংবা ছিঁড়ে ফেলে দিও।

তোমার স্বামী বড় পণ্ডিত, এ সব ছেলেখেলা যেন তাঁর নজরে না আসে।'

এতখানি সাবধানতা অবলম্বন করার পর ভয়ে ভয়ে দুয়েকটা কথা বলি।

জলভাত অর্থাৎ জলের জন্য ভাত, জলের দ্বারা ভাত, যা জল তাই ভাত, জল থেকে ভাত এতসব, এ সব কিছু নয় নিতান্তই জল ও ভাত, জলভাত। আলু পটল, রাম রহিম, শরৎ বঙ্কিম, রেখা অমিতাভর মতো সামান্য দ্বন্দ্ব সমাস।

সেই কতকাল আগে জল বিষয়ে মহামতি শেক্সপিয়র লিখেছিলেন, 'খুব সম্ভব হেনরি ছয় (Henry VI) কিংবা ওই জাতের কোনও নাটকে, 'জল সেখানেই শান্ত ভাবে বয়ে যায় যেখানে নদী খুব গভীর।'

এই সামান্য জলভাতে অনিবার্য কারণেই ভাতের পরিমাণ কম জলের পরিমাণ বেশি। গরিব গৃহস্থের নুন আনতে যে পান্তা ফুরোয় সে পান্তায় ভাতের বদলে জলই বেশি থাকে।

বেশি জলের একটা গল্প মনে পড়ছে।

সাবেকি গল্প। যাঁরা জানেন তাঁরা জানেন, তাঁদের ধন্যবাদ। যাঁরা জানেন না বা ভুলে গিয়েছেন কিংবা ভুলে গিয়েছিলেন শুধু তাঁদের জন্যে এই বেশি জলের গল্পটা।

মামা-ভাগ্নে একসঙ্গে মদ খেত। সত্যের খাতিরে লেখা উচিত মামার কাছেই ভাগ্নে মদ খাওয়া শিখেছিল।

কিন্তু মামাবাবু ছিলেন সেয়ানা মাতাল, সেই যাকে গ্রামেগঞ্জে বলে জাতে মাতাল তালে ঠিক। তিনি পেগ (পানীয়ের ইউনিট) মেপে প্রয়োজনমত জল সোডা বরফ মিশিয়ে ধীরে ধীরে তারিয়ে তারিয়ে চুক চুক করে নিজের মদটুকু খেতেন।

ভাগিনেয় বাবাজী প্রথম প্রথম মামাবাবুর হাতে খড়ি পেয়ে মামাবাবুর আদর্শই অনুসরণ করেছিল।

কিন্তু সে মাত্র কয়েকদিন, কয়েক মাস। ধীরে ধীরে তার স্বরূপ প্রকাশিত হল। এবং তার সেই সুপ্রকাশিত স্বরূপ দেখে মামাবাবু বিচলিত হয়ে পড়লেন। ভাগ্নে তখন আর বরফ, জল কিংবা সোডার ধার ধারে না।

যাকে সাদা বাংলায় বলে কাঁচা, ইংরেজিতে বলে নিট্ কিংবা 'স্ট্রেইট ফ্রম দি বটল, (Straight from the bottle), ভাগ্নের যাত্রা সেই পথে।

কিন্তু একই গেলাসের ইয়ার হলেও হাজার হলেও মামা হাজার হলেও ভাগ্নে। আপন মায়ের পেটের বোনের আপন ছেলে তার এই পরিণতি মামার পক্ষে মেনে নেওয়া মোটেই সম্ভব নয়।

যখন ভাগ্নে সামনে বসে পান করে, মামা যথাসাধ্য চেষ্টা করেন গেলাসে পানীয়ের প্রবেশ মাত্র তার মধ্যে প্রচুর সাদাজল ঢেলে দেওয়া। নেহাতই কর্পোরেশনের কলের জল কিংবা গলির মোড়ের টিউবওয়েলের জল। মুখ বিকৃত করে। দাঁতে দাঁত ঘষে ভাগ্নে মামার প্রতি সামাজিক সম্মান প্রদর্শন করার সূত্রে সেই জোলো পানীয় চোখ এবং নাক বুজে খেয়ে দেয়। শুকনো জিভটাকেও একটু গুটিয়ে রাখে। তার জিভে জোলো পানীয়ের স্বাদ লাগে না। এইভাবে দিনকাল, মামা-ভাগিনেয়ের মদ্যপান ভালই চলছিল। একদিন, শুধু একদিন গোলমাল হল।

ভাগিনেয় বাবাজী সহসা বুকে বিস্তর ব্যথা নিয়ে একদিন গভীর রাতে নিজের

বাড়ির এবং প্রতিবেশীদের নিদ্রাভঙ্গ করে অ্যাম্বুলেন্সে উঠে হাসপাতাল যাত্রা করলেন।

পরদিন প্রভাতকালে খবর পেয়ে মামাবাবু হাসপাতালে ভাগ্নেকে দেখতে গেলেন।

এর পরের কাহিনী খুব সংক্ষিপ্ত, কিঞ্চিৎ আলাপ

মামা : তোর কী হয়েছে?

ভাগ্নে : বুকে জল জমে গেছে।

মামা : কী করে বুকে জল জমলো?

ভাগ্নে : তুমি সবচেয়ে ভাল জান।

মামা : আমি সবচেয়ে ভাল জানি?

ভাগ্নে : হ্যাঁ। তুমি জান। তুমি সবচেয়ে ভাল জান। তুমি বার বার আমার ড্রিঙ্কে জল মেশাতে। বলতে, বলতে জল বেশি করে নিতে।

মামা : কিন্তু তাতে কী হয়েছে?

ভাগ্নে : কী আর হয়েছে। বুকে জল জমে গেছে। এতদিন যা কিছু মদ খেয়েছিলাম সব বেরিয়ে গেছে শরীর থেকে, শুধু তুমি যে জলটুকু দিয়েছিলে সবটা বুকে বসে গেছে।

একটু আগের জলের গল্পটা বড় নির্জলা। এতক্ষণ পরে একটা জলো জলো গল্প বলি। জলের গল্প তারপরেই শেষ।

গল্পটা অকল্পনীয়। সে কবিও নেই সে দারোগাও নেই।

দারোগা সাহেব মাতাল কবিকে ফুটপাত থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন। তারপরে পরপর দুটি বাটিতে একটার নিতান্ত পরিচ্ছন্ন গভীর নলকূপের জল অন্যটিতে ভাল রাম ছয় আউন্স রেখে কবিকে বললেন, একটা গরুকে যদি বলি তাহলে সে কোনটা খাবে!' তারপর উত্তরের অপেক্ষা না করে দারোগা সাহেব বললেন, 'গরুটা রাম ছোঁবে না, জলটা খাবে।'

কবি মাথা তুলে বললেন, 'সেই জন্যেই সে গরু, আর সেই জন্যেই আমি কবি।'
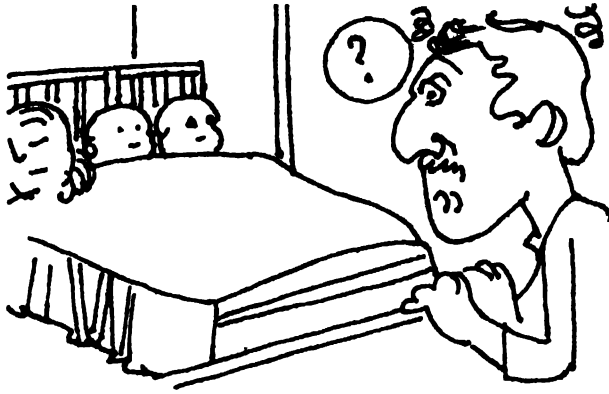
জলবৎ তরল

পরপর কয়েক সপ্তাহ ধর্মকর্ম করে, ধর্ম কথা আলোচনা করে যথেষ্টই পুণ্য সঞ্চয় হয়েছে, অন্তত আমার নিজের তাই ধারণা। এবং সেই ধারণার বশবর্তী হয়ে এবার আবার পাপের পথে পা বাড়াচ্ছি।

এবার আমার পাপের সঙ্গী পঞ্চ 'ম'কারের অন্যতম মতান্তরে বিপজ্জনকতম মদ নামক প্রাচীন পানীয়। মদের কারণেই এই নিবন্ধের নাম জলবৎ তরলং, অর্থাৎ জলের মত তরল। এই অশুদ্ধ বাক্যবন্ধটি ধ্বনি ব্যঞ্জনার লোভে এখানে ব্যবহার করলাম।

মদের ব্যাপারে ভূমিকা বিস্তৃত করে লাভ নেই, রসিক পাঠক তৃষ্ণার্ত বোধকরবেন।

প্রথমে নববধূ দিয়ে আরম্ভ করি। বিয়ের একমাসের মাথায় নববধূ অভিযোগ করলেন তাঁর স্বামী নিত্য মদ্যপান করে বাড়ি আসেন, ব্যাপারটা তাঁর খুব খারাপ লাগছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে বিয়ের আগেও মোটামুটি প্রায় এক বছর কাল উক্ত নববধূ তাঁর স্বামীর সঙ্গে প্রচুর প্রেম করেছিলেন। সুতরাং তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, 'বিয়ের আগের বারো মাস তারপর বিয়ের পরে এই এক মাস হয়ে গেল, এর মধ্যে আপনি মোটেই টের পাননি যে আপনার স্বামী মদ খান?'

নববধূটি সরলভাবে জবাব দিলেন, 'না আমি একেবারেই টের পাইনি। শুধু এই দুদিন আগে এক সন্ধ্যাবেলায় ঝড়জলের জন্যে ও বাড়ি থেকে বেরোতে পারলো না তখন আমার কেমন সন্দেহ হলো। ও কিরকম অন্যদিনের থেকে একেবারে আলাদা। সেই হাসিখুশি ভাব নেই, ঠোঁটে গুনগুন গান নেই, খিটখিটে মেজাজ, কর্কশ কথা। সেদিন আর কিছু জিজ্ঞাসা করার সাহস পেলাম না। পরদিন সন্ধ্যাবেলাও যখন আগের মত বাইরে থেকে বাড়ি এলো আবার সেই হাসিখুশি ভাব, গুনগুন গান, সাহস করে জিজ্ঞাসা করলাম, ওগো কাল কী হয়েছিল?'

নববধূর দাম্পত্য আলাপ এর চেয়ে বাড়ানো অশালীন হয়ে যাবে শুধু বলে রাখি

এই দুই সন্ধ্যার আপেক্ষিক তারতম্যে নববধূ নির্মদ ও মদমত্ত স্বামীর পার্থক্য চমৎকার টের পেয়েছিল।

শুধুই কি হাসিখুশি ভাব, ঠোঁটের ডগায় মধুর গানের গুনগুনানি—মদ মানুষকে আত্মপ্রত্যয় জোগায়, যদিও অনেক সময় সে প্রত্যয় অতি সর্বনেশে।

এক বিখ্যাত চিকিৎসক মদ্যপানের অপকারিতা বিষয়ে বক্তৃতা করেছিলেন। বক্তৃতার শেষে তাঁকে এক মদ্যপ প্রশ্ন করে, 'আচ্ছা, আপনি যে মদ্যপানের বিরুদ্ধে এত কথা বলে গেলেন আপনি কি স্বীকার করেন না যে মদ খেলে লোকে যে কোনো কাজ আরও ভালোভাবে করতে পারে?'

চিকিৎসক মহোদয় এ প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন, 'কথাটা ঠিক তা নয়। মদ খেলে লোকে কোনো কাজ ভালোভাবে করতে পারে একথা সত্যি নয়, তবে মদ খেয়ে কোনো কাজ করার সময় মনে হয় যে খুব ভালোভাবে কাজটা করছি।'

এই প্রসঙ্গে বলা উচিত যে মদ খেয়ে মানুষ সাধারণত যে কাজ করে থাকে সেগুলো মোটেই ভালো কাজ নয়। সুতরাং সেগুলো ভালোভাবে করার চেয়ে খারাপভাবে করাই বোধহয় ভালো।

চিকিৎসকের সূত্রে মাথাধরার গল্পটা এখানে বলে রাখি, খুবই ছোটো গল্প।

দুই মদ্যপের মধ্যে কথা হচ্ছে। প্রথম মদ্যপ দ্বিতীয়জনকে প্রশ্ন করলো, 'আচ্ছা ভাই মাথাধরার জন্যে তুমি কী করো?' দ্বিতীয় মদ্যপ শুকনো মুখে বললেন, 'কী আর করি? আগেরদিন রাতে যতটা পারি মদ খাই। তা হলেই সকালবেলা মাথাটা বেশ ধরে।'

মাতালদের এই প্রাতঃকালীন মাধাধরার সাহেবি নাম হ্যাং-ওভার (Hang over), মানে ঝুলে থাকা। এক প্রাতঃস্মরণীয় কথাসাহিত্যিক বলেছিলেন যে মদ খায় সেই কখনো না কখনো মাতাল হয় নয় সে মদের বদলে জল খায়। অনেকদিন পরে স্মরণ করতে গিয়ে উদ্ধৃতিটা একটু ঘুলিয়ে গেল মনে হচ্ছে, তবে কথাটা এই রকমই। এই কথাটাই একটু বাড়িয়ে বলা যায়, যে মদ খায় তারই কখনো না কখনো হ্যাং-ওভার হয় নয় যে মদের বদলে জল খায় কিংবা মদের সঙ্গে জল বেশি খায়।

মদ বেশি খেলে বা অনভ্যস্ত লোক মদ খেলে পা টলমল করে, মাথা ঝিমঝিম করে, চোখ ধাঁধা লাগে। সব জিনিস ডবল-ডবল দেখায়। টেবিলে একটা বোতল থাকলে মনে হয় দুটো, দুটো গেলাস থাকলে মনে হয় চারটে।

এক যুবকের স্ত্রী সন্তান হতে প্রসূতিসদনে গেছে। প্রথম সন্তান, আনন্দে, উত্তেজনায় স্ত্রীকে হাসপাতালের ভেতরে পৌঁছে দিয়ে যুবকটি পাশেই একটা বারে মদ খেতে গেছে। কয়েক ঘণ্টা বাদে মদ খাওয়া সাঙ্গ হলে স্খলিত চরণে প্রসূতিসদনে পৌঁছে সে সুসংবাদ পেল তাঁর স্ত্রী নিরাপদে প্রসব করেছে। প্রসূতিসদনের জমাদারকে দুটো টাকা বখশিস দিয়ে সে জানলার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখতে পেল তার স্ত্রীর শয্যার পাশে পাশাপাশি দুটো বাচ্চা শোয়ানো রয়েছে।

এই দৃশ্য দেখে হৃষ্টচিত্ত যুবকটি হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে গেলো কর্পোরেশন অফিসে যমজ বাচ্চার জন্ম রেজিস্ট্রারি করতে।

সেখানে বার্থ রেজিস্ট্রেশনের ঘরে এক কেরানিবাবু বিরাট মোটা খাতা আগলিয়ে বসে রয়েছে। যুবকটি তাঁকে গিয়ে বললো, 'দাদারা, এইমাত্র আমার স্ত্রী যমজ বাচ্চার জন্ম দিয়েছে। তাই লেখাতে এসেছি।'

কেরানিবাবু খাতায় কী লেখালেখি করছিলেন, তিনি খাতা থেকে মুখ বললেন, 'দাদারা বলছেন কেন, এখানে তো আমি একা বসে রয়েছি।'

এই কথা শুনে যুবকটির সম্বিৎ ফিরে এলো, পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে কেরানিবাবুকে বললেন, 'দাদা আগেই লিখবেন না। আমি আরেকবার হাসপাতাল থেকে দেখে আসি সত্যিই বাচ্চা দুটো না একটা। ভুল দেখিনি তো?'

মাতাল ও যমজ বিষয়ে আরেকটি বিখ্যাত গল্প আছে।

দুই যমজ ভাই একদিন ঠিক করলো যে তারা কোনো এক মাতালকে বেছে তাকে নিয়ে একটু মজা করবে। সেদিন সন্ধ্যায় তারা দু'জনে একই রকমের পোশাক পরলো, একই রঙের টাই, মাথার চুলের সিঁথি একইভাবে আঁচড়ানো।

দুজনে এক পানশালায় গিয়ে দরজার কাছের টেবিলে বসলো এবং সামান্য পান করতে লাগলো। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে এক মদ্যপ, তখন তার টলটলায়মান অবস্থা, কিছু আগেই আশেপাশেই কোথাও যথেষ্ট পান করেছে, বারের মধ্যে ঢুকেই এই দুজনকে দেখে থমকিয়ে দাঁড়ালো। তারপর দুহাত দিয়ে চোখ কচলিয়ে খুব সন্তর্পণে পাশের একটা টেবিলে গিয়ে একটা পানীয় নিয়ে সাবধানে ও ধীরে পান করতে লাগলো। এবং সেইসঙ্গে এই ভ্রাতৃযুগলকে খুব সন্দেহের দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো।

কয়েক মিনিট এরকম চলার পর যমজদের মধ্যে একজন উঠে সেই মদ্যপের টেবিলে গিয়ে বললো, 'দাদা, আমরা সত্যি যমজ। আপনার তেমন নেশা হয়নি যে ভাবছেন ডবল দেখছেন।'

লোকটি চিন্তিতভাবে দুই ভাইয়ের দিকে আবার তাকালো, তারপর খুব ঠাণ্ডা গলায় বললো, 'সত্যি বলছেন, আপনারা চারজনই যমজ?'
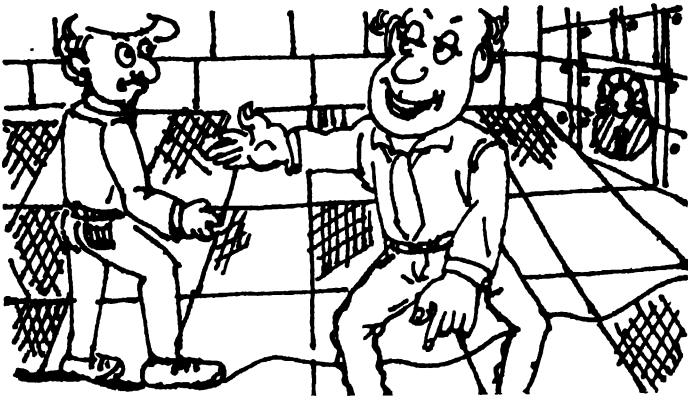
পিয়ো হে পিয়ো

মদের ব্যাপারে আমার দুর্বলতা অপরিসীম এবং সুবিদিত। তবে আত্মপক্ষ সমর্থনে একটি কথাই বলতে পারি যে মদের ব্যাপারে লেখা নিয়ে যতটা আমার দুর্বলতা, পান করার ব্যাপারে তা নয়।

স্বীকার করতে দ্বিধা নেই এই প্রাচীন, ভুবনমনোমোহিনী পানীয়টির প্রতি আমার কিঞ্চিৎ পক্ষপাত রয়েছে, বিশেষ করে আমার লেখায়। এক বাক্যে বলা উচিত, আমি সুরার গুণগ্রাহী।

চার্লস ল্যাম্ব, সেই বহুখ্যাত ইংরেজ লেখক, স্বপ্ন দেখেছিলেন, যদি কখনো বিয়ে করেন তাহলে জমিদারের মেয়ে বিয়ে করবেন এবং তখন তিনি সুখে পানশালায় বসে ঠাণ্ডা ব্রাণ্ডি জল দিয়ে পান করতে পারবেন।

ঠিক এ ধরনের স্বপ্ন দেখা আমার অভ্যাস নেই। আবার মহাকবি ওমর খৈয়ামের মত আমি পান করা সম্পর্কে এরকম কথাও বলতে পারবো না :—

'পান করো। কারণ তুমি জানো না কোথা থেকে এসেছো,
পান করো। কারণ তুমি জানো না তুমি কোথায় যাবে।'

ব্যাপারটা একটু খাপছাড়া হয়ে যাচ্ছে, সুতরাং আরও দু'একটা খাপছাড়া ঘটনা বলে নিচ্ছি।

মার্কিন দেশে এক ছোট শহরের এক শেরিফ ভয়ঙ্কর মদ্যপান বিরোধী। তিনি বিশেষ করে অপছন্দ করেন মদ খেয়ে গাড়ি চালানো। যদি কখনো কোনো মাতাল ড্রাইভার তাঁর হাতে পড়ে তা হলে সেই মাতালের মোটেই অব্যাহতি নেই। তিনি সোজা সেই ড্রাইভারকে নিয়ে যান জেলখানায়, সেখানে জেলখানার বাঁধানো উঠানে নিজের হাতে টেনে দেন চক দিয়ে লম্বা সাদা লাইন। তারপর ড্রাইভারকে নির্দেশ দেন,—এই লাইনের উপর দিয়ে সরাসরি হেঁটে যাও, বাঁয়ে ডাইনে যে কোনো দিকে হেলে পড়লে সাজা হবে।

কিন্তু মজার কথাটা এই যে শেরিফ সাহেব কখনোই চক দিয়ে লাইনটা সোজা টানতে পারেননি। তাঁর কারণ আর কিছুই নয়, তিনি নিজেই সব সময়ে মদে চুর থাকেন, তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না উবু হয়ে উঠোনে বসে সোজা লাইন টানা। সেই আঁকা বাঁকা লাইন দিয়ে টলতে টলতে মাতাল ড্রাইভারেরা চলে যায় অনায়াসে, শেরিফ সাহেব তাদের ধরতে পারেন না, পারেন না তাদের সাজা দিতে।

আরেকটি হাস্যকর ঘটনা, সেটিও মার্কিনী এবং সেটিও গাড়ি চালানো সংক্রান্ত। মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালানোর অপরাধে এক ব্যক্তিকে পুলিশ আদালতে চালান দেয়। সে তার জবানবন্দিতে বলে,—আমার মত্ত অবস্থায় গাড়ি না চালিয়ে উপায় নেই। কারণ আমার বৌ আমাকে বাড়িতে মদ খেতে দেয় না। তাই পুরো বোতলটা গাড়িতে বসে আমাকে খেয়ে নিতে হয়।

এর পরের আরেকটি দিশি ঘটনা বোধ হয় তেমন হাস্যকর নয়, কিন্তু অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালানোর দায়ে গ্রেপ্তার হন এক ভদ্রলোক ; পরে পুলিশ তদন্ত করে জানতে পারে যে ভদ্রলোক একজন মোটর ভিহিকল ইনস্পেক্টর, তাঁর বৃত্তি হলো গাড়ির ড্রাইভিং লাইসেন্সের টেস্ট নেয়া এবং সবচেয়ে বড় কথা তিনি নিজে গাড়ি ঠিকমত চালাতে জানেন না। শুধু তাই নয়, তাঁর নিজেরই কোনো রকম গাড়ি চালানোর লাইসেন্স নেই।

মত্ততা বিষয়ক আইন-আদালতীয় ঘটনা লিখে শেষ করা যাবে না। বরং আদালতের প্রাঙ্গণ ছেড়ে এবার আমরা সরাসরি পানশালায় প্রবেশ করি।

পানশালার এই গল্পটির সম্পূর্ণ দায়িত্ব এবং কৃতিত্ব আমার প্রিয় বন্ধু সুরসিক শ্রীযুক্ত হিমানীশ গোস্বামীর, আমি অনুলেখক মাত্র।

এক সুরাবিলাসী নিয়মিত পানশালায় যান। কিন্তু তাঁর স্বভাব কিঞ্চিৎ বিচিত্র, তিনি সব সময়ে একসঙ্গে দু গেলাস পানীয়ের অর্ডার দেন। ফুরিয়ে গেলে তারপর আবার দু গেলাস। আবার দু গেলাস। সব সময়ে একসঙ্গে দু গেলাস, কিছুতেই এক গেলাস নয়।

একদিন এক দুঃসাহসী, কৌতূহলী বেয়ারা ঐ ভদ্রলোককে বিনীত ভাবে প্রশ্ন করলো,—'আচ্ছা স্যার একটা কথা, যদি কিছু মনে না করেন।' ভদ্রলোক গেলাস থেকে ঠোঁট তুলে নিয়ে জানতে চাইলেন,—'কী কথা?' বেয়ারা মাথা চুলকিয়ে বললো,—'না স্যার, তেমন কিছু নয়, এই আপনি এক সঙ্গে একেক বারে দু গেলাস করে নেন কেন?'

এই প্রশ্নে ম্লান হেসে ভদ্রলোক এক করুণ কাহিনী শোনালেন—'আমার প্রাণের বন্ধু ছিলো প্রাণেশ। প্রাণেশ আর আমি সব সময়ে এক সঙ্গে মদ খেতাম। প্রাণেশ খুব ভালবাসতো মদ খেতে। সে আজ কিছুদিন হলো মারা গেছে। কিন্তু আমার আর একা মদ খেতে ইচ্ছে করে না। তাই সব সময়ে দু গেলাস নিই। এই গেলাস প্রাণেশের জন্যে, আর অন্য গেলাস আমার।'

এর কিছুকাল পরে হঠাৎ দেখা গেলো স্বর্গীয় প্রাণেশের প্রাণের বন্ধু সেই ভদ্রলোক

পানশালায় এসে দু গেলাসের বদলে এক গেলাসের অর্ডার দিয়েছেন। এই নিয়মভঙ্গ দেখে আগের দিনের সেই দুঃসাহসী বেয়ারা বললো,—'কি হলো স্যার, আজকে আপনার বন্ধুর জন্যে আরেক গেলাস নিলেন না?' ভদ্রলোক একটু ম্লান হেসে গেলাসে ছোট একটা চুমুক দিয়ে বললেন,—'এটা তো আমার বন্ধুরই গেলাস। আমার গেলাস লাগবে না। আমি কাল থেকে মদ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।'

অন্য এক অদ্বিতীয় মাতালের গল্প বলি। তিনি একদিন দুপুর গড়িয়ে বিকেল তিনটার সময় অফিস গেলেন। অফিসের ম্যানেজার তাঁকে ধরলেন,—'কী ব্যাপার রমেশবাবু? বেলা তিনটের সময় অফিসে হাজিরা দিতে এসেছেন, ছুটির সময়ই-তো হয়ে গেলো।'

নতমুখে রমেশবাবু বললেন, 'স্যার, ব্যাপারটা খুবই অন্যায় হয়ে গেছে কিন্তু দোষটা ঠিক আমার নয়।'

শুনে আরো রেগে গিয়ে স্যার মহোদয় প্রশ্ন করলেন, 'দোষ যদি আপনার না হয়, তাহলে আপনি দেরি করে আসার সব দোষ নিশ্চয় আমার।'

রমেশবাবু আরো নরম হয়ে গেলেন, 'না স্যার। কথাটা ঠিক তা নয়, ব্যাপারটা আমি আপনাকে বুঝিয়ে বলি। আপনি তো জানেন স্যার কাল ছুটি ছিলো। সন্ধ্যাবেলা বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে বসে একটু নেশা করলাম। আমি আবার মাত্রা ঠিক রাখতে পারি না। রাত তিনটে পর্যন্ত মদ খেয়ে চুর হয়ে বাড়ি ফিরলাম।'

স্যার অস্থির হয়ে উঠলেন, 'কী বলবেন বুঝতে পেরেছি।'

ক্ষীণ প্রতিবাদ করলেন রমেশবাবু, 'না স্যার, বুঝতে পারেননি। আমি বেলা পর্যন্ত ঘুমোইনি, সকালবেলা হ্যাংওভার ছিলো, কিন্তু ঠিক সময়েই ঘুম থেকে উঠে আবার ঘুমিয়ে পড়ি। দ্বিতীয়বার ঘুম থেকে উঠে দেখি দশটা বেজে গেছে। এদিকে তখন বেশ নেশা রয়েছে। তাড়াতাড়ি উঠে দাড়ি কামাতে গেলাম। আয়নায় তাকিয়ে দেখি আমি নেই। কেমন খটকা লাগলো। বুঝলাম, আমি অফিসে চলে গেছি।'

চোখ গোল গোল করে স্যার বললেন, 'তারপর।'

রমেশবাবু বললেন, 'আর তারপর। আবার ঘুমোলাম, দুটোর ঘুম থেকে উঠে নেশা কাটতে ব্যাপারটা ধরতে পারলাম। না, আমি অফিস যাইনি শুধু আয়নার কাচটা খুলে গেছে, তাই নিজেকে দেখতে পাইনি। ভুল বোঝা মাত্র এই ছুটে এলাম।'

আজগুবি গল্প ছেড়ে প্রত্যক্ষ ঘটনায় ফিরে যাচ্ছি। আবার মাতাল ও আদালত।

কলকাতার ব্যাঙ্কশাল স্ট্রিটের মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এক ব্যক্তিকে পুলিশ অভিযুক্ত করে মাতলামি এবং রাস্তায় হল্লা করার অভিযোগে। লোকটি জামিনে খালাস ছিলো কিন্তু মামলার দিন আদালতে অনুপস্থিত হওয়ায় তার নাম ওয়ারেন্ট বেরোয়। পরের তারিখে পুলিশ তাকে আদালতে উপস্থিত করলে সে আগের তারিখে তার অনুপস্থিতির জন্যে দুঃখ প্রকাশ করে এবং জানায় আগের তারিখে তার উপায় ছিলো না আদালতে আসার, কারণ সে তখন ছিলো হাওড়া জেলে। জেলে কেন ছিলো একথা আদালত জানতে চাওয়ায় সে নির্বিকারভাবে বলে, 'একটা ছোট মামলায়।

মাতলামি আর হল্লা করার জন্যে পুলিশ আমাকে চালান দিয়েছিলো।'

পানীয় বিযয়ক এই তরল কথিকা একটি মহাজন বাক্য দিয়ে শেষ করি। মহামতি শেক্সপীয়ার আক্ষেপ করেছিলেন 'ওথেলো' নাটকে (দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য) :—

'—হায় ঈশ্বর। মানুষেরা কেন তাদের বুদ্ধিকে ঢাকা দেয়ার জন্যে শত্রুকে গ্রহণ করবে তাদের মুখের মধ্যে ; কেন তারা আনন্দে, উত্তেজনা আর হৈ হল্লায় মেতে নিজেদের পশুতে রূপান্তরিত করবে?'

মহাকবির এই জিজ্ঞাসার উত্তর আমার জানা নেই।

আবার মাতাল

মদের নেশা বড় মারাত্মক, একবার ধরলে আর সহজে ছাড়া যায় না। সিগারেটের নেশা সম্পর্কে যে ভদ্রলোক সেই বিখ্যাত উক্তিটি করেছিলেন, 'সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দেওয়া খুব সহজ, আমি বহুবার ছেড়েছি,' তাঁর বোধহয় মদের নেশা সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিলো না।

বহুবার নয়, অজস্রবার নয়, প্রায় প্রতিদিন রক্তচক্ষু, ভারিমাথা গভীর হ্যাঙওভার নিয়ে অনেক বেলায় ঘুম থেকে খুব কষ্টে উঠে এক পেয়ালা কালো কফি কিংবা এক গেলাস লেবুজল খেতে খেতে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মদ্যপ মনে মনে নিজের কান মলে প্রতিজ্ঞা করেন, 'আর নয়, আজ থেকে আর মদ্যপান একেবারেই নয়।'

বলা বাহুল্য, প্রতিদিনই সূর্যাস্তের কিছু আগে এবং কিছু পরে সে প্রতিজ্ঞা জলে কিংবা সোডায় ভেসে যায়, এবং শুধু জল কিংবা সোডা নয় তার সঙ্গে কিছু হুইস্কি কিংবা অন্য কঠিন পানীয়ও থাকে।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য লিখেছিলেন, চিরকুমার সভার সেই চিরস্মরণীয় অক্ষয়ের একটি তরল গানের মধ্যে,

'অভয় দাও তো
বলি আমার wish কী—

একটি ছটাক সোডার জলে
পাকি তিন পোয়া হুইস্কি।'

স্বীকার করা উচিত অক্ষয়বাবুর পানীয়ে সোডার জলের পরিমাণ বড় কম, সেটা একটু বেশি কড়া।

তবে এর চেয়েও কড়া পানীয়ের একটা ধার্মিক গল্প আছে। গল্পটা সকলেরই জানা ; আমি প্রথমে শুনেছিলাম স্বর্গীয় কবি সুশীল রায়ের কাছে প্রায় পঁচিশ বছর আগে।

এক গুরুদেব বিনা নোটিশে গেছেন সন্ধ্যাবেলা তাঁর এক শিষ্যের বাড়িতে। আভূমি প্রণত হয়ে শিষ্যমহোদয় জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রভু, আপনি এই অসময়ে?' সেদিন শিষ্যমহোদয়ের গৃহে বিরাট পার্টি, অনেক বন্ধুবান্ধব আসবে, অনেক পানীয়ের বন্দোবস্ত। মাহেন্দ্রক্ষণের সামান্য পূর্বে গুরুদেবের আগমনে তিনি প্রমাদ গনলেন অথচ গুরুদেবকে ফেলাও যায় না।

যাই হোক, শিষ্যের ঐ প্রশ্নে গুরুদেব মোটেই আহত বা অপ্রস্তুত হলেন না। তিনি বললেন, 'এই দিক দিয়া যাইতেছিলাম হঠাৎ খুব তৃষ্ণার্ত বোধ করায় আমি তোমার গৃহ নিকটে জানিয়া আসিলাম।'

শিষ্যগৃহে সেই সন্ধ্যায় পানীয়ের ছড়াছড়ি। সুতরাং গুরুদেবের তৃষ্ণা নিবারণে কোনো অসুবিধাই হওয়ার কথা নয়। এর পরে গুরুশিষ্যের কথোপকথন বিনা মন্তব্যে উপস্থিত করাই ভালো :

শিষ্যমহোদয় : গুরুদেব, লেমনেড আছে, খাবেন?

গুরুদেব : না, লেমনেড নহে।

শিষ্যমহোদয় : সরবত করে দেবে?

গুরুদেব : না, সরবত নহে।

শিষ্যমহোদয় (কিঞ্চিৎ চিন্তিত) : চা?

গুরুদেব : না, চা নহে।

শিষ্যমহোদয় (অধিক চিন্তিত) : এক কাপ ঠাণ্ডা কফি?

গুরুদেব : না, ঠাণ্ডা কফি নহে।

শিষ্যমহোদয় (বহু চিন্তা করে) (বহু ইতস্তত করে) (বহু দ্বিধা করে) : তা হলে, হুইস্কি-সোডা?

গুরুদেব : না, সোডা নহে।

চিরকুমারসভার অক্ষয় এক ছটাক সোডার জলে তিন পোয়া হুইস্কি খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে গুরুঠাকুর এক কাঠি উপরে। তিনি বিন্দুমাত্র সোডা, জল কিংবা সোডার জলের মুখাপেক্ষী নন, তাঁর চাই খাঁটি, নির্ভেজাল হুইস্কি।

রবীন্দ্রনাথের জন্মের পরের বছরে মারা গিয়েছিলেন এক সরল, প্রকৃতিবিলাসী, নির্জনতাপ্রিয় মার্কিন দার্শনিক। তাঁর সব কথা সকলের গ্রহণযোগ্য নয়। 'বনের মধ্যে জীবন' নামক আশ্চর্য গ্রন্থের রচনাকার সেই হেনরি ডেভিড থরো (নাকি থ্যরু) অকপটে বলেছিলেন, 'যে কোনো জ্ঞানী লোকের একমাত্র পানীয় হলো জল।'

জলই জীবন। জলের ব্যাপারটা আগেও বলেছি, এবার আরেকবার বলি।

বাংলা প্রবচনে আছে, 'শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল।' কথাটা খুবই সত্যি কিন্তু এই প্রবচনে একটা গোলমাল আছে, ব্যাপারটা খুব সোজা, যে কেউ বুঝতে পারবেন।

কথাটা হলো, শুঁড়ি যদি নিজেই মাতাল হন, তবে তাঁর কোনো সাক্ষীর প্রয়োজন নেই। এই রকম একজন শুঁড়ি অর্থাৎ মদ্য ব্যবসায়ী সারা জীবন মদের ব্যবসা করেছেন, শুধু ব্যবসা নয় সারা জীবন ধরে শুধু মদ খেয়েছেন, মদ ছাড়া আর কোনো পানীয় খাননি। এ বিষয়ে তিনি অপরিসীম দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। তাঁকে দু'চার রকম যে কোনো জাতের যে কোনো মদ মিশিয়ে দিলে তিনি এক চুমুক খেয়েই বলে দিতে পারতেন তার মধ্যে কী মদ কী পরিমাণে আছে। তাঁকে তাঁর বন্ধুরা বহুবার পরীক্ষা করে দেখেছেন নানা রকম গোলমেলে মিশ্রণ দিয়ে, তিনি অনায়াসে চোখ বুজে বলে দিয়েছেন, 'আদ্ধেক হুইস্কি, বাকিটা রাম, কিছুটা জিন, একটু ভদকাও আছে', কিংবা 'জিনিসটা ভালো নয়, সস্তা হুইস্কির সঙ্গে অনেকটা বাংলা মিশিয়েছো।'

শুধু একবার বন্ধুরা তাঁকে জব্দ করতে পেরেছিলো। তাঁকে এক গেলাস সাদা জল, নির্ভেজাল, নির্জলা জল কুঁজো থেকে ঢেলে দিয়ে বলা হয়েছিলো, 'খুব ভেবে বলো এ জিনিসটা কী?' শুঁড়ি ভদ্রলোক এক ঢোঁক, দুই ঢোঁক, বেশ কয়েক ঢোঁক খেলেন, তারপর ভুরু কোঁচকালেন, খুব চিন্তা করলেন, তারপর বললেন, 'খেতে তো খারাপ নয়। তবে ঠিক ধরতে পারছি না। আর সাধারণ কাস্টমার এটা খাবে বলে মনে হচ্ছে না।'

এত সব জোলো কাহিনীর পরে এবার একটা আইনানুগ গল্প বলি। এক উত্তরাধিকারীহীন নিঃসঙ্গ মৃত্যুর পরে আদালতের লোক গেছে তাঁর সমস্ত পরিত্যক্ত জিনিসপত্রের জিম্মা নিতে। তালিকা বানিয়ে সব জিনিসের জিম্মা নিতে হবে। যে নাজির সাহেব এই কাজে গিয়েছেন তিনি প্রথম তালিকা বানালেন, 'খাট এক, চেয়ার দুই, টেবিল এক, বিছানাপত্র, জামাকাপড়, ...হুইস্কি এক বোতল...।' কিছুক্ষণ পরে আরো জিনিস তালিকায় ঢুকতে লাগলো সেই সঙ্গে হুইস্কি ১ বোতল কেটে লিখলেন হুইস্কি আধ বোতল। আরো কিছুক্ষণ পরে তালিকা আরো বাড়ছে সেই সঙ্গে আধ বোতল কেটে লিখলেন হুইস্কি সিকি বোতল। অবশেষে যখন সম্পূর্ণ তালিকা তৈরি হলো, সেই দীর্ঘ তালিকার শেষে দেখা গেলো লেখা আছে, 'হুইস্কি খালি বোতল একটি' এবং তারও শেষে অসংলগ্ন হস্তাক্ষরে লেখা 'উড়ন্ত কার্পেট এক'।

পানশালার একটি আজগুবি গল্প দিয়ে মাতাল কাহিনী শেষ করি। একদিন এক পানশালায় একটা হুলো বেড়াল গিয়ে এক পেগ হুইস্কি এবং একটা আইসক্রিম অর্ডার দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে দুটো মিশিয়ে খেয়ে নিয়ে বিল মিটিয়ে চলে গেল। পাশের টেবিলে দুই ভদ্রলোক মদ খাচ্ছিলেন। একজন সঙ্গীকে বললেন, 'বেড়ালের ব্যাপারটা দেখলে? অবাক কাণ্ড!' দ্বিতীয়জন নির্লিপ্তভাবে জবাব দিলেন, 'এতে অবাক হবার কী আছে? আমি নিজেও আইসক্রিম দিয়ে হুইস্কি খেতে খুব ভালোবাসি। তুমিও খেয়ে দেখো ভালো লাগবে।'

হে মাতাল, অমোঘ মাতাল

ইংরেজি প্রবাদ আছে, পেয়ালা ও *ঠোঁটের* মধ্যে বহু কিছু ফসকিয়ে যায়। এক বিজ্ঞ মাতাল এই বিখ্যাত প্রবাদের উল্লেখ করে বলেছিলেন, 'তাই আমি আর পানীয় পেয়ালায় ঢালি না, সরাসরি বোতল থেকে মুখে ঢেলে খাই।'

বোতল বা পানীয়ের গল্প কত যে শুনলাম আর পড়লাম, আর তাই নিয়ে ছাই ভস্ম কত কি যে এ যাবৎ লিখলাম কিন্তু এর কোনো শেষ নেই। যাই লিখি না কেন এখন, এর কোনো গল্পই নতুন নয় আবার কোনো গল্পই পুরোনো নয়।

প্রথমে সুরেশ আর পরেশের গল্পটাই ধরা যাক। সুরেশ এবং পরেশ দুজনে ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং কৃতবিদ্য মদ্যপ। বহু, বহু, গ্যালন মদ্যপানের পর অবশেষে দুজনে একদিন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলেন, আর নয়, আর মদ খাওয়া নয়। ছেড়ে দেওয়া ঠিক করে তারপরে নানা দিক বিবেচনা করে এক বোতল ব্র্যান্ডি সুরেশের কাছে রেখে দেওয়া হলো, যদি দুজনের মধ্যে কেউ কখনো অসুস্থ হয়ে পড়েন তবে ব্র্যান্ডিটা তাঁর কাজে লাগবে।

একদিন কোনো রকমে কাটলো, দুদিনের মাথায় পরেশ আর সহ্য করতে পারলেন না, সুরেশের বাড়িতে সন্ধ্যায় গিয়ে বললেন, 'ভাই সুরেশ, শরীরটা বড় খারাপ লাগছে। ব্র্যান্ডিটা একটু বার কর তো।' অনুরোধ শুনে সুরেশ করুণ মুখ করে বললেন, 'ভাই পরেশ ব্র্যান্ডি তো আর এক ফোঁটাও নেই। কালকেই আমি এমন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম পুরো বোতলটা খেয়েও সুবিধে হয়নি, শরীরটা আজো কেমন যেন ম্যাজ-ম্যাজ করছে।'

সুরেশ-পরেশের এই কাহিনীটি অবশ্যই কল্পিত, কিন্তু স্বাস্থ্যের সঙ্গে মদের কিছু একটা যোগ রয়েছে। স্বাস্থ্যের অজুহাতে মদ্যপান শুরু করে কত লোক যে প্রতিষ্ঠিত মদ্যপে পরিণত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। বিলিতি মদ্যপানের আরম্ভেই অন্যের

স্বাস্থ্যপানের রীতি আছে। এবং সেই জন্যেই সাহেবি নিষেধাজ্ঞা আছে, 'দেখো অন্যের স্বাস্থ্যপান বেশি করতে গিয়ে নিজের স্বাস্থ্য নষ্ট করো না।'

মদের গল্পে স্বাস্থ্যের কথা ভেবে লাভ নেই। আমার নিজের একটা পুরনো অভিজ্ঞতার কথা বলি।

কয়েক বছর আগে দমদমের এক প্রান্তে এক প্রাচীন বাগানবাড়িতে একটা পার্টিতে নেমন্তন্ন ছিলো। পান ভোজনের অতিরিক্ত অত্যাচার এড়ানোর জন্যে একটু দেরি করেই গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখলাম গৃহকর্তা তখনই প্রায় বেসামাল। আমরা নিমন্ত্রণ সেরে চলে আসবার অনেক আগেই তিনি দোতলার বারান্দার একপাশে একটা খাটিয়ায় শয্যাগত হয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হলেন।

গৃহকর্তাকে বাদ দিয়েই বেশ অস্বস্তির মধ্যে আমরা আমাদের খাওয়াদাওয়া সারলাম। প্রচণ্ড মশা। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মশার আক্রমণ বাড়তে লাগলো। আমরা চলে আসার সময় দেখলাম ঘুমন্ত গৃহকর্তাকে মশায় ছেঁকে ধরেছে। ভদ্রলোকের খাস ভৃত্য কাছেই ছিলো, তাকে বললাম, খাটিয়ার উপরে একটা মশারি টাঙিয়ে দিতে। ভৃত্যটি বলল যে, তার মনিব মশারির নিচে শোয়া পছন্দ করেন না। ভোরবেলা উঠে বিছানায় মশারি টাঙানো দেখলে খেপে যাবেন।

আমি তবু বললাম, কিন্তু মশায় কামড়ে তো শেষ করে দেবে। চতুর ভৃত্যটি এতক্ষণে আসল কথাটি বললো, 'বাবুকর্তা যখন বাগানবাড়িতে আসেন এই খাটিয়াতেই এইভাবে মশারি ছাড়াই শোন। তাতে তেমন কিছু হেরফের হয় না।' আমাদের সপ্রশ্ন দৃষ্টির জবাবে সে জানালো, প্রথম রাতে কর্তা এত বেহুঁশ থাকেন মশা কেন বাঘে কামড়ালেও টের পাবেন না। আর শেষ রাতের দিকে কর্তার মদমিশ্রিত রক্ত সন্ধ্যা থেকে পান করে মশাগুলো এতো বেহুঁশ হয়ে যায় যে তারা আর কামড়ায় না।

এরকম ক্ষেত্রে মদ বন্ধুরই কাজ করে মশার আক্রমণ থেকে রক্ষা করা কম কথা নয়। কিন্তু তবু মদ বন্ধু না শত্রু এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আজও হয়নি।

এক পাদ্রী একবার তাঁর সাপ্তাহিক ভাষণে উপদেশ দিয়েছিলেন শত্রুকে ভালোবাসতে। কয়েকদিন পরে শ্রোতাদের একজনের সঙ্গে তাঁর রাস্তায় দেখা, সে এক বোতল হুইস্কি হাতে বাড়ি ফিরছে। তিনি বোতলবাহককে বললেন, 'সর্বনাশ, মদ নিয়ে বাড়ি যাচ্ছো, মদ তো মানুষের শত্রু।' লোকটি বোতলটাকে শক্ত করে বুকে জড়িয়ে ধরে পাদ্রীকে বললো, 'কিন্তু পাদ্রীসাহেব, আপনিই না সেদিন বললেন, শত্রুকে ভালোবাসতে, তাইতো ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি।'

বন্ধুত্বের অন্য রকম একটা কাহিনী আছে। এক ভদ্রলোক আগে ব্যারাকপুরে থাকতেন, কিছুদিন হলো বাসাবদল করে কলকাতায় চলে এসেছেন। এক শনিবার সন্ধ্যাবেলা পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে ব্যারাকপুরে গেলেন। যথারীতি আড্ডা, গল্পগুজব, তারপর প্রথমে এক বোতল, পরে আরেক বোতল হুইস্কি আনা হলো, ভদ্রলোক আর তাঁর পুরনো তিন-চারজন বন্ধু মনের আনন্দে পুনর্মিলন উৎসব

উদযাপন করলেন।

রাত যখন প্রায় এগারোটা, যখন সকলেরই অবস্থা টলমল, লাস্ট ট্রেনের আর দেরি নেই। সবাই মিলে দুটো রিকশা ডেকে চললেন স্টেশনে। তাঁরা যখন স্টেশনে ঢুকেছেন তখন শেষ ট্রেন প্ল্যাটফর্মের থেকে ছাড়ছে। সবাই দৌড় দিলেন ট্রেনের দিকে।

এর পরের দৃশ্য, শূন্য প্ল্যাটফর্মে যাঁর কলকাতায় ফেরার কথা তিনি হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে আছেন, দূরে দ্রুতগতিতে ট্রেন অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে আর সেই ট্রেনে চলে যাচ্ছেন ব্যারাকপুরের বন্ধুত্রয়, যাঁরা সি-অফ করতে অর্থাৎ বিদায় জানাতে এসেছিলেন।

মদ্যপানের পর সুষ্ঠুভাবে বিদায় গ্রহণ করা খুব সোজা ব্যাপার নয়। কেউ টলতে টলতে বেরিয়ে যায়, কারো বেরোনোর ক্ষমতা থাকে না, কার্পেটের এক প্রান্তে কিংবা সোফার ওপর পা ছড়িয়ে গড়ায়, কেউ অহেতুক ঝগড়া বাধিয়ে গালাগাল করতে করতে এবং ভবিষ্যতে আর কখনো আসবে না জানাতে জানাতে নিষ্ক্রান্ত হয়। আরো এক ধরনের লোক আছে, তারা খুব আমুদে আর বিলাসী হয়ে পড়ে, এদের কেউ কেউ অন্যের ঘাড়ে বা পিঠে উঠে বেরোনোর চেষ্টা করে। আবার এমন মাতালও পাওয়া যায়, অন্যকে ঘাড়ে বা পিঠে তোলাতেই তার আনন্দ। এরা অনেকসময় আনন্দের আতিশয্যে পার্টিস্থ কোনো মহিলাকে কাঁধে তুলতে চায়, তখনই বিপত্তি।

তবে এসব বিপত্তির ব্যাপারে অনেক মদ্যপই যথেষ্ট সচেতন। এক খ্যাতনামা মাতালকে দেখেছি, নাম বলা বারণ, তিনি পার্টিতে এসে দু পেগ পান করার পরই সবার কাছে 'গুড বাই' 'গুড নাইট' বলে বিদায় প্রার্থনা করেন, খুবই বিনীতভাবে। তাঁকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, 'সেকি আপনি এখনই, এত তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে নাকি?' তিনি মধুর হেসে জবাব দেন, 'না তা নয়, তবে যখন যাবো তখন তো আর বিদায় গ্রহণ করার মতো অবস্থা থাকবে না তাই আগেই বিদায়ের ব্যাপারটা সেরে নিচ্ছি।'

মাতালের কাণ্ডজ্ঞান

এবার গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা। বহু জায়গা থেকে বহু গল্প চুরি করে সঙ্গে কিছু গোঁজামিল দিয়ে এতকাল তো চালিয়ে এলাম। অনেকেই সেটা দেখেও দেখেন না, খেমাঘেন্না করে ছেড়ে দেন।

এইভাবে আমার সাহস বেড়ে গেছে। এইবার দেশ পত্রিকার খোদ সম্পাদক মহোদয়ের গল্প দিয়েই শুরু করবো। শ্রীযুক্ত সাগরময় ঘোষের বলা এই গল্পটি অনেকেই অনেক জায়গায় বিভিন্ন ভাষ্যে শুনেছেন, 'সম্পাদকের বৈঠকে' বইতে গল্পটি তিনি চমৎকার রসালোভাবে লিখেও রেখেছেন। তবুও গল্পটি আমি সংক্ষিপ্ত করে আবার এখানে লিখছি।

দুজন মাতাল অনেক রাতে মদ খেয়ে চুরচুর হয়ে বড় রাস্তার মোড়ে ঠিক মধ্যিখানটায় পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। পুলিশ এসে তাঁদের অনুরোধ করছে যাতে এভাবে দুজনে ধরাধরি করে বিপজ্জনকভাবে দাঁড়িয়ে না থেকে যে যার বাড়িতে চলে যান। কিন্তু পরস্পরকে ছেড়ে তাঁরা যেতে পারছেন না। তাঁরা বলছেন, 'United we stand, divided we fall.' অর্থাৎ দুজনে দুজনকে জড়িয়ে এই অবস্থায় আছেন বলেই দাঁড়িয়ে আছেন, যে মুহূর্তে দুজনে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা হয়ে যাবেন অমনি সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়ে মাটিতে পড়ে যাবেন।

এ গল্প মাতালের বাড়ি না-ফেরা নিয়ে। মাতালের বাড়ি ফেরা নিয়ে চমৎকার গল্প আছে সৈয়দ মুজতবা আলীর। একজন মাতাল গভীর রাতে বাড়ি ফিরে বাবাকে ডাকছে বাবা-বাবা বলে নয় ; বাবার নাম হরিপদ, ডাকছে, 'হরিপদবাবু, ও হরিপদবাবু, দরজা খুলুন।' বাবা তো রেগে আগুন, 'কী, আমার নাম ধরে ডাকা ? মাতলামির জায়গা পাওনি!' মাতাল ছেলে তখন বাবাকে বোঝায়, 'আমি যদি নেশা করে এসে আপনাকে বাবা-বাবা বলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ডাকি, পাড়ার লোকেরা জানবে আপনার ছেলে মাতাল। তাতে কি আপনার সম্মান থাকবে! তার চেয়ে আমি যদি আপনাকে

হরিপদবাবু বলে ডাকি, লোকে ভাববে আপনার কোনো ইয়ার-বন্ধু নেশা করে এসে আপনাকে ডাকছে। কত লোকেরই তো ইয়ার-বন্ধু মাতাল থাকে, তাতে আপনার কোনো মানহানি হবে না।' অকাট্য যুক্তি, অতঃপর পিতৃদেব কী করেছিলেন আমাদের জানা নেই।

(শ্রীযুক্ত সাগরময় ঘোষের এবং সৈয়দ মুজতবা আলীর গল্প দুটি মনে আছে, কিন্তু হাতের কাছে বই দুটি নেই। গল্প দুটি বোধহয় আরো মজার। স্মৃতি আমাকে কিঞ্চিৎ প্রতারণা করলো বলে মনে হচ্ছে, ত্রুটি মার্জনীয়।)

মদ্যপ সম্পর্কে একমাত্র বিয়োগান্ত গল্পটি শ্রীযুক্ত হিমানীশ গোস্বামীর। মাতাল ও মদ খাওয়া নিয়ে সব গল্পই ঐ উত্তেজক পানীয়টির মতই তরল। কিন্তু হিমানীশবাবুর গল্পটি বড়ই করুণ।

গল্পটি অযোধ্যা সিং নামে এক মদ্যপ যুবককে নিয়ে। সে অত্যন্ত বেশি মদ খেতো। একদিন পর পর কয়েক বোতল রাম দুয়েক ঘণ্টার মধ্যে গলাধঃকরণ করলো অযোধ্যা সিং। তারপর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো। তখন অযোধ্যা সিংএর আত্মীয়বন্ধুরা অযোধ্যার শেষকৃত্যের সময় সে যে রামের বোতলগুলি খেয়েছিলো এবং যেগুলিতে তখনো রাম ছিলো সেগুলো অযোধ্যা সিং-এর চিতায় রাগ করে তুলে দেয়।

হিমানীশের এই গল্প শুনে অনেকে বিশেষ রকম আপত্তি করেছিলেন, তাঁরা বলেছিলেন, 'মদ আতিরিক্ত খেলে শরীর খারাপ হতে পারে, অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে, অনেক দিন ধরে খেলে গুরুতর অসুখে ভুগে মরে যেতে পারে, কিন্তু বেশি মদ পান করে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু, এ অতি অসম্ভব কথা।' এবার হিমানীশ করুণ মুখে বলেছিলেন, 'দেখুন, সব শুনলেন তো, ঐ অযোধ্যা সিং-এর সঙ্গে রামের বোতলগুলোও পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিলো। সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। এখন যদি কিছু আমাকে প্রমাণ করতে বলেন, যে আমি পারবো না। পারলে বিশ্বাস করুন, না পারলে বিশ্বাস করবেন না।'

মাতাল সম্পর্কে সবই শোনা গল্প বলছি। আমার সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা লেখা অতি বিপজ্জনক। আমার এই লেখা পড়ে তাঁরা যদি কেউ বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েন, তারপর বেশি নেশা করেন, তারপর আমার খোঁজ করেন, সেই সমাগম খুব মধুর না হতেও পারে।

তার চেয়ে অমল কৈশোরের কথা বলি। কলকাতার থেকে অনেক দূরে যে ছোট শহরে আমরা বড় হয়েছি, সেখানে মদ খাওয়া খুব চালু বা জনপ্রিয় ছিলো না। মাত্র একটি কি দুটি স্থানীয় মাতাল ছিলেন, শহরসুদ্ধ লোক তাঁদের চিনতো, তাঁদের খ্যাতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিলো যে এমন কি সাত-সকালে যখন তাঁরা হয়তো বিশুদ্ধ, নির্মদ চিতে বাজারের থলে হাতে যাচ্ছেন, তখনো আমাদের মতো অল্পবয়স্করা তাঁদের হঠাৎ দেখলে, 'মাতাল-মাতাল' চিৎকার করে ভয়ে দৌড়ে পালাতাম। তাঁরা যে খুব ক্ষতিকর ছিলেন, বিপজ্জনক বা মারকুটে ছিলেন—তা কিছু মনে হয় না। শহরের সাধারণ লোকে একদিকে তাঁদের মাতাল বলে সমীহ করতেন, অন্যদিকে একটু

রোমান্টিকভাবেও দেখতেন। আসলে সেটা ছিলো দেবদাস-পার্বতীর যুগ, নবীন বাংলার প্রমথেশ-পর্ব। তাই যে কোনো ভদ্রলোক মাতালকেই অহেতুক গৌরবান্বিত করে বলা হতো, 'ম্যাট্রিকে গোল্ড মেডাল পেয়েছিলো, বাবা-মা লাভ ম্যারেজ করতে দিলো না, এখন মদ খেয়ে এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে', অথবা 'মদ খাওয়া আরম্ভ করার আগে কি চেহারা ছিলো নিখিলের, একেবারে রাজপুত্রের মতো। আর সব সময় ফটফট করে সাহেবদের মতো ইংরেজির খই ফুটতো মুখে।'

সেই সব সুপুরুষ, সুপণ্ডিত, ভগ্নহৃদয়, ব্যর্থ-প্রেমিক মাতালদের আজকাল আর দেখতে পাওয়া যায় না। আজকালকার অধিকাংশ মদ্যপ পেঁচি, ধান্দাবাজ এবং অত্যন্ত গোলমেলে। অবশ্য দু-একজন ফুর্তিবাজ মাতালও আছেন।

হাওড়া স্টেশনে একটা ওজনের যন্ত্র আছে, আমি তার পাশে দাঁড়িয়ে এক বন্ধুর জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। বন্ধুর আসতে দেরি হচ্ছে দেখে ভাবলাম ওজনটা নিয়ে নিই। ওজনের যন্ত্রটায় হেলান দিয়ে গিলেকরা পাঞ্জাবি ও তাঁতের ধুতি পরা এক ঈষৎ মত্ত ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন। আমি পকেট থেকে দুটো দশ পয়সা বের করে যন্ত্রটির দিকে এগুতেই ভদ্রলোক একটু আলগা হয়ে সরে দাঁড়ালেন। যন্ত্রটা নিশ্চয় খারাপ ছিলো, আমার কুড়ি পয়সা গলাধঃকরণ করে খটখট শব্দসহ যে কার্ডটি বেরিয়ে এলো তাতে আমার ওজন উঠেছে মাত্র পনেরো কেজি। আমার বিস্মিত দৃষ্টি অনুসরণ করে পার্শ্ববর্তী মত্ত ভদ্রলোক কার্ডটির দিকে ভালো করে দেখে হঠাৎ আমার পেটে একটা খোঁচা দিয়ে বললেন, 'দাদা একদম ফাঁপা।'

এ তো তবু রেল স্টেশনের কথা। একবার এক পার্টিতে দেখেছিলাম এক ভদ্রলোক প্রচণ্ড হইহুল্লোড়, নাচ-গান করছেন, তাঁর স্ত্রী একটু রক্ষণশীলা, তিনিও উপস্থিত, তবে স্বামীর আচরণে রীতিমত বিব্রতা। তিনি একা একা বাইরের বারান্দায় চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে স্বামী বেচারীর হুঁশ হয়েছে, পার্টিও ভেঙে এসেছে, স্বামী টলতে টলতে গিয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে স্ত্রীর সামনে দাঁড়িয়ে মাতালের পক্ষে যতটা অনুতপ্ত হওয়া যায় সেই রকম গলায় স্ত্রীর হাত ধরে বললেন, 'চঁলো, বাড়ি যাই।' পত্নীদেবী হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ঝংকার দিয়ে উঠলেন, 'না।' মাতাল তখন হাতজোড় করে বললেন, 'দেখুন, কিছু মনে করবেন না, আপনি অনেকটা আমার স্ত্রীর মতো দেখতে, তাই ভুল করেছিলাম, ক্ষমা করবেন।' স্ত্রী এবার অগ্নিমূর্তি ধারণ করলেন, 'বদমাইস, মাতাল, সব জায়গায় আমার মুখে কালি দিচ্ছো। তোমার মুখ শিল-নোড়া দিয়ে থেঁতলে দিলে আমার মনে শান্তি হবে।' হতভাগ্য মদ্যপ আরো সঙ্কুচিত হয়ে গেলেন, করুণ কণ্ঠে বললেন, 'দেখুন, আমার দোষ নেবেন না। আপনি যে শুধু আমার স্ত্রীর মতো দেখতে তাই নয়, আপনার কথাবার্তাও হুবহু আমার স্ত্রীর মতো।'

মাতালের গল্পের শেষ নেই। বত্রিশ পুতুল, চল্লিশ চোর কিংবা সহস্র এক আরব্য রজনীর চেয়েও দীর্ঘ সেই কথামালা। এই ধূলিমলিন, পাই পয়সা, শাকচচ্চড়ির গোমড়ামুখ পৃথিবীতে এখনো দু-একটি মজার গল্প মাতালেরাই রচনা করেন। তাঁরা আমাদের নমস্য, তবে দূর থেকে।

নমস্কার করার আগে এই গল্পটা আমি বলি। এ গল্পটা আমি দু'ভাবে শুনেছি। এক, মদের দোকানে দুজন অনেকক্ষণ ধরে মদ খাচ্ছে, শেষে একজন আবেকজনকে বললো, 'এই তুই আর মদ খাসনে, তোকে কেমন ঝাপসা দেখাচ্ছে।' দুই নম্বর গল্প, পার্টিতে এক মহিলাব পদপ্রান্তে এসে বসলেন এক মাতাল, তারপর মুগ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'দেখুন, মদ খেলে আপনাকে বড় সুন্দরী দেখায়।' ভদ্রমহিলা লেমনেড খাচ্ছিলেন, বললেন, 'কিন্তু আমি তো মদ খাচ্ছি না।' ভদ্রলোক সংশোধন করে বললেন, 'না না, আপনার কথা নয়, আমি তো মদ খাচ্ছি!'

জলাঞ্জলি

এই রচনার নাম জলাঞ্জলি।

জলাঞ্জলি শব্দটির অর্থ মোটামুটিভাবে সকলের কাছেই বোধগম্য। জলাঞ্জলি মানে বিসর্জন দেওয়া, সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করা।

আমরা আশা জলাঞ্জলি দিই, লজ্জা জলাঞ্জলি দিই, লেখাপড়ায় জলাঞ্জলি দিই। টাকাকড়ি জলাঞ্জলি দিই।

অভিধানগতভাবে জলাঞ্জলি শব্দের সরাসরি অর্থ, সুবলচন্দ্রের বাঙ্গালা অভিধানমতে, জলপূর্ণ অঞ্জলি, এক অঞ্জলি জল। দাহের পর প্রেতাত্মার উদ্দেশে প্রদত্ত আঁজলাপূর্ণ জল হল জলাঞ্জলি। এই অঞ্জলির মাধ্যমেই মৃতের সঙ্গে সব সম্পর্ক বিসর্জন।

জলাঞ্জলি সন্ধিবদ্ধ শব্দ, জল + অঞ্জলি, জলাঞ্জলি, সরল স্বরসন্ধি। সপ্তম শ্রেণীর পড়ুয়াও জানে।

সমাসবদ্ধ জলাঞ্জলি কিন্তু দ্বন্দ্ব সমাস নয়। জল ও অঞ্জলি, দুই শব্দ মিলে সরাসরি জলাঞ্জলি নয়। জলাঞ্জলি হল মধ্যপদলোপী কর্মধারয়, ব্যাসবাক্য হল জলপূর্ণ অঞ্জলি।

সে যা হোক, ব্যাকরণঘটিত কচকচি ছেড়ে এবার সরাসরি জলে যাই। সেই যে

কি একটা গান ছিল না—

'সখি বেলা যে পড়ে এলো জলকে চল।'

নদী কিংবা দিঘি থেকে কলসি কাঁখে যে মেয়েরা সকাল-সন্ধ্যায় জল নিয়ে আসত কবির মোহিত দৃষ্টির সামনে থেকে তারা বহুকালই অন্তর্হিত হয়েছে। তাদের প্রৌত্রী দৌহিত্রীরা এখন রাস্তার মোড়ে নোংরা কলতলায় রঙিন প্ল্যাস্টিকের বালতি হতে ঝগড়া করে। পড়ন্ত সূর্যের সোনালি আলোয় গান গাইতে গাইতে তাদের জল নিয়ে ঘরে ফেরার ছবি চিরকালের মতো হারিয়ে গেছে।

জলই জীবন। মানুষ অনশন করে দু-তিন মাস পর্যন্ত বাঁচতে পারে, গান্ধীজী থেকে শুরু করে অনেক রাজনৈতিক নেতাই দীর্ঘদিন ধরে টানা অনশন করেছেন। কিন্তু জলগ্রহণ না করে মানুষের পক্ষে কয়েকদিন বাঁচাও কঠিন। একদা হিন্দু বিধবারা নির্জলা একাদশীর উপবাস করতেন, সে ছিল ভয়াবহ কষ্টের ব্যাপার, বিশেষ করে সেই দীর্ঘ গ্রীষ্মের দেশে। ডুবে ডুবে জল খাওয়া কথাটার উৎপত্তি ওখানেই। এমনিতে জল পান না করে স্নানের সময় লোকচক্ষুর অগোচরে ডুব দিয়ে জল খাওয়া প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে এই গ্রাম্য প্রবাদে।

সব ধর্মেই জল অতি পবিত্র জিনিস। গঙ্গার জল কিংবা ফোরাতের পানি ধর্মপিপাসুদের কণ্ঠের তৃষ্ণা না মেটালেও ভক্তিতৃষ্ণা মেটায়। তার শাস্ত্রীয় আচরণকে পবিত্র করে।

অতঃপর জলের আসল গল্পে যাই। জলের আসল মজা সেখানেই।

যাঁরা মদ্যপান করেন, নিজেদের মধ্যে সাঙ্কেতিক ভাষায় তাঁরা পরস্পরের কাছে জানতে চান, 'কি আজ সন্ধ্যায় একটু জলপথে ভ্রমণ, হবে নাকি?'

জলাদেশে, এমন কি কলকাতা শহরেও জল পুলিশ আছে। তার মানে অবশ্য এই নয় যে, এরা আবগারি পুলিশ, মদ ও মাতাল নিয়ে এদের কারবার। তা নয়। স্থল এলাকায় যেমন সাধারণ পুলিশ আছে, তেমনি জল এলাকার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে জল পুলিশ।

গোপাল ভাঁড়ের হেঁয়ালির বইয়ে এ ব্যাপারে একটি মজার গল্প আছে।

এক ভদ্রলোক অত্যধিক মদ্যপান করে রাস্তা থেকে গড়িয়ে রাস্তার ধারে একটা খালের জলেব মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন। রাজপথে কর্তব্যরত এক পুলিশকর্মী তাঁকে ওই অবস্থায় দেখে বলে, 'আপনাকে গ্রেপ্তার করা হল।' ভদ্রলোক নেশায় চুরচুর হয়ে থাকলেও তাঁর জ্ঞান যথেষ্টই ছিল এবং তিনি যথেষ্টই সেয়ানা, পুলিশের ধমক খেয়েও তিনি খালের জল থেকে উঠে এলেন না, বরং ওই পুলিশকেই বললেন, 'হুঁহুঁ বাবা। আমি তো জলে আছি, তুমি আমাকে গ্রেপ্তার করবে কী করে? যাও, এখন গিয়ে জলপুলিশ ডেকে নিয়ে এসো।'

প্রবাদ আছে, শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল। মদ বেচা একটা সুপ্রাচীন ব্যবসা। মদ্য ব্যবসায়ীকে সংস্কৃতে বলে শৌণ্ডিক। শৌণ্ডিক মানে শুঁড়ি।

এই রকম এক শুঁড়ি মধু মদ বেচতেন তাই নয়, নিজেও প্রচুর মদ্যপান করতেন।

বলতে গেলে সমস্ত জীবনে, সাবালক হওয়ার পরে, একমাত্র কারণবারি ছাড়া আর কোন পানীয়ই গ্রহণ করেননি।

মৃত্যুকালে তাঁর বড় ছেলে তাঁর মুখে জল দিয়েছিলেন। তিনি সেই জল 'ওয়াক, থুঃ' করে ফেলে দেন। তারপর শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করার আগে ছেলেকে উপদেশ দিলেন, 'বাবা, এইমাত্র আমার মুখে যে জিনিসটা দিয়েছিলে সেটা কিন্তু অতি জঘন্য জিনিস। এটা কেউ খাবে না। এ জিনিস বেচতে যেয়ো না। ব্যবসা লাটে উঠবে।'

এর প্রায় বিপরীত একটি ঘটনার আমি নিজে সাক্ষী। আমরা এক তরুণ বন্ধু নার্সিংহোমে ভর্তি হয়েছিল। তার বুকে জল জমে গিয়েছিল।

আমার সেই বন্ধুটা কড়া মদ্যপায়ী। নির্জলা মদ সে সরাসরি টকটক করে গিলে খায়।

আমি তাকে নার্সিংহোমে দেখতে গিয়েছিলাম। সে আমাকে দেখে অভিযোগ করল, 'তারাপদদা আমার এই শোচনীয় অবস্থার জন্য আপনি দায়ী।' তার এই অভিযোগ শুনে আমি বিস্মিত বোধ করার সে বলল, 'যখনই মদ খাই, আপনি জোর করেন জল মিশিয়ে খাও, জোর করে গেলাসে জল ঢেলে দেন। মদটা শরীর থেকে বেরিয়ে গেছে। আপনার সেই জলটা বুকে জমে আছে।'

অবশেষে, নিবন্ধ প্রান্তে একটি আপ্তবাক্য স্মরণ করি, 'আমরা জলের মূল্য কখনোই বুঝতে পারি না যতক্ষণ না কুয়ো শুকিয়ে যায়।'

এবং মাতাল

মাতালের হাত থেকে সহজে রেহাই পাওয়া যায় না। একবার মাতালের পাল্লায় পড়লে তাকে দ্রুত এড়ানো যে কত কঠিন ভুক্তভোগী মাত্রেই সেটা সম্যক জানেন। সুতরাং আমরাও পরিত্রাণ নেই, আরেকবার মাতালের মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

কয়েকদিন আগে সন্ধ্যাবেলা তাজ বেঙ্গলের লাউঞ্জে একজনের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। সহসা আশপাশের কোনও একটা বার থেকে এক বিখ্যাত মদ্যপ টলতে

টলতে বেরিয়ে এলেন। সুখের বিষয় তিনি আমাকে দেখতে পেলেন না। কিন্তু সামনেই পেলেন এক ইউনিফর্ম পরিহিত বায়ুসেনার অফিসারকে, যাঁকে তিনি হোটেলের উর্দিপরা দারোয়ান বলে ভ্রম করলেন এবং সেই ভ্রমবশত আদেশ করলেন, 'ওহে, যাও তো তাড়াতাড়ি আমার জন্য একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে এস তো।' এয়ারফোর্সের অফিসার ভদ্রলোক বিব্রত হয়ে বললেন, 'আপনি কাকে কী বলেছেন? আমি বিমানবাহিনীর একজন পাইলট, আমি আপনার ট্যাক্সি ডাকতে যাব? বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে সেই বিখ্যাত মদ্যপ আদেশ করলেন, 'যাও, তাহলে তুমি গিয়ে একটা এরোপ্লেন ডেকে নিয়ে এস।'

এবার আকাশপথের থেকে জলপথে যাই। ভবনাথবাবু আউটরাম ঘাটের দক্ষিণে গঙ্গার ধারে একটা চুল্লুর ঠেকে তরল অগ্নি পান করছিলেন সন্ধ্যা থেকে। নদীর ঘাটে ফুরফুর করে হাওয়া দিচ্ছে, নদীর জলে পূর্ণ শশীর ছায়া, আবেগে চোখ বুজে ঘাটের ধারের রেলিংয়ে গা এলিয়ে দিলেন ভবনাথবাবু এবং সঙ্গে সঙ্গে নিচু রেলিং টপকিয়ে ঝপাৎ গঙ্গাজলে। ভাগ্যিস বর্ষার নদী, জল ঘাটের গলা পর্যন্ত উঠে এসেছে তাই বেশিদূর পড়তে হয়নি। তাছাড়া ভবনাথবাবু সাঁতার জানেন।

কিন্তু প্রথম ধাক্কায় জলে পড়ে যথেষ্টই হাবুডুবু খেলেন ভবনাথবাবু। তারপর বহু কষ্টে সিক্ত বস্ত্রে, সিক্ত শরীরে তদুপরি জলপূর্ণ উদর নিয়ে পাড়ে উঠে ভবনাথবাবুর প্রথম প্রতিক্রিয়া হল সেই চুল্লুর ঠেকের মালিকের বিরুদ্ধে, তিনি ঘাটের ধাপ ধরে ধরে উঠে গেলেন সেই চুল্লুর দোকানে এবং গিয়ে সরাসরি চার্জ করলেন, 'এত ভাল চুল্লুতে এতটা জল মিশিয়ে দিলে। চুল্লু মামা তোমার কি হৃদয় বলে কিছু নেই।'

মাতালের একটা বড় কাজ হল পড়ে যাওয়া। সে টলতে টলতে রাস্তায় পড়ে যায়, ঘরে বারান্দায়, পথে-ঘাটে সে কেবলই পড়ে যায়, কখনও বা দলবদ্ধভাবে পড়ে গড়াগড়ি খায়, গায়ে ধুলো-কাদা মাখে। হুঁশ ফিরতে ওইভাবেই বাড়ি ফেরে, ওটাই তার ট্রেড মার্ক। একদা এক মদ্যপ ব্যক্তি নেশা করে কবিতা লেখার চেষ্টা করছিলেন, 'কেমন হল কবিতা লেখা?' এ কথা তার কাছে জানতে চাওয়ায়, সে বলল, 'মদ খেয়ে এত মাথা টলছিল, পারলাম না, দু-চরণ না যেতে যেতেই একেবারে পপাত।'

তবে মাতালের খুব প্রিয় জায়গা হল রাস্তার ধারের ড্রেন, সেখানে পড়ে থাকতে সে খুবই ভালবাসে। এ বিষয়ে অবশ্য তার একটা নিজস্ব বক্তব্য আছে, সেটা তার মুখেই শোনা যাক। ড্রেনে পতিত এক মাতাল ড্রেনের উদ্দেশে বলছে, 'ও ভাই ড্রেন, এ তোমার কেমন ব্যবহার? দিনের বেলায় থাক রাস্তার ধারে আর রাতের বেলা চলে আস একেবারে রাস্তার মধ্যিখানে, এটা তো মোটেই ভাল নয়।'

কি যে ভাল, কি যে খারাপ, মাতালের অভিধান আর আমাদের অভিধানে সব শব্দের অর্থ এক নয়। এক ঢাকাই মাতালের কথা শুনেছিলাম, সে বাড়ি ফেরার জন্যে বেরিয়ে রাস্তায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত, তার মাথা এত ঘুরত যে দাঁড়ানো অবস্থায় তার মনে হত ঢাকা শহরটা তার চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে। সে বলেছিল, 'দাঁড়িয়ে থাকি এই আশায় যে আমার নিজের বাড়ির দরজাটা যখন সামনে চলে আসবে, ঝপ

করে ঢুকে পড়ব। কিন্তু সে বাড়িটা যে কোথা ...কে হুট করে পালিয়ে যায় বুঝতে পারি না। গোপাল ভাঁড়ের গল্প ছিল, ছেলে মধ্যরাতে মাতাল হয়ে বাড়িতে এসে বাবাকে 'গোপালবাবু' বলে চেঁচিয়ে ডাকছে। বাবা তো রেগে আগুন, 'বদমায়েশ ছেলে, বাবাকে বাবা না বলে গোপালবাবু বলে ডাকছ?' বুদ্ধিমান মদ্যপ ছেলে বলল, 'আপনাকে যদি বাবা বলে ডেকে মাতলামি করি, পাড়ার লোকে ছিঃ ছিঃ করবে, বলবে গোপালবাবুর ছেলে মাতাল হয়ে এসেছে। আর আমি যদি আপনাকে 'গোপালবাবু' বলে ডাকি লোকে ভাববে আপনার কোনও ইয়ার-বক্সি-মাতাল হয়ে এসেছে, তাতে আপনার কী আসে যায়।'

গতবার ঢাকায় গিয়ে অনুরূপ একটি ঢাকাই গল্প শুনে এলাম। গভীর রাতে পাঁচ মাতাল আনোয়ার আলির বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। তাদের মধ্যে একজন আনোয়ার আলি স্বয়ং। কিন্তু তারা সকলেই বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে, 'আনোয়ার আলি, আনোয়ার আলি' বলে চেঁচাতে লাগল। ফলত আনোয়ার আলির স্ত্রী ঘুম জড়ানো চোখে বাড়ির সদর দরজা খুলে দাঁড়িয়ে বলল, 'এটাই আনোয়ার আলির বাড়ি কিন্তু আপনারা কী চাইছেন?' বলা বাহুল্য বৌটি মাতালদের দঙ্গলে বরকে লক্ষ্য করেনি। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না, মাতালদের মুখপাত্র হাতজোড় করে বলল, 'ভাবী, আমাদের মধ্যে কেউ আনোয়ার আলি, কিন্তু আমরা ঠিক ধরতে পারছি না। আপনি আসল আনোয়ার আলিকে বেছে নিন।'

আনোয়ার আলির স্ত্রী সেদিন স্বামীকে বেছে নিতে পেরেছিলেন কি না এবং তারপরে সেই স্বামী বেচারার কী পরিণতি হয়েছিল সেটা চিন্তা করে লাভ নেই। কিন্তু এ কথাও তো সত্যি যে মাতাল হলে মানুষের চেহারা পাল্টিয়ে যায়, তাতে আর চেনাই যায় না। সাধে কি আর গল্পের সেই মাতাল তার সঙ্গীকে মদ খেতে নিষেধ করে বলেছিল, 'ওরে তুই আর মদ খাসনে, তোর মুখ না কী রকম ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে।'

তবুও মাতাল

পাঠক-পাঠিকা আমাকে নিজগুণে ক্ষমা করবেন। আমার মদের নেশা ধরে গেছে। শুকনো রুলটানা কাগজে নীরস ডটপেনে মাত্র দু-দশ অনুচ্ছেদ লিখে যদি এত নেশায় চুরচুর হয়ে যাই, তাহলে যাঁরা প্রকৃত নেশারস পিপাসু, তাঁদের গতি কী হবে।

আপাতত দুটো চরম দৃষ্টান্ত স্মরণ করা যেতে পারে। গভীর রাতে নেশা সাঙ্গ করে বাসে উঠেছেন এক মদ্যপ ভদ্রলোক। ফাঁকা বাস। উঠে একটা সিটে বসে পাশের সহযাত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'দাদা, আমি কি বাসে উঠেছি?' মাতালের সঙ্গে কেউ কথা বাড়াতে চায় না, সহযাত্রীটি সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন, 'হুঁ'। তখন মদ্যপ জিজ্ঞাসা করলেন, 'দাদা, আপনি কি আমাকে চেনেন?' সহযাত্রী আবার সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন, 'না।' এবার মাতাল ভদ্রলোক উত্তেজিত হয়ে পড়লেন, 'যদি আপনি আমাকে নাই চেনেন, তাহলে কী করে বুঝলেন যে, আমিই বাসে উঠেছি?'

এ প্রশ্নের অবশ্য কোনও জবাব হয় না। কিন্তু মাতালের আত্মপ্রবঞ্চনার শেষ নেই। এক পানশালায় এক ভদ্রলোক প্রতিবারে দু-গেলাস করে পানীয় নিতেন। কৌতূহলী কেউ যদি জানতে চাইত, 'এক সঙ্গে দু-গেলাস কেন?' ভদ্রলোক বলতেন, 'এক গেলাস আমার নিজের জন্যে, আর, আরেক গেলাস আমার বন্ধুর জন্যে।' এর পরে যদি প্রশ্ন করা হত, 'কিন্তু আপনাকে যে একা দেখছি আপনার বন্ধুকে তো দেখতে পাচ্ছি না?' ভদ্রলোক জবাব দিতেন, 'দেখবেন কী করে? সে তো বেঁচে নেই। এর পর আর কোনও প্রশ্ন থাকতে পারে না, তবুও যদি প্রশ্নকারী বলতেন, 'তা হলে?' ভদ্রলোক উত্তর দিতেন, 'এক গেলাস আমার তৃষ্ণা নিবারণের জন্যে, আর অন্য গেলাস আমার বন্ধুর আত্মার শান্তির জন্যে।'

এ রকম বেশ কিছুদিন চলেছিল। তারপরে একদিন দেখা গেল উক্ত ভদ্রলোক অন্য দশজনের মতোই এক গেলাস করে পানীয় নিচ্ছেন, আগের মত দু-গেলাস নয়। এবার সেই পুরনো প্রশ্নকারী স্বাভাবিকভাবেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হল দু-গেলাস থেকে

এক গেলাসে নেমে এলেন কেন?' ভদ্রলোক করুণ কণ্ঠে জানালেন, 'শরীরটা ভাল যাচ্ছে না, ডাক্তার আমার মদ খাওয়া বারণ করে দিয়েছেন। আমি আর মদ খাচ্ছি না, শুধু বন্ধুর আত্মার শান্তির জন্য তার গেলাসটা খাচ্ছি।

নেশাতুর ব্যক্তির যে কতরকম ভুল করে তার কোনও ইয়ত্তা নেই। সেই ঘটনার কথা আমি আপনাদের আগে বলেছি। নেশায় চুরচুর এক মদ্যপ ভদ্রলোক মধ্যরাত অতিক্রম করে বাড়ির কাছে এসে পৌঁছেছেন। এর পর পকেট থেকে একটা চাবি বার করে রাস্তার ধারের ল্যাম্প পোস্টে সেটা লাগাতে গেলেন। উল্টো দিকের ফুটপাতে থানার পুরনো জমাদারসাহেব ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিলেন। এই নিরীহ মাতালকে তিনি বহুকাল চেনেন, কিন্তু আজ চাবি দিয়ে ল্যাম্প পোস্ট খোলার চেষ্টা করতে দেখে তিনি এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ কী? করছেন কী?' মাতাল ভদ্রলোক অমায়িক হাসি হেসে বললেন, 'দেখছেন না জমাদারসাহেব, নিজের বাড়িতে তালা খুলে ঢোকার চেষ্টা করছি। শালা, এই চাবিটা কিছুতে লাগছে না।' জমাদারসাহেব নিজেও সন্ধ্যার দিকে কিঞ্চিৎ গঞ্জিকা সেবন করেছিলেন তিনি রঙিন চোখে ল্যাম্প পোস্টের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই আপনার বাড়ি!' মত্ত ভদ্রলোক রীতিমত আশ্বস্ত কণ্ঠে বললেন, 'আমার নয় কি আপনার বাড়ি নাকি?' তারপরে ল্যাম্প পোস্টের চূড়ায় যেখানে লাইট জ্বলছে, সেই দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে বললেন, 'দেখতে পাচ্ছেন না, দোতলায় আলো জ্বলছে। আমার বৌ আমার জন্যে ভাত বেড়ে বসে আছে ওখানে।'

এ-রকম একটা করুণ গল্পের পরে একটা মধুর গল্প অনায়াসেই বলা যায়। প্রেক্ষাপট ঐ একই। মধ্যরাত অতিক্রান্ত করে বাড়ি ফিরেছেন মত্ত ভদ্রলোক। শোয়ার ঘরে ঢুকে বিছানায় উঠতে গিয়ে ভদ্রলোক থমকিয়ে দাঁড়ালেন, তারপর প্রশ্ন করলেন, 'এই যে আলুলায়িত কুন্তলা, স্খলিতবসনা সুন্দরী মহিলা, এত রাতে আমার বিছানায় শুয়ে আপনি কী করছেন বলতে পারেন।'

সদ্য নিদ্রোত্থিতা যুবতী রমণী আলগোছে পাশ ফিরে মুখোমুখি হয়ে ঢুলঢুল নয়নে বললেন, 'দেখুন এই বিছানাটা খুব নরম, আমার খুব পছন্দ হয়েছে, টেবিলের ফুলদানি থেকে কী মধুর সৌরভ আসছে রজনীগন্ধার, এই রজনীগন্ধাগুলি আমিই রেখেছি, তা ছাড়া এই ঘরটাও আমার খুব ভাল লাগে, অবশ্য ভাল না লাগার কথা নয়, এই ঘরটা আমিই সাজিয়েছি। সামনের জানালার ঐ দিকে নীল রঙের ফরফরে পর্দা আমিই কিনে এনেছি।' মাতাল ভদ্রলোক এত কথা শোনার লোক নন, শোনার মত অবস্থাও নয়। তিনি অস্থির হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তা এত সব আপনি করতে গেলেন কেন?'

নয়ন ধনুকে শর সংযোজন করে যুবতী রমণী আধো-আধো গলায় বললেন, 'কেন করলাম? এমনিই করলাম। আর তাছাড়া কী বলব, জানেন কি আমি আপনারই বিবাহিত স্ত্রী?'

পুনশ্চ :

এবার আমরা একটা বারে যেতে পারি। না, আমরা কোনও টেবিলে বসব না। বরং

একটা টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে দুই বন্ধু কী আলোচনা করছে মন দিয়ে শুনি। আমরা মোক্ষম মুহূর্তে এসে গেছি। এখনই আসল আলোচনাটা হচ্ছে। প্রথম বন্ধু দ্বিতীয় বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হ্যাঁরে মণিলাল, বেশি মদ খেলে তোর শরীরটা কি জ্বলে?' মণিলাল বললেন, 'আমি মদ খেয়ে কখনও এমন বেহুঁশ হই না যে, শরীরে আগুন লাগিয়ে পরীক্ষা করে দেখব যে, শরীরটা জ্বলে কি না।'
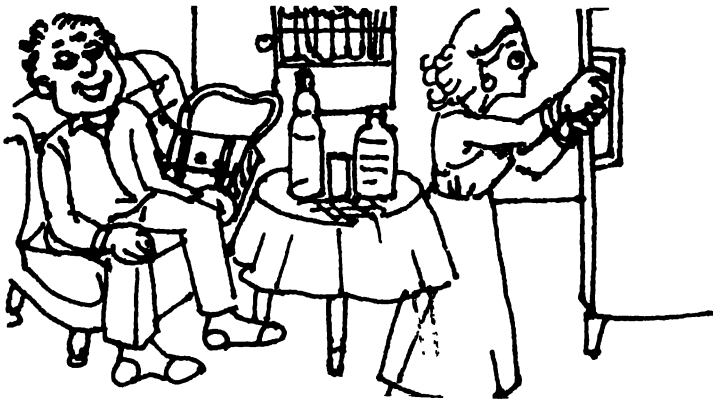
সেইসব মাতালেরা

এক

ইংরেজি কাব্য ব্যাকরণে প্যারোডি বলে একটা কথা আছে। প্যারোডির কোনও উপযুক্ত প্রতিশব্দ বাংলায় নেই। একটি ইঙ্গ-বঙ্গ অভিধানে দেখলাম প্যারোডির অর্থ লালিকা।

এই অর্থের অবশ্য কোনও দাম নেই, যিনি প্যারোডি মানে জানেন না, তাঁর কাছে লালিকারও কোনও মানে নেই।

প্যারোডি হল কোনও বিখ্যাত গান, কবিতা বা গদ্যাংশের সরস পরি[illegible]ন খুব ভাল উদাহরণ হল রজনীকান্তের গান 'কাঙাল বলিয়া করিয়ো না হেলা', প্যারোডি হয়েছিল 'বাঙাল বলিয়া করিয়ো না হেলা।' রবীন্দ্রনাথের বহু আলোচিত, বহু পঠিত 'সোনার তরী' কবিতাটির একটি প্যারোডি একদা খুবই বিখ্যাত হয়েছিল। শুনেছি 'সোনার তরী' কবিতাটির একাধিক প্যারোডি হয়েছিল। আমি ছাত্রজীবনে জীবনানন্দ দাসের 'বনলতা সেন' কবিতার প্যারোডি 'সচিত্র ভারত' কিংবা ওইরকম কোনও কাগজে দেখেছি।

এবার আমাদের নিবন্ধের উপজীব্য হল মাতাল। প্যারোডি প্রসঙ্গটা এল আমাদের *বহুপ্রিয় মদ্যপ মহোদয়কে জীবনানন্দের অন্য একটি বিখ্যাত কবিতার প্রথমাংশ* প্যারোডি করে একটু তাৎক্ষণিক মজা পাওয়ার জন্যে।

কবিতাটি বিখ্যাত, জীবনানন্দীয় কাব্যরীতির একটি উজ্জ্বলতম নির্দশন। কবিতাটির নাম 'সেইসব শেয়ালেরা'।

এই কবিতাটির প্রথম কয়েক পঙ্‌ক্তি গঙ্গারামের হাতে দাঁড়িয়েছে।

'...সেই সব মাতালেরা
জন্ম জন্ম পানীয়ের তরে,
দিনের বিশ্রুত আলো নিভে গেলে
ক্লাব ঘরে, বারের ভিতরে
নীরবে প্রবেশ করে..'

গঙ্গারামের উদ্ধৃতি দিয়ে যখন শুরু করেছি তবে তার কথাই হোক।

মধ্যে একদিন এসে সে তার স্ত্রীর নামে নালিশ করল, 'আর, বলবেন না আপনার বউমার কথা। কী যে একটা খারাপ অভ্যাস করেছে।'

আমি জিজ্ঞাসা করি, 'কী খারাপ অভ্যাস?'

গঙ্গারাম বলল, 'রাত দুটো-আড়াইটে পর্যন্ত জেগে থাকে।'

আমি প্রশ্ন করি, 'প্রত্যেকটি দিন?'

গঙ্গারাম জানায়, 'প্রায় প্রত্যেক দিন।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'মা লক্ষ্মী এত রাজ পর্যন্ত জেগে কী করেন?'

অম্লান বদনে গঙ্গারাম উত্তর করলেন, 'আমার জন্যে জেগে বসে থাকে।'

গঙ্গারামের স্ত্রী একদিন গঙ্গারামের নামে আমার কাছে নালিশ করতে এসেছিল, তাকে বলেছিলাম, 'তুমি তো বিয়ের আগে থেকে গঙ্গারামকে চিনতে, তুমি ওকে বিয়ে করতে গেলে কেন?'

গঙ্গারামের স্ত্রী বলল, 'বিশ্বাস করুন দাদা, আমি ঘুণাক্ষরেও টের পাইনি যে ও মাতাল।'

আমি অবাক হয়ে বলি, 'কিন্তু তখন তো গঙ্গা দিনরাত মদ খায়।'

গঙ্গারামের স্ত্রী বলল, 'আমি কিছুই বুঝতে পারিনি বিয়ের দিন পর্যন্ত।'

আমি বললাম, বিয়ের দিন বুঝি খুব মাতলামি করছিল?'

সে বলল, 'তা নয়, এর ঠিক উলটোটা হয়েছিল। বিয়ের দিন কী মনে করে ও এক ফোঁটাও মদ ছোঁয়নি। ওর আচার-আচরণ, কথাবার্তা কেমন যেন অসংলগ্ন, অস্বাভাবিক লাগছিল। বিয়ের পর বাসরঘরে যখন ওকে সে কথা বললাম, ও বলল, ও কিছু নয়, আজ মদ খাইনি কিনা তাই।'

পরে একদিন গঙ্গারামকে প্রশ্ন করি, 'তুই এত মদ খাচ্ছ কেন?'

গঙ্গারাম বলল, 'কুসংসর্গে পড়ে আমার এই অবস্থা। সন্ধ্যাবেলা চার বন্ধুতে মিলে এক বোতল মদ কিনি। ওরা কেউই এক পেগের বেশি খায় না। বাকি বোতলটা আমাকে একা খেতে হয়।'

পুনশ্চ :

একা গঙ্গারামকে দোষ দিয়েই বা কী হবে?

রাস্তায় এক হাফ-ভদ্রলোক গোছের ব্যক্তি ভিক্ষা করছিলেন। আমার কাছেও তিনি দুটো টাকা চাইলেন, তাঁকে টাকাটা দিতেই তিনি চলে যাচ্ছিলেন, তাঁকে আটকালাম, জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি ভিক্ষার টাকা দিয়ে কী করেন?'

তিনি একটু ইতস্তত করে বললেন, 'কী আর করব? গোটা কয়েক টাকা হলে একটু চোলাই কিনে খাই।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'মদ খান কেন?'

আবারও ইতস্তত করে ভদ্রলোক বললেন, 'এমনিতে ভিক্ষে করতে লজ্জা করে, চোলাই খাই, ভিক্ষে করার সাহস জোগাড় করার জন্যে।'

অল্পে সুখ নেই, বিশেষ করে মদ ও মদ্যপের গল্পের বেলায়। তাই পরপর। এবং আবারও গঙ্গারামের পিঠে চড়ে।

একদিন গঙ্গারাম এসে আবেদন করল, 'দেখুন, এই বয়েসে এত মদ খেলাম কিন্তু মদের ব্যাপারটা আজও ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'মানে?'

গঙ্গারাম বলল, 'গেলাসে দু আউন্স মদ নিলাম পান করে শরীর গরম করব বলে, কিন্তু পান করার আগেই তার মধ্যে দু-টুকরো বরফ দিলাম শরীর ঠাণ্ডা করে বলে। এর পরে পান করার সময় 'উইশ' করে বললাম, 'আপনার মঙ্গলের জন্যে' বলে আপনাকে না দিয়ে নিজেই খেয়ে নিলাম।'

গঙ্গারামের কথাটা ফেলনা নয়, মদের ব্যাপার সত্যিই গোলমেলে। মাতলামিকে স্বেচ্ছা-পাগলামি বলে অভিহিত করেছিলেন দু' হাজার বছর আগের এক দার্শনিক।

সাম্প্রতিক কালে বার্ট্রান্ড রাসেল তাঁর 'সুখের সন্ধানে' গ্রন্থে মদ্যপানকে সাময়িক আত্মহত্যা বলেছেন।

মদের মতো তরল জিনিস কঠিন করা উচিত হবে না। বরং আমরা তারল্যেই অবস্থান করি।

গঙ্গারামকে স্মরণ করা যাক। গঙ্গারামকে একদা তাঁর অফিসের বড় কর্তা বলেছিলেন, 'দ্যাখো গঙ্গা, তুমি যদি এত পান করে সব সময়ে বেসামাল না হতে তা হলে একদিন আমার মতোই তুমিও এই অফিসের বড়কর্তা হতে।'

গঙ্গারাম কিছুক্ষণ চুপ করে তারপর বলেছিল, 'কিন্তু স্যার, যদি কিছু মনে না করেন তো বলি, মদ খেলে এখনই আমার মনে হয় যে আপনি নন, আমিই এই অফিসের বড় কর্তা।'

এক এক দিন বাড়িতেও বড় কর্তাগিরি ফলাতে যায় সে। সেদিন সকালবেলা সাড়ে ন'টার সময় ঘুম থেকে উঠে তার সে কী হম্বিতম্বি, 'আমি যে বলেছিলাম অফিসের

কাজ আছে, বেরোতে হবে, সকাল ছ'টার মধ্যে ডেকে দেবে।' গঙ্গারামের চেঁচামেচি অল্প একটু শুনে তার স্ত্রী ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'একদম চেঁচাবে না। চুপ। সকাল সাতটায় বাড়ি এলে, এসে শুয়ে পড়লে, এখন সাড়ে ন'টায় ঘুম থেকে উঠে বলছ, ছ'টার মধ্যে ডেকে দিতে। চুপ!'

স্ত্রীর এ ধরনের নির্দয় ব্যবহার গঙ্গারামের মনে লাগে কিন্তু তার কোনও বহিঃপ্রকাশ নেই। সেইদিনই সন্ধ্যাবেলায় ক্লাবে বসে গেলাসের পর গেলাস মদ খাচ্ছিল গঙ্গারাম। তার টেবিলেই বসেছিলেন তাঁর এক প্রকৃত শুভানুধ্যায়ী, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এত পানীয় খাওয়ার প্রয়োজন কী?'

গঙ্গারাম বলল, 'আমার দুঃখগুলোকে এই সব গেলাসের মধ্যে ডোবাতে চাই।'

শুভানুধ্যায়ী মহোদয় একজন আমলা, তিনি জানতে চাইলেন, 'দুঃখগুলো ডুবল?'

গঙ্গারাম বলল, 'আগে ডুবত। এখন খুব চালাক হয়ে গেছে, গেলাসের মধ্যে সাঁতার কাটছে।'

এর পরে আরও একবার।

সন্ধ্যাবেলার একটু পরে সে অফিসের ব্যাগ খুলে একটা মদের বোতল বার করল, বউকে বলল, 'ফ্রিজ থেকে একটা ঠাণ্ডা জলের বোতল দাও।'

শ্রীমতী গঙ্গারাম আঁতকে উঠলেন, 'জ্বরের মধ্যে ঠাণ্ডা জল?'

গঙ্গারাম বলল, 'দাও না।'

শ্রীমতী জল দেওয়ার পরে গঙ্গারাম পরপর চার গেলাস খেল। তারপর শান্ত মনে বউকে বোঝাল, 'দ্যাখো মানুষ যেমন মাতাল হয়, রোগের ভাইরাসও মদ খেলে পাগল হয়। ভাইরাস মনের সুখে রক্তের মদ খায়, খেতে খেতে মাতাল হয়ে পড়ে, আর কোনও ক্ষতি করতে পারে না। কষ্ট দিতে পারে না।'

পুনশ্চ :

মদ্যপান যে সদাসর্বদাই ক্ষতিকর, তা কিন্তু নয়। কখনও কখনও মদ্যপানের জন্যে উপকার হয়, এমন কী প্রাণরক্ষা।

না। এটা গঙ্গারামের কোনও গল্প নয়। আমার নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে কাহিনীটি বলছি।

আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক, তিনি আমার এরকম আত্মীয়, খুব রগচটা ব্যক্তি। তার ওপরে প্রচণ্ড মদ্যপান করেন এবং তখন রাগের মাত্রাও চড়ে যায়। সবচেয়ে ভয়ের কথা ভদ্রলোকের একটা রিভলবার আছে।

সপ্তাহ কয়েক আগে এক সন্ধ্যাবেলা, ভদ্রলোক প্রচণ্ড মত্ত অবস্থায় স্ত্রীর সঙ্গে কথা কাটাকাটি করতে করতে টেবিলের ড্রয়ার খুলে রিভলবার বার করে স্ত্রীকে লক্ষ্য করে গুলি চালালেন। পর পর দুটি গুলি করার পর তাঁর হুঁশ হল, কী সাংঘাতিক কাণ্ড করে ফেলেছেন।

কিন্তু অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে হাত কাঁপতে থাকায় একটা গুলিও তাঁর স্ত্রীর

গায়ে লাগেনি, তিনি প্রাণে বেঁচে গেলেন আর ভদ্রলোক নিজেও ফাঁসিকাঠে ঝোলা থেকে অব্যাহতি পেলেন।

এই গল্পের মর‍্যাল হল, মদ্যপানে কখনও কখনও উপকারও হয়।
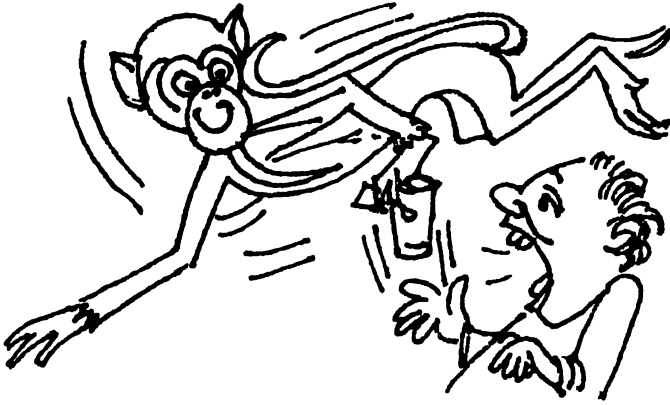
কাঁঠালহাটির গল্প

এই গল্পের নাম পাঠ করেই সকল বুদ্ধিমান পাঠক এবং অনুরূপ বুদ্ধিমতী পাঠিকা বুঝতে পেরেছেন যে এই গল্পটা কাঁঠালহাটি নামে একটা গ্রামের ব্যাপার নিয়ে।

সর্বশ্রী পাঠকগণ ও সর্বশ্রীমতী পাঠিকাগণ ঠিকই ধরেছেন।

কিন্তু একটা গোলমাল আছে।

গ্রামের নাম কাঁঠালহাটি শুনে আপনারা কেউ যদি ভেবে থাকেন, এই গাঁয়ে প্রচুর কাঁঠাল হয়, গ্রামের ভিতরে বা পাশে সেই কাঁঠালের হাট বসে সেই কারণে এমন নামকরণ, তা হলে কিন্তু ভুল করেছেন।

কাঁঠালহাটিতে কাঁঠালগাছ নেই তা নয় কিন্তু সে হাট বসানোর মতো ব্যাপার নয়।

তাছাড়া কাঁঠালহাটিতে কোনও হাট নেই। নিকটতম হাট এখান থেকে চার কিলোমিটার দক্ষিণে মোল্লারপাড়ায়। সেখানে তরিতরকারি, মাছ-মাংস চাল-ডাল, মরসুমি ফল এইসব পাওয়া যায়। কাঁঠালের মরসুমে দু-চারটে কাঁঠালও পাওয়া যায়, তবে তাকে কাঁঠালের হাট বলা যায় না।

কাঁঠালহাটিতে হাট না থাকলেও বেশ বড় বাজার আছে। গ্রামের সামনের দিকে হাইওয়ের পাশে নতুনবাজার, সেখানে সুপার মার্কেট হবে এমন কথাও শোনা যাচ্ছে। গ্রামের ভিতরের দিকে রয়েছে পুরনো বাজার।

কাঁঠালহাটিকে অবশ্য গ্রাম বলা অনুচিত হচ্ছে। কাঁঠালহাটিতে পঞ্চায়েত অফিস আছে, থানা আছে। বিডিও অফিস থেকে ভিডিও হল সবই আছে। উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল আছে। হাইওয়ের পেট্রোল পাম্পের পাশে বাস স্টপ থেকে এক্সপ্রেস বাস ধরলে সাড়ে

তিন ঘণ্টায় কলকাতার ময়দানে পৌঁছে দেয়।

বছর তিরিশ চল্লিশ আগে কাঁঠালহাটিকে হয়তো বলা যেত গ্রাম, গণ্ডগ্রাম। কিন্তু এখন জায়গাটি পুরো গ্রাম্যতা বিসর্জন না দিলেও আধাআধি শহর হয়ে উঠেছে।

কাঁঠালহাটি গ্রামের মাঝখানে পুরনো বাজারের উলটো দিকে রয়েছে পঞ্চায়েত ও বিডিও অফিস। ডাকঘর আর থানা।

কাঁঠালহাটি থানার বড় বিপদ।

না। পাঠক-পাঠিকা চট করে ভুল ভেবে নেবেন না।

এখানে প্রতিদিন দিনে-রাতে ডাকাতি-রাহাজানি হচ্ছে, তা নয়। খুন-ধর্ষণ খুব বেড়ে গেছে তাও বলা যাবে না। এত বড় একটা থানা এলাকায় মাসে-দুমাসে দুয়েকটি খুন, দুয়েকটি ধর্ষণ, দু-চারটি ডাকাতি-রাহাজানি, দু-দশটি চুরি বাটপাড়ি এসব তো থাকবেই। যতদিন চন্দ্রসূর্য আছে, জোয়ার ভাটা আছে এসব তো ঘটবেই। মানুষের চরিত্র কি কখনও বদল হবে?

কিন্তু এসব কোনও সমস্যা নয়। এসব তো চিরদিনের মামুলি ঝামেলা। কাঁঠালহাটি থানার বিপদ হয়েছে একটি হনুমানকে নিয়ে। হনুমান না বলে বীর হনুমান বলাই ভাল।

বিপুল আকার ও আয়তনের এই হনুমানটিকে গ্রামের লোকেরা ভালবেসে নাম দিয়েছে বীর হনুমান। কৃত্তিবাসের রামায়ণে অঙ্গদ রায় পরে (লঙ্কাকাণ্ডের প্রায় প্রথমেই) যে বিশাল বানরের কথা বলা আছে, তার বর্ণনা এই হনুমানের সঙ্গে বেশ মেলে।

এই বীর হনুমানটির সঙ্গে আজ প্রায় দশ-এগারো দিন হয়ে গেল বিরোধ বেধেছে কাঁঠালহাটি থানার বীরবিক্রম বড়বাবুর।

কোনও এক অজ্ঞাত কারণে অধিকাংশ পুলিশ থানারই ও. সি. বা বড় দারোগা হলেন সদ্ব্রাহ্মণ। কারণটা কেউ জানে না, বোধ হয় সরকার বাহাদুরও অবহিত নন।

কাঁঠালহাটি থানার ও. সি. হলেন রামগতি গঙ্গোপাধ্যায়। ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক করেন। একাদশী-অমাবস্যায় উপোস করেন। বস্তুত গাঙ্গুলিমশায় এই আজকের দিনেও এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। বর্ণহিন্দু ভিন্ন অন্য কোনও আসামীকে পেটালে কিংবা চড়-চাপড় দিলেও জামাকাপড় ছেড়ে গঙ্গাস্নান করেন। বেজাত কুজাতের বাড়িতে কিংবা নিষিদ্ধ পল্লিতে তল্লাশি বা ধরপাকড় করতে গেলে গলার পৈতে, হাতের পলা বসানো মন্ত্রসিদ্ধ রুপোর আংটি একটা টিনের কৌটোয় ভরে থানার সিন্দুকে রেখে যান।

অপর দিকে রামগতিবাবুর মতো দোর্দণ্ডপ্রতাপ বড় দারোগা আজকাল বিরল। তাঁর প্রতাপে সরকারপক্ষীয় এবং সরকারবিরোধী স্থানীয় পানাসক্ত নেতারা একই ঠেকে চুল্লু খায়, কখনও কোনও গোলমাল হয় না।

যাঁরা ঠেকের ব্যাপারটা জানেন, বুঝতে পারছেন, মুর্শিদকুলি খাঁর মনে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খাওয়ার পরে এরকম ঘটনা আকছার ঘটে না।

প্রবল প্রতাপান্বিত রামগতিবাবুর শাসনে এই কাঁঠালহাটি অঞ্চলে মোটামুটি স্বাভাবিক অবস্থাই ছিল। চুরি-ডাকাতি ইত্যাদি মধ্যে মধ্যে হয়, দু-চারজন দোষী ধরা

পড়ে ঘুষ দেয়, খালাস হয়। আবার চুরি-ডাকাতি করে। সব কিছু বেশ চক্রাকারে চলছিল। গোলমাল শুরু হল নিতাইমাস্টারকে দিয়ে। তিনি একজন স্থানীয় নেতা।

এই নিতাইমাস্টার গত দশ বছরে ছয়বার দল পালটেছেন। তিন পাত্র পেটে পড়ার তাঁর আর মনে থাকে না তিনি এখন কোন দলে আছেন।

ঠেকের চারচালা ঘরের এক প্রান্তে একটা নড়বড়ে টুলে শালখুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে একাই কখনও গান্ধীর সঙ্গে, কখনও ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে, কখনও সুভাষ বসুর সঙ্গে, কখনও ডাঙ্গে-নাম্বুদ্রিপাদ বা চারু মজুমদারের সঙ্গে আপন মনে ঝগড়া করেন।

নিতাইমাস্টার হিসেবি মানুষ। ইচ্ছে করেই নড়বড়ে টুলটায় বসেন। একটু এদিক-ওদিক হলেই টুলটা দুলতে থাকে, ভ্রম হয় খুব বেশি নেশা হয়েছে। দুপাত্র পানীয় কম খেলে চলে।

বীর হনুমানের হাতে প্রথম নির্যাতিত হন এই নিতাইবাবু।

সেদিন সকাল থেকে ছিল বৃষ্টি-বৃষ্টি, মেঘলা। সন্ধ্যার পর থেকে ঝিরঝির করে বৃষ্টি হচ্ছিল। নিতাইমাস্টার যে শালখুঁটিটায় হেলান দিয়ে নড়বড়ে টুলে বসেন তার পাশেই একটা গরাদহীন জানালা।

অনিবার্য কারণেই এইসব চুল্লু বা চোলাই মদের স্বাধীন ঠেকগুলিতে জানলায় গরাদ থাকে না। সমস্ত প্রতিষেধক ব্যবস্থা নেওয়ার পরেও আবগারি ও পুলিসের কর্তারা রুটিনমাফিক হানা দেন অকুস্থলে। দরজায় দাঁড়িয়ে খুব হম্বিতম্বি করেন। সেই সময়ে মাননীয় খদ্দেররা অনর্গল জানালাপথে নিষ্ক্রান্ত হন। খদ্দেরদের এটুকু না দেখলে তারা পড়ে থাকবে কেন, চারপাশে তো ঠেকের অভাব নেই।

সেই বৃষ্টির সন্ধ্যায় সেই খোলা জানালা দিয়ে শীতল বাতাস এবং গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি শুঁড়িখানার ঘরের মধ্যে ঢুকছিল। নিতাই মাস্টার বেশ উপভোগ করছিলেন পরিবেশটা।

আজকের চুল্লু বেশ কড়া ঝাঁঝের। দু'গেলাস থেকেই বেশ গোলাপি নেশা হয়েছে।

ঠেকে গেলাস দেয় না। এখানে মাটির ভাঁড়। কিন্তু মাটির ভাঁড়ে মদ খেতে নিতাই মাস্টারের আত্মসম্মানে লাগে। তিনি একটা ছোট কাচের গেলাস তাঁর পাঞ্জাবির পকেটে রাখেন।

দ্বিতীয় গেলাসটি শেষ করে সবে তৃতীয় গেলাসটি পূর্ণ করেছেন। বাইরে ঝিঁঝি ডাকছে। কোথায় একটা কামিনী ফুলের গাছ থেকে জলে ভেজা সুঘ্রাণ ভেসে আসছে। ঘরের সামনের দিকে ঝোলানো স্তিমিতপ্রায় একটা হ্যারিকেন লণ্ঠনের হলুদ আলো সব কিছুই কেমন ছায়া-ছায়া। খুব মৌজে ছিলেন নিতাইমাস্টার।

আজ ভাগ্য খারাপ ছিল স্বর্গীয় ইন্দিরা গান্ধীর। সন্ধ্যা থেকে তাঁকে তুলোধোনা করেছেন নিতাইমাস্টার। শুধু তাঁকে নয়, তাঁর বাপ-ঠাকুরদা জহরলাল-মতিলালকে নিয়ে পড়লেন তিনি তৃতীয় পাত্রে ছোট একটি চুমুক দিয়ে।

সেই মুহূর্তে একটি অভাবিত ঘটনা ঘটল। আধো অন্ধকার ঘরে, নিতাইমাস্টার কিংবা অন্য কেউ কিছু বুঝবার আগে শীর্ণ অথচ ক্ষিপ্র ও সবল, একটি লোমশ হাতের

থাপ্পড় খেলেন নিতাইমাস্টার। ডান গালে সটান এক চড়।

সেই সঙ্গে সেই লোমশ হাতের মালিক এক ঝটকায় কেড়ে নিল নিতাইবাবুর হাতের চুল্লুর গেলাস। দুই দমে সে সেটা শূন্য করে দিল।

ইতিমধ্যে নিতাইবাবুর আর্ত চিৎকারে পুরো ঠেক নেশার আমেজ ছিঁড়ে সচেতন হয়ে উঠেছে।

লণ্ঠনের আলোয় কিছু বোঝা যাচ্ছিল না। কি হচ্ছে? কেন মাস্টার চেঁচাচ্ছেন?

একজন কারও হাতে একটা টর্চলাইট ছিল। সে তাড়াতাড়ি টর্চটা জ্বেলে আলো ফেলতে গেলাস হাতে কে যেন খোলা জানালা দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল।

এই ক্ষণিক দৃশ্য সেইসঙ্গে নিতাইমাস্টারের আর্তনাদ, এ দুটো মিলিয়ে সবাই বুঝতে পারল যে জানালা দিয়ে কেউ ঠেকের মধ্যে ঢুকে নিতাই মাস্টারের হাত থেকে মদের গেলাস কেড়ে নিয়ে চলে গেল।

এরকম অসম্ভব ঘটনা এই ঠেকের ইতিহাসে কখনও হয়নি। ঘোর নকশাল আমলে নকশালেরা একবার এসে মালিক আর খদ্দেরদের লাঠিপেটা করে, মদ ঢেলে ফেলে দিয়ে, কাঠের বেঞ্চি ভেঙে ঠেক তুলে দিয়েছিল।

আবেকবার আবগারির এক গান্ধীবাদী বড়সাহেব স্বয়ং সেপাই নিয়ে এসে ঠেক তচনচ করে মালিক-সহ জনাপাঁচেক খদ্দেরকে পিঠমোড়া দিয়ে বেঁধে জেলা সদরে নিয়ে যান।

কিন্তু এরকম অতর্কিত জানালা দিয়ে ঢুকে সম্মানিত খদ্দেরের হাত থেকে পানীয়ের গেলাস কেড়ে নিয়ে যাবে—এ তো ভাবা যায় না। কাঁঠালহাটিতে এমন কখনও ঘটেনি।

মাতালেরা সবাই প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠতে না উঠতে সেই জানালার মধ্য দিয়ে বীর হনুমান একটি 'হুম' শব্দ করে ঠেকে প্রবেশ করলেন।

তাঁর হাতে তখনও নিতাইবাবুর কাচের গেলাসটি ধরা রয়েছে, চুল্লুর স্বাদ হনুমানজির খুব পছন্দ হয়েছে। তিনি আরেক পাত্র পানীয় নিতে এসেছেন।

কাঁঠালহাটি ঠিক রামরাজ্যের এলাকা নয়। এ অঞ্চলে বানর-হনুমান খুব সুলভ নয়।

তদুপরি বীর হনুমান ঘরে ঢুকেই চোখে টর্চের আলো পড়তে যে রকম দাঁত খিচোলেন আর সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ আগের চড় খাওয়া অভিজ্ঞতা থেকে নিতাইমাস্টার যেরকম 'ওরে বাবারে, গেছি রে' বলে চেঁচিয়ে লাফ দিলেন—তাতে হুলস্থূল পড়ে গেল।

রীতিমতো হইচই শোরগোল। লোকে ভাবল বুঝি ডাকাত পড়েছে। আশেপাশের পাড়া থেকে, পুরনো বাজার থেকে লোকজন এমন কি থানা থেকে সেপাইরা ছুটে এল।

বড় দারোগা রামগতিবাবু থানার অফিস ঘরে বসে সন্ধ্যার পর এই সময়টা শক্তিসাধনা করেন। তাঁর একটা পকেট কালী আছে। তিনি টেবিলের ওপরে একটা সুদৃশ্য কাচের পেপারওয়েটের গায়ে ঠেস দিয়ে মা কালীকে স্থাপিত করেন। তারপর

টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা সিঁদুর কৌটো আর দুটো প্ল্যাস্টিকের লাল জবা বের করেন। লাল জবা দুটো মায়ের পদতলে রেখে কৌটো খুলে এক বিন্দু সিঁদুর নিয়ে মায়ের পায়ে ঠেকিয়ে তারপর নিজের কপালে সিঁদুরফোঁটা পরেন।

এইসব আনুষঙ্গিক কাজ শেষ হলে পিছনের কাঠের আলমারি থেকে জমাদার শুকদেও যাদব একটি বিলাতি সুধার বোতল এবং একটি শ্বেতপাথরের গেলাস বার করেন। টেবিলের বাঁ দিকের একটি শূন্য ড্রয়ার টেনে শুকদেও গেলাস ও বোতলটি রেখে দেন।

এবার রামগতিবাবু শ্বেতপাথরের গেলাসে অল্প অল্প করে কারণসুধা ঢেলে চুকচুক করে পান করতে করতে ইষ্টদেবীর জপ করতে থাকেন। তাঁর ইষ্টদেবী হলেন ধূম্রলোচন কালীমাতা।

গুনে গুনে একশো আটবার বড় দারোগা সাহেব ইষ্টদেবীর জপ করেন। জপের সংখ্যা ঠিক রাখবার জন্যে তিনি একটি উপায় উদ্ভাবন করেছেন। তাঁর হাতের মাপ খুব পাকা। প্রতিবার গেলাসে ছোট চুমুকের পরের চুমুক পানীয় ঢালেন। প্রতিটি চুমুকের পর একবার করে ইষ্টদেবীর জপ করেন। এইভাবে নয় গেলাস পান করার সঙ্গে একশো আটবার জপ সম্পূর্ণ হয়।

জপ করার সময় কেউ রামগতিবাবুকে বিরক্ত করতে সাহস পায় না, শুধুমাত্র ঘুষদাতা ছাড়া। তবে তিনি তাদের সঙ্গে কোনও কথাই বলেন না। তাছাড়া তিনি ঘুষের টাকা হাত দিয়ে স্পর্শ করেন না।

পানীয়ের বোতল এবং গেলাস যে খোলা ড্রয়ারে থাকে সেখানেই নিঃশব্দে টাকা রেখে যেতে হয়, কেউ কেউ অতি সাবধানী সঙ্গে একটা ছোট চিরকুটে নিজের নাম, ঠিকানা, প্রয়োজন একটা রবারের গার্টারে টাকার সঙ্গে জড়িয়ে দেন। অবশ্য তার কোনও দরকার পড়ে না। বড় দারোগার শ্যেন দৃষ্টি দিয়ে তিনি বুঝে নেন কে কিসের জন্য টাকা দিচ্ছে।

আজ এই ঝিরঝিরে বৃষ্টির সন্ধ্যায় রামগতিবাবু খুব আয়েশ করে ইষ্টনাম জপ এবং কারণসুধা পান করছিলেন। পানীয়টি খুবই উচ্চমানের। খাঁটি বিলিতি এবং তাই শুধু নয় খুবই পবিত্র। মহামান্য পোপের ভ্যাটিকান প্রাসাদের ব্যক্তিগত ফোন নম্বর দিয়ে পানীয়টির নামকরণ হয়েছে ভ্যাটিকান বা ভ্যাট ৬৯ (Vat 69)।

রামগতিবাবু সবে একাত্তর নম্বর ইষ্টজপে পৌঁছেছেন, ধূম্রলোচনার সাধনা করতে করতে ক্রমশ তিনিও ধূম্রলোচন হয়ে উঠেছেন। আজও আমদানি ভাল হয়েছে।

মালেরপাড়ায় বনমালী চট্টরাজ খুন হয়েছে বলে সেই পাড়া একুশজন লোককে কিছুদিন আগে খুনের মামলায় ফৌজদারিতে চালান দিয়েছিলেন। আজ সেই বনমালী চট্টরাজ সশরীরে আদালতে উপস্থিত হয়েছিলেন।

বিকেল থেকে বড় দারোগার মনটা খুঁতখুঁত করছিল। দিনকাল খারাপ, কি সে কি হয়ে যায় কে জানে?

অবশেষে এতক্ষণে একাত্তর চুমুক প্রসাদ সুধা পান করে এবং সমপরিমাণ ইষ্টনাম

জপ করে তিনি একটু ধাতস্থ বোধ করছিলেন।

আরেক চুমুক হলেই ছয় নম্বর গেলাস শেষ হয় এমন সময় ইষ্টজপে বাধা পড়ল। চুল্লুর ঠেকে ডাকাত পড়েছে ভেবে যে সেপাইরা থানা থেকে ছুটে গিয়েছিল, তারা এবং তাদের সঙ্গে আরও বহু লোকজন, তার মধ্যে ঠেকের খদ্দেররাও আছে চেঁচাতে চেঁচাতে থানার মধ্যে ঢুকে পড়ল। সকলের মুখে এক কথা. 'হনুমান নিতাইমাস্টারকে চড় মেরেছে।'

এই অবৈধ প্রবেশে তদুপরি তাঁর ধর্মকর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি করায় বড়বাবু খুবই চটে গিয়েছিলেন। কিন্তু দিনকাল বড় খারাপ। আজ আদালতের ঘটনাটাও খুব সুবিধের নয়। তাছাড়া থানার মধ্যে উত্তেজিত জনতা।

ঘটনার গুরুত্ব অনুধাবন করার চেষ্টা করলেন। রামগতিবাবু বহু লোকের সম্মিলিত কলরবে তিনি 'হনুমান' শব্দটি শুনতে পাননি শুধু শুনেছে 'নিতাইমাস্টারকে চড় মেরেছে।'

পাকা দারোগার মতো রামগতিবাবু ঘটনার ভিতরে প্রবেশ করলেন, 'নিতাইমাস্টারকে কেন চড় মেরেছে?'

জনতার মধ্যে একজন বলল, 'নিতাইমাস্টার মদ খাচ্ছিলেন।'

রামগতিবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'চড় যে মেরেছে সে অন্যায় কিছু করেনি। মাতালদের চাবকানো উচিত।' বলতে বলতে ছয় নম্বর গেলাসের শেষ চুমুকটি না খেয়েই গেলাসটি অতি সন্তর্পণে খোলা ড্রয়ারে স্থানান্তরিত করলেন।

নিতাইমাস্টারকে কেউ চড় মেরেছে এটা জেনে রামগতিবাবু মনে মনে খুশিই হয়েছিলেন। লোকটা কখন কোন দলে কিছু বোঝা যায় না। একেক সময় বড় জ্বালায়, এমন কি সরকারের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেয়। কিন্তু এখন মনের ভাব গোপন করে দারোগাসুলভ গাম্ভীর্যে তিনি জানতে চাইলেন, 'তখন নিতাইমাস্টার কী করেছিলেন?'

চুল্লুর ঠেকের এক প্রত্যক্ষদর্শী খদ্দের বললেন, 'কি বলব স্যার, নিতাই মহীয়সী ইন্দিরা গান্ধীকে গালাগাল করছিল, অনেকক্ষণ ধরেই করছিল।'

একথা শুনে রামগতিবাবুর মাথায় রক্ত উঠে গেল। তিনি ইমারজেন্সি রিক্রুট। দিনের পর দিন মাসের পর মাস দেয়ালে দেয়ালে 'এশিয়ার মুক্তিসূর্য ইন্দিরা গান্ধী' লিখে দারোগার চাকরি পেয়েছিলেন।

রামগতিবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় কি যে হল। হঠাৎ আঁতকিয়ে উঠে উত্তেজিত জনতা দ্বিখণ্ডিত হয়ে পথ করে দিল আর সেই বীর হনুমান তার হাতে তখনও ধরা রয়েছে নিতাইমাস্টারের কাচের গ্লাস সে মুখে 'হুপ-হুপ' শব্দ করতে করতে এবং স্পষ্টতই প্রমত্ত অবস্থায় টলতে টলতে থানা কক্ষে প্রবেশ করল।

তখন বড় দারোগা রামগতিবাবু সম্বিৎ হারাননি, তিনি হনুমানের উদ্দেশে হেঁকে উঠলেন, 'এই এখানে কি? ভাগ এখান থেকে।'

হনুমান ঘরের মধ্যখানে এসে গেছে। সে কটমট করে রামগতিবাবুর দিকে তাকাল, সে'ও ইতিমধ্যে ধূম্রলোচন হয়ে গেছে, সে দৃষ্টি বড় ভয়ঙ্কর।

জমাদার শুকদেও যাদব বড় দারোগার পিছনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি বললেন, 'সাহেব হিন্দিমে বলিয়ে বজরঙ্গবলী বাংলা সমঝায় না।'

উপস্থিত জনতার মধ্যেও অনেকে বলল, 'স্যার হনুমান বাংলা কি বুঝবে, ওর সঙ্গে হিন্দিতে কথা বলুন।'

কিন্তু, দুঃখের বিষয়, হিন্দি বা বাংলা কোনও ভাষাই ব্যবহার করার সুযোগ পেলেন না রামগতিবাবু। তার আগেই হনুমান এক লাফে টেবিলে উঠে সটান এক চড় কষাল রামগতিবাবুর গালে।

একাত্তর চুমুক কারণ সুধার পরে এই রকম একটা মত্ত হনুমানের চড় রামগতিবাবু চোখ উলটিয়ে মেঝেতে টলে পড়লেন।

হইহই কাণ্ড। চোখে-মুখে জল ছিটাও, ডাক্তার ডাকো।

বীর হনুমান কিন্তু নির্বিকার। সে ধীরে-সুস্থে টেবিলের ওপর বসে খালি ড্রয়ারের মধ্যে হাত গলিয়ে প্রথমে বড় দারোগার পাথরের গেলাসটা বার করে অবশিষ্ট বাহাত্তরতম চুমুকটি শেষ করল।

জিনিসটা তার ভালই লাগল। এবার সে শ্বেতপাথরের গেলাসটা মেঝেতে ছুঁড়ে ভেঙে ফেলে দিল। তারপর নিতাইমাস্টারের কাচের গেলাসটায় ভ্যাট উনসত্তরের বোতল থেকে মূল্যবান পানীয় ঢেলে ঢেলে খেতে লাগল।

এতক্ষণে তার দৃষ্টি পড়ল টেবিলের ওপর স্থাপিত পেপার-ওয়েট নির্ভর পকেট কালীটার দিকে। মা কালীর পদপ্রান্তের সিঁদুর সাবধানে সাবধানে একটা আঙুলে ছুঁইয়ে নিজের লোমশ কপালে মাখল, তার আগে অবশ্য অল্প একটু সিঁদুর জিব দিয়ে চেটে পরীক্ষা করেও দেখেছিল।

এরপর যেটুকু করার বাকি ছিল সেটুকুও করল। একটি ছোট লাফ দিয়ে বড়বাবুর সদ্য পরিত্যক্ত সামনের চেয়ারে গিয়ে বসল।

এদিকে ধরাধরি করে বারান্দায় নিয়ে গিয়ে মুখে চোখে জল ছিটোতে একটু পরে রামগতিবাবুর জ্ঞান ফিরল। জ্ঞান ফিরতেই তিনি প্রথম আদেশ দিলেন, 'ওই বানর হারামজাদাকে গুলি করে মার।'

আদেশ শুনে হনুমানভক্ত জমাদার শুকদেও যাদব শিউরে উঠলেন। জিব কেটে, চোখ বুজে, কানে আঙুল দিলেন। তারপর ধাতস্থ হয়ে বীরের মতো জানালেন, তিনি তাঁর শরীরে প্রাণ থাকতে বজরঙ্গবলীর ওপর গুলি চালাতে দেবেন না। জনতার মধ্যেও অনেক সমস্বরে শুকদেওজিকে সমর্থন জানালো।

ব্যাপার সুবিধের নয় বুঝে, ভঙ্গ নেশা নিয়ে রণে ভঙ্গ দিয়ে রামগতিবাবু কোয়ার্টারে ফিরে গেলেন।

পরের দিন সকালবেলায় হনুমানটাকে কাঁঠালহাটির কোথাও দেখা গেল না। সবাই, বিশেষ করে রামগতিবাবু এবং নিতাইমাস্টার হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

কিন্তু ভর সন্ধ্যায় কোথা থেকে যে ফিরে এল হনুমান। প্রথমে চুল্লুর ঠেকে এবং পরে থানায় আক্রমণ চালাল। যথা ক্রমে নিতাই মাস্টার এবং রামগতিবাবু নির্যাতিত

হলেন।

তারপর থেকে আজ দশদিন একনাগাড়ে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়ে চলেছে।

দিনমানে বীর হনুমানের টিকিটিও দেখতে পাওয়া যায় না। অন্ধকার ঘন হতেই তার হামলা শুরু হয়।

দ্বিতীয় দিন চড় খাওয়ার পরেই নিতাইমাস্টার ঠেকে আসা এবং চুল্লু খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন।

তৃতীয় দিন থেকে রামগতিবাবু সন্ধ্যাবেলা থানায় না বসে নিজের কোয়ার্টারেই ধূম্রলোচনার সাধনা করেছিলেন। কিন্তু চতুর্থ দিনেই গন্ধে গন্ধে হনুমান সেখানে হাজির।

বনদপ্তরকে রামগতিবাবু খবর দিয়েছিলেন, তাঁরা বলেছেন দিনের বেলায় হনুমান বেরলে জানাবেন। আমাদের লোক গিয়ে ধরে আনবে। রাতের বেলায় সম্ভব হবে না, কর্মীদের তা হলে ওভারটাইম দিতে হবে।

ফায়ার ব্রিগেড অনেক সময় এ ধরনের কাজ করে। মহকুমা সদরে গিয়ে দমকল দপ্তরে কথা বলে এসেছেন। কিন্তু তারা নারাজ। আগুন না লাগলে তাঁরা নড়বেন না।

কাঁঠালহাটি থানার বড় বিপদ।

রামগতিবাবু স্থির করেছেন একদিন সন্ধ্যায় গোপনে থানায় আগুন ধরিয়ে দেবেন।

দুই মাতালের গল্প

আপনাদের সকলের সঙ্গে বোধ হয় এঁদের দুজনের পরিচয় নেই। গল্প লেখার আগে এঁদের সঙ্গে আপনাদের আলাপ করিয়ে দিই, তাতে এই ঝাঁঝালো তরল কাহিনী পান করা সহজ হবে। প্রথম জন, যিনি এক হাতে গালে দিয়ে আরেক হাত গেলাস ধরে টেবিলের ডানপাশে বসে আছেন, যাঁর চোখে মোটা কাচের চশমা, একমাথা এলোমেলো সাদা-কালো চুল, গালে জুলফির নিচে একটা লাল তিল—যিনি এইমাত্র

এক চুমুকে পুরো গেলাসটা সাফ করে টেবিলে আধুলি ঠুকে বেয়ারাকে ডাকছেন তিনি হলেন জয়দেব পাল।

আর জয়দেববাবুর মুখোমুখি উল্টোদিকের চেয়ারে বসে আছেন মহিমাময়, এঁর পদবীর প্রয়োজন নেই, মহিমাময়ই যথেষ্ট, এ রকম নামের খুব বেশি লোক নেই। মহিমাময়ের হাতেও গেলাস। মহিমাময়ের গলার স্বর খুব ভারি এবং সবসময়েই তিনি উচ্চগ্রামে কথা বলেন।

জয়দেব এবং মহিমাময় দুজনেই বাল্যবন্ধু। নেবুতলা করোনেশন বয়েজ হাই ইংলিশ স্কুলে দুজনে ক্লাস থ্রি থেকে একই ক্লাসে পড়েছেন, দুজনেই প্রথম বছরের স্কুল ফাইনাল, তার মানে এই মুহূর্তে দুজনেই কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্ব পঞ্চাশ। এই ব্যাপারটা, মানে বয়েসের ব্যাপারটা বেশ জটিল। এখন জয়দেবের বয়েস বাহান্ন, মহিমাময়ের তিপ্পান্ন। জয়দেব বলেন, 'যাহা বাহান্ন, তাহা তিপ্পান্ন।' আর মহিমাময় বলেন, 'জানিস, ব্যাপারটা এতো সোজা নয়। যখন তোর বয়েস ছিলো এক—আমার বয়েস ছিলো দুই, এক সময়ে আমার বয়েস তোর বয়সের ডবল ছিলো, সে কথাটা ভুলবি না। বয়েসের ব্যাপারটা মহিমাময় আর জয়দেববাবুর নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমরা তার মধ্যে যাচ্ছি না। শুধু পরিচয় প্রদানে সামান্য ফাঁক রয়ে গেছে, সেটুকু বলি।

মহিমাময় বিবাদী বাগে একটা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে মাঝারি মাপের চাকরি করেন। বিবাহিত এবং ইত্যাদি। জয়দেব আগে ছবি আঁকতেন, এখন সিনেমার লাইনে টুকটাক ছোটবড় কাজ করেন, বিবাহিত এবং ইত্যাদি। এই আমার এক দোষ। সুযোগ পেলেই বেশি বলে ফেলি।

পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে অযথা দেরি করে ফেললাম।

এদিকে জয়দেববাবুর আধুলির বাজনা শুনেও বেয়ারা এখন পর্যন্ত এ টেবিলে আসেনি। মহিমাময়ের পানীয়ও পুরিয়ে গেছে। কিন্তু তিনি এই মুহূর্তে আর পানীয় চান না, তিনি চান না জয়দেবও আর পানীয় নিক।

আজকেই ঘটনাটা ঘটেছে।

জয়দেবের শরীরটা আজ কিছুদিন হলো ভালো যাচ্ছে না। সারাদিন শরীর ম্যাজম্যাজ করে, বিকেলের দিকে গা গুলোয়, সকালে মাথা ধরে থাকে, পেটের বাঁ পাশে নিচের দিকে অনেক সময়েই একটা চাপা ব্যথা।

জয়দেব গিয়েছিলেন ডাক্তার দেখাতে। ডাক্তার অনেক রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অবশেষে মুখ গম্ভীর করে বলেছেন, 'আপনাকে মদ খাওয়া ছাড়তে হবে।'

সেই কথা শুনে মহিমাময় চেষ্টা করেছিলেন জয়দেবকে বোঝাতে যাতে তিনি পান করা ছেড়ে দেন। কিন্তু কে শোনে কার কথা। জয়দেব উদাসীন কণ্ঠে বললেন, 'বাজে বকিস না মহিমা, খবর নিয়েছিস, কোনোদিন ভেবে দেখেছিস পৃথিবীতে যত বুড়ো মাতাল আছে তার চেয়ে অনেক কম আছে বুড়ো ডাক্তার। মদের ব্যাপারে ডাক্তারের পরামর্শ আমি নেবো না।'

মদ খাওয়া এত সহজে জয়দেব ছেড়ে দেবেন, সামান্য ডাক্তারের ভয়ে, এ আশা

অবশ্য মহিমাময় করেননি। তিনি তাঁর প্রাণের বন্ধুকে হাড়ে হাড়ে চেনেন।

জয়দেবের আধুলি বাজনা ইতিমধ্যে অতি উচ্চগ্রামে উঠেছে। এখন তাঁর দু হাতে দুটো আধুলি, তিনি দ্রুতলয়ে টেবিলের কাচের উপরে বাজাচ্ছেন। বোধহয় গ্লাসটা ভেঙে যেতে পারে এই আশঙ্কায় অবশেষে বেয়ারা এলো। তার দুহাতে দুটো পূর্ণ গেলাস, একটা অবশ্যই জয়দেবের অন্যটি মহিমাময়ের।

বিনা আপত্তিতে মহিমাময় আরেক গেলাস পানীয় নিলেন, একটু আগের মানসিক বাধা টিকলো না।

তারপরে আরো এক গেলাস, আরো এক গেলাস ; তরল বুদ্বুদময় পানীয়ের দ্রুত স্রোতে ভেসে চললো রাতের প্রহর।

রাত এখন কটা?

প্রায় প্রতিদিনই এ রকম হয়। প্রথমে জয়দেব বেশি পান করে ফেলেন। তখন মহিমাময় একটু ভেবেচিন্তে, একটু টেনে খান। তারপর কিছুটা ওজর-আপত্তি ইত্যাদির পর মহিমাময় ধাতস্থ হন। তখন তিনি দ্রুতগতিতে পান করতে থাকেন, আস্তে আস্তে গেলাসের দৌড়ে তিনি জয়দেবকে ধরে ফেলেন। তারপর দুজনে সমান-সমান, কানায়-কানায়। এই সমতাটা আসে রাত বারোটা নাগাদ। এর আধ ঘণ্টা আগে পানশালার সামনের ঝাঁপ পড়ে গেছে। এদিক-ওদিক দু-একটি টেবিলে জয়দেব মহিমাময়ের মত দুয়েকজন ইতস্তত বসে আছেন। অধিকাংশ আলো নেবানো। অবশেষে কিঞ্চিৎ টলতে টলতে দুই ছায়ামূর্তি জয়দেব ও মহিমাময় পিছনের দরজা দিয়ে প্যাসেজে বেরিয়ে উলটো ঘুরে পানশালা থেকে রাস্তায় এসে পড়েন।

রাস্তার খোলা হাওয়ায় দুজনেরই মন বেশ চাঙ্গা হয়ে ওঠে। 'টা-টা বাই-বাই, গুডনাইট, কাল দেখা হবে।' ইত্যাদি বাক্য বিনিময় করে সাধারণত দুজনে যে যাঁর বাড়ির দিকে রওনা হন।

আজ কিন্তু একটু গোলমাল হলো।

কিছুক্ষণ ধরেই জয়দেব বেশ চুপচাপ ছিলেন, হঠাৎ রাস্তায় বেরিয়ে এসে পেটে হাত দিয়ে বসে পড়লেন, একটা ক্ষীণ কাতরোক্তি মুখ দিয়ে বেরোলো।

এই রকম অবস্থায় খুব বিহ্বল হয়ে পড়েন মহিমাময়। চিরকালই তাঁর স্বভাব হলো সমস্যা থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকা। যদি কখনো সমস্যা ঘড়ে এসে পড়ে তিনি সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়েন। কোনো চেষ্টা করেন করেন না উদ্ধার পাওয়ার।

আজো তাই করতে যাচ্ছিলেন। মহিমাময় জয়দেবের পাশেই পেটে হাত দিয়ে বসতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সে কাজে বাধা পড়লো। পেছন থেকে কে একজন জামার কলার ধরে মহিমাময়কে আটকালেন।

ঘাড় ঘুরিয়ে মহিমাময় দেখেন পুরনো বন্ধু নন্দ। নন্দবাবু জয়দেব আর মহিমাময় দুজনেরই মোটামুটি বন্ধু। একই বারে, একই টেবিলে তাঁরা একত্রে বহুবার মদ্যপান করেছেন। কাছাকাছি অন্য কোনো একটা পানশালায় নন্দবাবু বোধহয় ছিলেন। তিনিও এখন বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। এভাবে এঁদের দুজনকে এ অবস্থায় দেখে দাঁড়িয়ে

পড়েছেন এবং মহিমাময়কেও দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। জয়দেব তখনো পেটে হাত দিয়ে রাস্তায় বসে, সেদিকে তাকিয়ে নন্দবাবু বললেন, 'মাঝেমধ্যেই তো এরকম হচ্ছে দেখছি। ডাক্তার দেখানো হয়েছে?'

মহিমাময় বললেন, 'ডাক্তার তো দেখিয়েছে বলছে। কিন্তু তার কথা তো জয়দেব শুনছে না।'

নন্দবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী বলেছে ডাক্তার?'

নন্দবাবু শুনে বললেন, 'মদ খাওয়া ছাড়তে বললেই তো ছাড়া যায় না। মদ খাওয়া ছাড়াতে হয়। এ ব্যাপারে আলাদা ডাক্তার আছে।' মদ খাওয়া ছাড়ানোর ডাক্তারের ব্যাপারটা ঠিক মহিমাময় বুঝতে পারলেন না। কিন্তু ততক্ষণে নন্দবাবু একটা ট্যাক্সি ধরে ফেলেছেন। তিনি মহিমায়কে ঠেলে দিয়ে, জয়দেবকে আলগোছে দাঁড় করিয়ে সামনে এগিয়ে ট্যাক্সির মধ্যে ঠেলে দিলেন।

তিনজনে ওঠার পর ট্যাক্সি ছাড়লো। নন্দবাবু বললেন, 'আগে জয়দেবকে নামাবো। তারপরে আমি, সবশেষে তুমি।' নেশাগ্রস্ত অবস্থাতেই মহিমাময় বুঝলেন ট্যাক্সিভাড়াটা তাঁকেই মেটাতে হবে। তা হোক, নন্দ লোকটা মাতাল হলেও চিরকালই একটু কৃপণ কিন্তু লোক খারাপ নয়।

ট্যাক্সিতে যেতে যেতে নন্দবাবু মদ খাওয়া ছাড়ানোর ডাক্তারবাবুর কথা আবার বললেন। যতটা বোঝা গেলো, ঠিক ডাক্তারবাবু নয়, ডাক্তার সাহেব। ডাক্তার ভদ্রলোকটি বহুদিন মার্কিন দেশে ছিলেন। সেখান থেকে মাতলামি ছাড়ানোর সিদ্ধহস্ত হয়ে ফিরে এসেছেন। ডাকসাইটে মার্কিনী মাতালদের তিনি সচ্চরিত্র, সাধুপুরুষে রূপান্তরিত করিয়েছেন। ভদ্রলোকের পুরো নাম এই গল্পে প্রয়োজন নেই, ডাক্তার মল্লিক বললেই চলবে। ডাক্তার মল্লিক মাত্র মাস কয়েক আগে দেশে ফিরে এসে বেহালায় ঠাকুরপুকুরের কাছে কোথায় যেন একটা নৈশ সেবাসদন, নৈশ মানে রাত্রিকালীন নয়, নেশা সংক্রান্ত চিকিৎসালয় স্থান করেছেন।

গাঁজা, ভাঁং, আফিম, চরস, কোকেন, হেরোইন, সাদা-সবুজ-লাল যত রকম নেশা আছে সেই সঙ্গে মদের নেশা এমন কি সিগারেটের নেশা পর্যন্ত সেবসদনে নির্মূল করে সারানো হয়।

কিছুই না, মাত্র পনেরো দিন থাকতে হবে ঐ সেবাসদনে। পনেরো দিন নিয়মিত শয়ন, বিশ্রাম ও আহার। সেই সঙ্গে সামান্য কিছু ওষুধ আর মানসিক চিকিৎসা। আগে এই শেষের ব্যাপারটা, মানসিক চিকিৎসাই মুখ্য। রোগীর মাথায় তার নেশার বস্তুর বিরুদ্ধে ভয়াবহ চিন্তাধারা প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। যে গেঁজেল, তার এর পর থেকে গাঁজার কলকের আগুন দেখলেই বিসুবিয়াসের অগ্ন্যুৎপাতের কথা মনে হবে। যে মাতাল, এর পর মদের বোতল দেখলেই নোয়ার প্লাবনের কথা স্মরণ হবে—সে ভয়ে কুঁকড়িয়ে যাবে, নেশার বস্তু দেখে থরথর করে কাঁপতে থাকবে। ডাক্তার মল্লিকের চিকিৎসার এমনই মহিমা। নন্দবাবুর বক্তব্য শেষ হওয়ার অনেকক্ষণ পরেও যখন ট্যাক্সিটা জয়দেবের বাড়ির কাছে পৌঁছলো না, মহিমাময় বুঝলেন ট্যাক্সিওলা হয় রাস্তা

ভুল করেছে না হয় ইচ্ছে করে ঘুরপথে যাচ্ছে।

দ্বিতীয়টাই স্বাভাবিক। কারণ পার্ক স্ট্রিটের মধ্যরাতের এমন কোন্ ট্যাক্সিওলা আছে যে জয়দেবের বাড়ি চেনে না? তাছাড়া লোকটা একবারও জিজ্ঞেস করেনি কোথায় যেতে হবে।

মহিমাময় ট্যাক্সিওলাকে বললেন, 'সর্দারজী, (চিরদিন মত্ত অবস্থায় ট্যাক্সি ড্রাইভারকে মহিমাময় কোনো এক অজ্ঞাত কারণে সর্দারজী বলে সম্বোধন করেন, আজও অবশ্য ভুল হয়নি) জয়দেববাবুকা বাসা আপ নেহি জানতা হ্যায়?'

সর্দারজী বিনীতভাবে বললেন, 'বহুত জানতা হ্যায়।' এর পর পরিষ্কার বাংলায় বললেন, 'জয়বাবু বাসায় যাওয়ার আগে তিন-চার পাক হাওয়া খেয়ে নেন। তাতে ওঁর কষ্ট কমে, মনে ফুর্তি আসে। বাড়ি ফিরতে অসুবিধা হয় না। আজ আড়াই পাক হয়ে গেছে, আর দেড় পাক দিলেই মনে হচ্ছে ঝামেলা মিটে যাবে।' মহিমাময় প্রমাদ গুনলেন, জয়দেবের চারপাক, তারপর নন্দবাবুর কয়পাক কে জানে, তারপর নিজের বাড়ি যাওয়া—আজ কত টাকা ট্যাক্সি বিল হবে, কি জানি? তবে মহিমাময় জানেন নিরানব্বুই টাকা পঁচাত্তর পয়সার চেয়ে বেশি বিল ওঠা মিটারের সম্ভব নয়, সেটাই যা রক্ষা।

নন্দবাবু বোধহয় মহিমাময়ের চিন্তাধারা মনে মনে অনুসরণ করছিলেন। হঠাৎ তিনপাকের মাথায় একটা মোড়ে, 'রোকখে, রোকখে, বেঁধে, বেঁধে...' বলে গাড়ি দাঁড় করিয়ে দ্রুত নেমে পড়লেন। তারপর গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ গলিয়ে মহিমাময়কে বললেন, 'এখান থেকে আমার বাড়ির দিকে একটা শর্টকার্ট আছে, আমি যাচ্ছি। কিন্তু নৈশ সেবাসদনের কথাটা ভুলো না।'

না, মহিমাময় নৈশ সেবাসদনের কথা বিস্মৃত হননি। বলা উচিত নিজেকে বিস্মৃত হওয়ার সুযোগ দেননি।

সেই রাতে জয়দেবকে নামিয়ে দিয়ে, তারপর নিজের বাড়িতে ফিরে যখন পুরো একটা একশো টাকার নোট, ট্যাক্সিভাড়া সাতাশি টাকা আর তেরো টাকা সর্দারজীর বখশিস, মহিমাময়কে দিতে হলো তখনই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন ব্যাপারটার একটা ফয়সালা চাই, অবিলম্বে চাই।

পরের রবিবার সকালে জয়দেবের বাড়িতে গিয়ে জয়দেবের স্ত্রীর সঙ্গে কথা বললেন। দেখা গেলো মিসেস জয়দেব সব খবরই রাখেন, বোধহয় নন্দবাবুই ইতিমধ্যে এসে বলে গেছেন।

মিসেস জয়দেব বুদ্ধিমতী মহিলা। তাঁর ধারণা এসব নিতান্ত তুকতাক জাতীয় চিকিৎসা। এত সহজে, মাত্র এক পক্ষ সেবাসদনে বাস করেই তাঁর স্বামীর এতদিনের জটিল মত্ততার হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে—একথা মিসেস জয়দেব কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না। মহিমাময় মিসেস জয়দেবকে বোঝালেন যে এসব হলো অমোঘ আমেরিকান চিকিৎসা, এমন কি রাশিয়ায় পর্যন্ত এখন এই চিকিৎসায় হাজার হাজার লোক ভদকা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। তা ছাড়া নন্দবাবুর এক দূর-সম্পর্কের

শালা মাত্র এক সপ্তাহের চিকিৎসাতেই চল্লিশ বছরের গাঁজার নেশা বন্ধ করে দিয়েছে। এখন সে দুবেলা শুধু দু গেলাস দুধ খায়, নেশার জিনিস বলতে নেহাতই সারাদিনে কয়েকটা গুণ্ডিপান। অনেক কষ্টে মিসেস জয়দেবকে নিমরাজি করানো গেলো। কিন্তু এবার চিন্তায় পড়লেন মহিমাময়, জয়দেব কি এই চিকিৎসায় রাজি হবে, নাকি শেষ পর্যন্ত বেঁকে বসবে। কাল ছিলো শনিবার। কাল নাকি অনেক রাতে জয়দেব বাড়ি ফিরেছে, এখন ভেতরের ঘরে ঘুমোচ্ছে। ভয়ে ভয়ে মহিমাময় মিসেস জয়দেবকে বললেন, 'এখন ভালোয় ভালোয় জয়দেবকে রাজি করাতে পারলে হয়।'

মিসেস জয়দেব একটু হাসলেন, বললেন, 'সে নিয়ে আপনাকে ভাবনা করতে হবে না। ও একপায়ে দাঁড়িয়ে আছে, বলছে, দিন পনেরো নিরিবিলি শান্তিতে একটু বিশ্রাম পেলে শরীরটা জুড়িয়ে যায়। বরং আমিই আপত্তি করছিলাম।'

মহিমাময় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'তা হলে আর কোনো বাধা নেই। এবার সেবাসদনে গিয়ে দিনক্ষণ ঠিক করে ফেলি। ঘুম থেকে উঠলে জয়দেবকে বলবেন যে আমি এসেছিলাম।'

বন্ধুর সুচিকিৎসা ফেলে রাখা উচিত নয়। আর সপ্তাহে রবিবার মাত্র একটাই।

জয়দেবের বাড়ি থেকে মহিমাময় সরাসরি গেলেন মল্লিকের সেবাসদনে। সুন্দর জায়গা। একটা পুরনো বাগানবাড়ি ভালো করে সারিয়ে, চুনকাম করে, শক্ত লোহার গেট লাগিয়ে সেবাসদন তৈরি হয়েছে। বাইরে বড় বড় হরফে বিশাল সাইনবোর্ড লাগানো রয়েছে।

নৈশ সেবাসদন
এখানে সকল প্রকার প্রাচীন ও দুরারোগ্য
নেশার বিলাতি মতে চিকিৎসা করা হয়।।

সাইনবোর্ডের আয়তন এবং সেবাসদনের বাড়িটি দেখে মহিমাময়ের মনে বেশ সম্ভ্রমের ভাব এলো।

সুরকি-বাঁধানো সড়ক দিয়ে গাড়িবারান্দায় নিচে একপাশে অফিসঘরে পৌঁছলেন মহিমাময়। সামনে টানা বারান্দা, তার মাঝবরাবর সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়।

বারান্দার দুপাশে একেক রকম বস্তুর নাম লেখা—কোথাও লেখা 'গাঁজা', কোথাও 'ভাঙ', কোথাও 'সিদ্ধি', বাংলায় এবং পাশাপাশি ইংরেজি অক্ষরে এগুলির লাতিন নাম লেখা। দোতলায় সিঁড়িব পাশে তীরচিহ্ন দিয়ে লেখা আছে মদ, পাশে ইংরেজিতে লেখা কোহল সেকসন, সঙ্গে ব্র্যাকেট ওয়াইন, লিকার এট্‌সেট্রা। অফিসঘরে বেশ কয়েকজন লোক কাজ করছেন, একজন মহিলা টাইপমেশিন মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে আছেন। অন্য এক মহিলা একটা সাদা টেলিফোনে ফিসফিস করে কার সঙ্গে যেন খুব অন্তরঙ্গ কথা বলছেন।

অফিসের অধীশ্বরের নাম কুঞ্জলাল। তিনিই অফিসের বড়বাবু। মহিমাময়কে খুব আদর করে বসিয়ে কুঞ্জলাল জানতে চাইলেন, 'আপনার সমস্যাটা কী রকম? কঠিন, না বায়বীয়?'

কবে সেই বিহ্বল প্রথম যৌবনে কলেজে পদার্থবিদ্যার ক্লাসে এই রকম একটা বিভাজনের কথা শুনেছিলেন মহিমাময়। তিনি স্মৃতি উদ্ধার করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কঠিন, তরল এসব মানে কী?'

কুঞ্জলাল বললেন, 'আপনাকে তো রোগী মনে হচ্ছে না?'

মহিমাময় বললেন, 'না, আমি আমার বন্ধুর জন্যে খবর নিতে এসেছি।'

কুঞ্জলাল বললেন, 'তাহলে এবার বলুন, আপনার বন্ধুটি কঠিন, তরল না বায়বীয়? অবশ্য ডাক্তার মল্লিকের কাছে একসঙ্গে দুটো-তিনটে উপসর্গ হলেও কোনো অসুবিধা হয় না।'

মহিমাময়ের মুখ দেখে কুঞ্জলাল বুঝতে পারলেন তাঁর কিছুই হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে না। তখন বিশদ করে বললেন, 'আপনি তো নেহাৎ শিশু মশায়। কঠিন হলো আফিম, ট্যাবলেট এই সব। তরল হলো মদ, সিদ্ধি, আর বায়বীর হলো গাঁজা, চরস।'

কুঞ্জলালের হেঁয়ালি শেষ হলে মহিমাময় যেটুকু খবর সংগ্রহ করতে পারলেন তার থেকে বোঝা গেলো পনেরো দিনের চিকিৎসায় প্রায় তিন হাজার টাকা খরচ হবে। বিফলে মূল্য ফেরত নয়, তবে এখন পর্যন্ত কেউ বিফল হয়ে ফেরেনি।

ইতিমধ্যে গাঁজার ঘর থেকে একটি গাঁজাখোর মেয়ে ছোট এক গাঁজার কলকেতে ধোঁয়া টানতে টানতে বেশ কয়েকটা ফিকে নীল রিং ঠোঁট দিয়ে ছুঁড়ে অফিসঘরের মধ্যে এলো। মহিলাকে দেখেই মহিমাময় চিনতে পারলেন, একটি বিখ্যাত সাবানের জনপ্রিয় মডেল মমতাজ চৌধুরী।

অফিসঘরের হাওয়ায় গাঁজার রিংগুলি মিলিয়ে যাওয়ার আগেই শ্রীমতী মমতাজ অন্তর্হিত হলেন। তাঁর অন্তর্ধানপথের দিকে কিছুক্ষণ নিষ্পলক তাকিয়ে থেকে চোখ থেকে বাই-ফোকাল চশমাটা নামিয়ে পকেটের রুমাল দিয়ে চোখ এবং চশমা দুই মুছে নিয়ে কুঞ্জলাল বললেন, 'মমতাজ দেবী মাত্র তিনদিন এসেছেন। আগে দৈনিক দেড়শো গাঁজার ধোঁয়ার রিং ছাড়তেন, এই তিনদিনেই রিং-এর সংখ্যা একশো দশে এসে নেমেছে। পনেরো দিনের মাথায় ভ্যানিশ হয়ে যাবে।' এমন সময় একটা গাড়ি এসে বারান্দার নিচে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে সবাই সচকিত হয়ে উঠলো। যে ভদ্রমহিলা টাইপমেশিনে মাথা দিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন, তিনি তাড়াতাড়ি মেশিন থেকে মাথা তুলতে গিয়ে তাঁর চুলের বেণীটা মেশিনের কি-বোর্ডে আটকিয়ে গেলো। যে মহিলা টেলিফোনে এতক্ষণ অন্তরঙ্গ বাক্যালাপ চালাচ্ছিলেন তিনি দুম করে ফোনটা বিনা নোটিশে ছেড়ে দিলেন।

ডাক্তার মল্লিক অফিস কক্ষে প্রবেশ করলেন। তাঁর চোখে পুরনো আমলের বড় বড় গোল কাচের নিকেলের ফ্রেমের চশমা, এটাই হাল আমলের মার্কিনী ফ্যাশান। এই সঙ্গে লাল গোলাপী গেঞ্জি, তার পিঠে বড় বড় কালো অক্ষরে লেখা OH-HO-OH-HO, শব্দগুলোর চারপাশে সবুজ লতাপাতা। ডাক্তার মল্লিককে দেখে খুব ভক্তি হলো মহিমাময়ের। খুব বিশ্বাস হলো যে ইনি পারবেন জয়দেবের নেশা ছাড়াতে। ডাক্তার মল্লিক প্রবেশ করার পর সকলের সঙ্গে মহিমাময়ও উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। শুধু

সেই টাইপিস্ট মেয়েটি যন্ত্র থেকে বেণী ছাড়াতে না পেরে সম্পূর্ণ উঠে দাঁড়াতে পারেনি। সে টেবিল ঘেঁষে তিন কোনাচে হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো। ডাক্তার মল্লিক এসব ভ্রুক্ষেপ করলেন না, দ্রুত গতিতে 'গুডমর্নিং' বলে পাশের ঘরে নিজের চেম্বারে চলে গেলেন।

মহিমাময়ও বেরিয়ে পড়লেন।

পরের শনিবারই জয়দেবকে স্থানান্তরিত করা হলো নৈশ সেবাসদনে। অফিসের কাজে মহিমাময়কে কয়েক দিনের জন্যে কলকাতার বাইরে যেতে হয়েছিল। সেবাসদনে যাওয়ার সময়ে তিনি জয়দেবের সঙ্গে যেতে পারেননি। মিসেস জয়দেব নিজেই নিয়ে গিয়েছিলেন। কলকাতায় ফিরে এসে বাড়িতে-অফিসে নানা ঝামেলা। পাড়ার একটা একটা বুড়ো হুলো বেড়াল কি কারণে কয়েকদিন আগে পাগল হয়ে গেছে, যখন তখন যাকে তাকে কামড়াচ্ছে, প্রতিবেশীদের সঙ্গে রাত জেগে পর পর কয়েক রাত সেই বেড়াল ধরার প্রয়াস। এদিকে বাসায় মেয়েটার সেকেন্ডারি পরীক্ষা। মহিমাময় কয়েকদিন এত ব্যস্ত রইলেন যে জয়দেবের কথা প্রায় খেয়ালই ছিলো না। আরো নানা ধরনের গোলমাল—গ্যাস সিলিন্ডার পাওয়া যাচ্ছে না, তা ছাড়া আগে একটা সিলিন্ডারে একমাস যেতো, এখন টেনেটুনে পনেরো দিনও যায় না। ওদিকে আগে ইলেকট্রিক বিল উঠতো মাসে বড় জোর চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা, এখন দেড়শো-দুশোয় গিয়ে ঠেকেছে।

এত সব দিক সামলিয়ে সেই সঙ্গে আনাজ, তরকারি, মাছ, দুধ, ধোবা-নাপিত সব মিটিয়ে মদ খাওয়ার পয়সা সংগ্রহ করাই কঠিন হয়ে পড়েছে। মহিমাময় চিন্তা করেন, চিকিৎসা করে জয়দেবের যদি নেশা ছুটে যায় তা হলে আমিও চিকিৎসা করে মদ খাওয়া ছাড়বো।

সুতরাং সমস্ত ব্যস্ততার মধ্যেও শুধু বন্ধুত্বের খাতিরে নয়, অনেকটা কৌতূহলবশতও জয়দেবকে এক সন্ধ্যায় দেখতে গেলেন মহিমাময়। তখন জয়দেবের সেবাসদনে বাস বারোদিন হয়েছে, আর দিন তিনেক বাকি আছে মুক্তির।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ সেবাসদনের দরজায় পৌঁছলেন মহিমাময়।

দরজার বাইরে ড্রেনের একপাশে একটা কালভার্টের উপরে সেবাসদনের বড়বাবু কুঞ্জলাল বসে রয়েছেন। তিনি অতি ঘন ঘন বিষম হেঁচকি তুলছেন। তার আশেপাশে সেবাসদনের আরো দু'চারজন কর্মচারী ইতস্তত বসে বা দাঁড়িয়ে। তারাও ক্রমাগত হেঁচকি তুলছে।

সমস্ত ব্যাপারটা দেখে কেমন খটকা লাগলো মহিমাময়ের। অবস্থাটা খুব জটিল মনে হলো তাঁর।

তিনি গেটের দিকে এগোলেন, দেখলেন সেদিনের সেই উর্দিপরা দারোয়ান গেটের হাতল ধরে কোনো রকমে বহু কষ্টে দাঁড়িয়ে আছে। এ লোকটাও ঘন ঘন হেঁচকি তুলছে। প্রত্যেকবার হেঁচকি তোলার ফাঁকে 'ওরে বাবা, মরে গেলাম, বাবারে' এই সব কাতরোক্তি করছে।

মহিমাময় ভায়ে ভয়ে অতি সন্তর্পণে সেবাসদনের ভিতরে প্রবেশ করলেন। গাড়িবারান্দায় এবং ভেতরের প্যাসেজে মিটমিটে পঁচিশ পাওয়ারের আলো জ্বলছে। সেই মৃদু আলোয় মহিমাময় দেখতে পেলেন গাড়িবারান্দার নিচে এবং উপরে দোতলায় বেশ কয়েকজন দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের মধ্যে মহিলাও রয়েছে, সেদিনের মমতাজ দেবীও রয়েছেন মনে হলো।

এখানেও সকলের মধ্যে সেই একই বৈশিষ্ট্য, সবাই ভয়াবহ হেঁচকি তুলছে। সমবেত হিক্কা ধ্বনিতে চারদিক গুঞ্জরিত হচ্ছে। ফাঁকে ফাঁকে যথারীতি কেউ কেউ বিকট সব উক্তি করছে। মহিমাময় সবচেয়ে সামনের লোকটিকে জয়দেবের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। লোকটির পরনে ডোরাকাটা স্লিপিং সুট, নিশ্চয় এখানকার রোগী। একটা বিশাল হেঁচকিকে গলাধঃকরণ করে লোকটি বললো, 'জয়দেববাবুকে নিতে এসেছেন?'

এই প্রশ্নে বিস্মিত হয়ে মহিমাময় বললেন, 'নিয়ে যাবো কেন? জয়দেব ভলো হয়ে গেছে? ওর তো এখনো তিন দিন বাকি আছে।'

আর একটি হেঁচকি তুলে লোকটি বললো, 'আরো তিন দিন? সর্বনাশ! সেবাসদন যে উঠে যাবে।'

আর কথা না বাড়িয়ে মহিমাময় আগের দিনের দেখামত কোহল সেকশনের দিকে পা বাড়ালেন। নিশ্চয়ই ওখানে জয়দেবের দেখা পাওয়া যাবে।

কোহল সেকশনে জয়দেবের দেখা পাওয়া গেলো। ছোট ঘরের মধ্যে একটা খাট। তারই একটির প্রান্তে বালিশে হেলান দিয়ে জয়দেব বসে রয়েছেন। রীতিমত গুম হয়ে। এবং আশ্চর্যের বিষয়, খাটের অন্য প্রান্তে ডাক্তার মল্লিকও বসে রয়েছেন। বড় বড় গোল চশমার কাচের নিচে তাঁর চোখ দুটো খুব বেশি গোল দেখাচ্ছে। তিনিও গুম মেরে থাকার চেষ্টা করছেন, কিন্তু পারছেন না। হেঁচকি এসে বাধা সৃষ্টি করছে।

একমাত্র ব্যতিক্রম জয়দেব। মহিমাময় ভালো করে লক্ষ্য করে দেখলেন, জয়দেব কোনো হেঁচকি তুলছেন না।

সমস্ত ব্যাপারটা অত্যন্ত বেশি গোলমেলে মনে হলো মহিমাময়ের। ঠিক কী ঘটছে, ঘটেছে, কেন ঘটেছে কিছুই বুঝতে পারছেন না। দরজার কাছে গোটা দুই বেতের চেয়ার রয়েছে, তারই একটা টেনে নিয়ে মহিমাময় জয়দেবের খাটের সামনে গেলেন। কিন্তু ডাক্তার মল্লিকের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হলো না, পর পর কয়েকটি অতিদ্রুত হেঁচকির ধাক্কায় তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং 'ও গড, ও গড' বলতে বলতে দ্রুত বারান্দার দিকে চলে গেলেন।

এখন জয়দেব আর মহিমাময়, দুই পুরনো বন্ধু. এই শহরের দুই প্রাচীন মাতাল পরস্পরের মুখোমুখি।

না, কোনো ডুয়েল বা দ্বন্দ্বযুদ্ধ নয়, জয়দেব মহিমাময়ের দিকে তাকিয়ে একবার মুচকি হাসলেন। মহিমাময়ও হাসলেন। মহিমাময় একবার মাথা ঘুরিয়ে পাশের ঘরের দিকে তাকালেন। জয়দেব বুঝতে পেরে বললেন, 'কেউ নেই। সব বাইরে গিয়ে

কোথাও হেঁচকি তুলছে।' তারপর উদার কণ্ঠে মহিমাময়কে বললেন, 'একটু মদ খাবি? জিনিসটা চোলাই কিন্তু খাঁটি চোলাই!'

খাটের নিচ থেকে দুটো কাঁচের গ্লাস আর একটা রবারের ব্লাডার হামাগুড়ি দিয়ে বার করে আনলেন জয়দেব। বন্ধুর উপহার বিনা বাক্যব্যয়ে গ্রহণ করলেন মহিমাময়। দুজনে প্রাণের আনন্দে পান শুরু করলেন।

মদ খেতে খেতে দুই বহুদিনের প্রাণের বন্ধুর মধ্যে বহু কথা হলো। হেঁচকির প্রসঙ্গও এলো। হেঁচকি ব্যাপারটা সোজা নয়। হেঁচকির জন্যে ওষুধ লাগে।

ডাক্তার মল্লিক মার্কিন দেশ পরিত্যাগ করার সময় কয়েক বোতল হেঁচকির ওষুধ নিয়ে এসেছেন। ব্যাপারটা বে-আইনি কিনা, তা নিয়ে এঁদের দুজনের কেউই চিন্তিত নন। মহিমাময়কে জয়দেব মদ খেতে খেতে যা বললেন তা চমকপ্রদ। ঘটনার বিবরণ শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন তিনি।

নেশা ছাড়ানোর ব্যাপারটা খুবই সোজা। শুধু ঐ একটু হেঁচকির ওষুধ চাই। হেঁচকি সারানো নয়, হেঁচকি করানোর ওষুধ। জিনিসটা দেখতে সাদা টুথ পাউডারের গুঁড়োর মত। ঐ গুঁড়ো সামান্য একটু কোনো কিছুর সঙ্গে মিশ্রিত করে দিলে অবিশ্রান্ত হেঁচকি উঠতে থাকবে। এই ওষুধের আবিষ্কারক নাকি ডাক্তার মল্লিক স্বয়ং। তবে সব কেমিক্যাল এদেশে মেলে না। ডাক্তার মল্লিকের বিধান হলো, যে যা নেশা করছে করুক, কোনো আপত্তির কারণ নেই। শুধু ঐ নেশার সামগ্রীর সঙ্গে, সে হুইস্কি বা হেরোইন যা হোক না কেন, তার সঙ্গে এক বিন্দু ঐ সাদা পাউডার মিশিয়ে দিতে হবে। আর গাঁজা জাতীয় ধোঁয়াটে নেশায় কলকেতে বা সিগারেটে একটু দিয়ে ধোঁয়ায় টেনে নিলেই কাজ হবে।

কাজ হবে মানে পাঁচ মিনিটের মধ্যে হেঁচকি শুরু হবে। চলবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

জয়দেব জানালেন যে এখানে এসেই তিনি খোঁজ নিয়েছিলেন পানীয়ের এবং খুব কাছেই একটি নির্ভেজাল চোলাইয়ের দোকানের খবর পান। প্রতিদিন দারোয়ানকে দিয়ে তাই দু পাঁইট আনিয়ে নেন। এবং তাতেই তাঁর একার চলে যায়।

প্রথম দিন খাওয়ার পর আর তিনি সেবাসদনের হেঁচকি-করানো পানীয় গ্রহণ করেননি। সারারাত এবং পরের দিন সারা সকাল হেঁচকি উঠেছিলো। তিনি নিশ্চিত যে পনেরো দিন কেন মাত্র এক সপ্তাহ যদি ঐ পাউডার দেয়া নেশা কেউ করে, তা হলে সারা জীবনের মত নেশা করার শখ তার কেটে যাবে।

গত এগারো দিন জয়দেব নিজে সন্ধ্যায় চোলাই খেয়েছেন আর ঐ পাউডার দেয়া পানীয় তাঁর জলের কুঁজোয় সঞ্চিত করে রেখেছেন। আজ সন্ধ্যাবেলায় ডাক্তার মল্লিক সমেত সেবাসদনের সমস্ত কর্মচারী এবং নেশার রোগীদের জয়দেব আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন সবাইকে তাঁর জন্মদিন এই কথা বলে। যারাই জয়দেবের পানীয় গ্রহণ করেছেন তাদের পরিণতি মহিমাময় চোখের সামনেই দেখতে পেয়েছেন। ঐ তো পিছনের বারান্দায় থাম ধরে দাঁড়িয়ে ডাক্তার মল্লিক নিজেই হেঁচকি তুলছেন। শুধু জয়দেব নিজে খাননি, তাই ঠিক আছেন।

মহিমাময়ের কেমন কৌতূহল হলো। মদের নেশাটা ছেড়ে দেবার তাঁর নিজের অনেকদিনের ইচ্ছে, কিন্তু কিছুতেই ছাড়তে পারছেন না। জয়দেবকে তিনি বললেন, 'ঐ পাউডার দেয়া মদ তোর আর আছে?'

জয়দেব বললেন, 'একটু থাকতে পারে কুঁজোর নিচে। তুই খাবি নাকি? খুব হেঁচকি উঠবে কিন্তু। মদ খাওয়ার সব শখ মিটে যাবে।'

মহিমাময় বললেন, 'আমি শখটা মেটাতেই চাই। এই বাজে নেশাটা ছাড়তে পারলেই বাঁচি। আর যা খরচা বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে মদের দাম।'

কুঁজোর তলা থেকে গেলাস দুয়েক পানীয় বেরোলো, পানীয়টা উৎকৃষ্ট ভালো হুইস্কিই হবে। পাউডারের গুঁড়োর তলানি বোধহয় নিচে বেশি পড়েছিলো, তাই একটু ঝাঁঝ বেশি। প্রতিফল পেতে পাঁচ মিনিট কেন দু মিনিটও লাগলো না। গগনচুম্বী সব হিক্কা উঠতে লাগলো মহিমাময়ের, অস্থির বোধ করতে লাগলেন, গা গোলাতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লেন মহিমাময়। সেবাসদন থেকে বেরোনোর মুখে দেখলেন ডাক্তার মল্লিক আর মমতাজ দেবী সিঁড়ির প্রান্তে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে যুগ্ম হিক্কা তুলছেন। সামনের গেটের উপরে দারোয়ান আর কুঞ্জলালবাবু বসে, তাঁদের হেঁচকির আন্দোলনে ভারি গেট কাঁপছে।

মহিমাময়ের অবস্থাও সুবিধের নয়। কোনো রকমে রিকশায় বড় রাস্তায় পৌঁছে, সোজা ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি। তখন হিক্কার গমক আরো বেড়েছে।

বাড়ি ফিরে গেলাসের পর গেলাস সাদা জল খেলেন। মহিমাময়ের স্ত্রী তাঁর মাথায় ব্রহ্মতালুতে জোরে জোরে চাপড় দিলেন। মহিমাময় বীভৎস সব সমস্যার কথা ভাবতে লাগলেন। কিন্তু হিক্কার গতিও তো বেড়েই চললো।

এমন সময় সামনের টেবিলে সেদিনের ডাকে আসা চিঠিপত্রগুলো মহিমাময়ের চোখে পড়লো। সবচেয়ে উপরে রয়েছে ইলেকট্রিক বিল। গত মাসে দুশো দশ টাকা হয়েছিল। এবার বিল খুলে দেখলেন উঠেছে সাতশো বারো টাকা চল্লিশ পয়সা। তবে ঐ চল্লিশ পয়সা এ মাসে দিতে হবে না। পরের মাসের হিসেবে যাবে।

সাতশো বারো টাকা বিল পেয়ে মাথায় হাত দিয়ে চেয়ারের উপরে বসে পড়লেন মহিমাময়। তারপর সম্বিৎ ফিরে পেতে বাড়ির সবাইকে বিস্মিত করে দিয়ে দৌড়ে গিয়ে সব ঘরের আলো পাখা নিবিয়ে দিলেন। স্ত্রী রান্নাঘরে হিটারে মাছের ঝোল রাঁধছিলেন, মেয়ে টিভিতে হিন্দি সিরিয়াল দেখছিলো—সব সুইচ তিনি অফ করে দিলেন। এবং তার পরেই ঘোর অন্ধকারে হঠাৎ একটা মুক্তির আনন্দ অনুভব করলেন। তিনি টের পেলেন যে তাঁর আর হিক্কা উঠছে না।

অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে টেবিলের কাছে গিয়ে ইলেকট্রিক বিলটা হাতে নিয়ে কপালে ঠেকালেন। তারপর সন্তর্পণে একটা আলো জ্বালিয়ে দেরাজের নিচের থেকে একটা ছোট রামের বোতল বার করে নির্জলা খেতে লাগলেন। এখন আর হিক্কা উঠলো না।

কালমেঘ

বঙ্গাব্দ তেরোশো ছিয়াশি।

রোববার ফাল্গুন মাস শেষ সপ্তাহ, সকাল সাড়ে দশটা।

বাইরের তিন কোনাচে ঘরে পুরনো বেতের চেয়ারে বসে পা দোলাতে দোলাতে মহিমাময় দেয়ালঘড়িটার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

এ বছর দোল পড়েছে মাসের দ্বিতীয় শনিবারে। একটা চমৎকার ছুটি বেঘোরে মারা গেল। শুধু তাই নয়, রোববারের আড্ডাটাও মারা পড়েছে। বন্ধু-বান্ধব, জানাশোনা সবাই গেছে শান্তিনিকেতনে, বসন্ত উৎসবে। কেউ কাল সকালেব আগে ফিরছে না। অথচ সুন্দর ফাল্গুন মাস। হালকা ফিকে রসুনের মত একটু একটু ঠাণ্ডার আস্তরণ এখনো দিনের গায়ে জড়ানো আছে। আর সেই সঙ্গে সেই বিখ্যাত দক্ষিণের ফুরফুরে বাতাস, এই তো কলকাতার সবচেয়ে ভাল সময়।

এই সময়ে কেউ কলকাতা ছেড়ে বাইরে যায়! তাও আবার এই বুড়ো বয়সে শান্তিনিকেতনের বসন্ত মেলায়! মনে মনে তিনবার বন্ধুদের ধিক্কার দিলেন মহিমাময়।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জিবটা কেমন যেন খর খর করছে, গলা থেকে তালু পর্যন্ত মুখটা শুকিয়ে যাচ্ছে। বাড়ির মধ্য থেকে মহিমাময়ের স্ত্রী ভেতরের দরজার পরদা তুলে স্বামীকে একা বসে ঘন ঘন পা দোলাতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এক পেয়ালা চা খাবে নাকি? তাড়াতাড়ি বল, উনুনে জল বসাচ্ছি!'

চায়ের কথাটা শুনে মহিমাময়ের মাথাটা বেশ গেরম হয়ে গেল। বেশি বাক্যবিনিময়ে না গিয়ে তিনি শুধু সংক্ষিপ্ত ও সুগম্ভীর জবাব, দিলেন 'না'।

নিরাসক্তের মত আর একবার দেয়ালঘড়ির দিকে তাকালেন মহিমাময়। এগারটা বাজতে চলল। বাইরে নতুন এক টাকার কয়েনের মত ঝকঝকে রোদ, দূরে ত্রিকোণ পার্কে না কি কোন বাড়িতে একটা পোষা কোকিল ভোর থেকে ডাকছে তো ডাকছেই। নবীন বসন্তের মনোরম উষ্ণতায় চারদিক মেতে উঠেছে। এইরকম সুন্দর ছুটির দিনে

কোন ভদ্রলোক দুপুরবেলায় বাড়িতে বসে চা খায়! কোথাও গাছের ছায়ায় ফুরফুরে বাতাসে বসে বিয়ারের সোনালী তরলতায় চুমুক দিতে দিতে আজ হল নববসন্তকে অভ্যর্থনা জানানোর দিন।

পাজামার উপরে গায়ে একটা পাঞ্জাবি চাপিয়ে 'ধুত্তোরি' বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন মহিমাময়। কিন্তু একটা একা আর কতদূর কোথায় যাবেন? আর সবচেয়ে বড় কথা, রাস্তাঘাট এখনও তেমন নিরাপদ হয়নি। আজ কয়েক বছর হল বড়বাজারওয়ালারা উঠে এসেছে দক্ষিণ কলকাতার বহুতল বাড়িগুলিতে। সেখানে হিন্দুস্থানী আর রাজস্থানীদের 'হোলি হো, হোলি হ্যায়', এখনও পুরোদমে চলেছে। কোথায় কোন্ অলিন্দ কি গবাক্ষ থেকে চপলা তরুণী রাজপথের অসহায় পদাতিকের গায়ে ফাগ কিংবা ইনডেলিবল কুমকুম ছুঁড়ে মারবে তা বলা যায় না।

ইতস্তত গলির মোড়ের দিকে এগোতে এগোতে সহসা মহিমাময় দেখলেন খুব চেনা একটা লোক তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বড় রাস্তা থেকে এগিয়ে আসছে।

আগন্তুকের চুলে-মুখে নানারঙের আবির, গায়ের হাওয়াই শার্ট আর ফুল প্যান্টও বহুবর্ণরঞ্জিত, উজ্জ্বল রঙে এমন ঢাকা পড়ে গেছে অবয়ব ও গঠন যে বেশ কাছে না আসা পর্যন্ত মহিমাময় বুঝতে পারলেন না—তাঁর বন্ধু জয়দেব আসছেন।

জয়দেবকে দেখে মহিমাময় যুগপৎ খুশি ও বিস্মিত হলেন। তাহলে যে শুনেছিলেন জয়দেব শান্তিনিকেতনে গেছে, গিয়েছিল হয়ত, আজই ফিরছে!

কাছে আসতে জয়দেবকে মহিমাময় জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুই শুনলাম শান্তিনিকেতনে গিয়েছিস?'

জয়দেব বললেন, 'কি করে যাব? পরশুদিন রাত থেকে আমি কেজরিওয়ালের বাড়িতে আটকে আছি!'

মহিমাময় কেজরিওয়ালকে চেনেন না, জয়দেবের সমস্ত ঘনিষ্ঠ ব্যক্তির খবর রাখা কারও সাধ্য নয়। সুতরাং মহিমাময় প্রশ্ন করলেন, 'কেজরিওয়াল কে?'

তিনরঙের আবির মাখা ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে জয়দেব বললেন, 'তুই চিনবি না। বড় ব্যবসা করে, বলপেনের রিফিল বানানোর যন্ত্র তৈরির মেশিনের পাইকারি কারবার করে। তাছাড়া...'

'ঠিক আছে, যথেষ্ট হয়েছে, আর লাগবে না' কেজরিওয়ালের অন্য ব্যবসা সম্পর্কে উৎসাহ না দেখিয়ে জয়দেবকে মধ্যপথে থামিয়ে দিয়ে মহিমাময় বললেন, 'তা এরকম রং খেললি কোথায়? কেজরিওয়ালের বাড়িতে?'

জয়দেব করুণ কণ্ঠে বললেন, 'আরে না। ঐ কেজরিওয়ালদের ওখানে কাল দুপুরে গান-বাজনা, খাওয়াদাওয়া হল। অল্পস্বল্প আবির ছিল, কিন্তু আসল গোলমালটা হল রাতে।'

মহিমাময় বললেন, 'রাতে কি হল?'

জয়দেব লজ্জিত ভঙ্গিতে বললেন, 'সে মহা বেকায়দা। সন্ধ্যাবেলা আমি ওদের

বাড়িতে বাইরের ঘরে ঘুমোচ্ছি, কেজরিওয়ালার আত্মীয়স্বজন কাদের বাড়িতে যেন গেছে। আমি ঘুম বেঙে উঠে দেখি ওদের আউট হাউসে চাকর ড্রাইভারেরা বড় বড় পিতলের লোটায় কি সব খাচ্ছে। আমি চোখ কচলাতে কচলাতে সেখানে গিয়ে সবলাম। চমৎকার ভাঙের সরবত, সবাই খুশি হয়ে আমাকে খাওয়াতে লাগল তারপরে অল্প অল্প মনে পড়ছে-হৈ—হুল্লোড়, নাচগান, রঙ। একটা মোটামতন টিকি মাথায় লোক আমাকে কাঁধে নিয়ে অনেকক্ষণ বেরিলিকা বাজারমে...' গাইতে গাইতে খুব নাচল। তারপর ভাল মনে পড়ছে না। এই আধ ঘণ্টা আগে ঘুম ভেঙে দেখি দারোয়ানদের ঘরের পাশে একটা দড়ির খাটিয়ায় ডুমুর গাছের নিচে শুয়ে আছি, গায়ে-মাথায়, জামা-কাপড়ে রং মাখা।'

আর বেশি বলার দরকার ছিল না। মহিমাময় ব্যাপারটা অনেকখানিই বুঝলেন। এবার প্রশ্ন করলেন, 'তা এরকম ভূতের মত বেশে কোথায় যাচ্ছিস?'

জয়দেব বললেন, 'কেন, তোর ওখানে? চল্, একটু বসা যাক!'

মহিমাময় একটু ভেবে বললেন, 'কিন্তু তোর কি ভাঙের নেশা এখনও কেটেছে? চোখ তো জবাফুলের মত লাল দেখছি।'

জয়দেব বললেন, 'আরে ধ্যুৎ, ভাঙে আবার নেশা হয় নাকি! চোখ লাল হয়েছে বেশি ঘুমিয়ে।' তারপর একটু থেমে নিয়ে বললেন, 'বাড়িতে কিছু আছে?'

মহিমাময় বললেন, 'বাড়িতে একটু আধটু তলানি পড়ে আছে। সেসবে হবে না। আর আজ বিয়ার খাওয়ার দিন। আবহাওয়া দেখছিস না, বসন্তকালের দুপুরে বিয়ার ছাড়া খাওয়া যায়?'

জয়দেব গম্ভীর হয়ে বললেন, 'মহিমা, তোর বয়েস কত হল?'

প্রশ্নের গতিক দেখে একটু হকচকিয়ে গিয়ে মহিমাময় বললেন, 'কেন, এই অঘ্রাণে বেয়াল্লিশ পূর্ণ হল।'

জয়দেব বললেন, 'তা হলে তোর থেকে আমি আড়াই বছরের বড়, আমার বয়েস হল সাড়ে চুয়াল্লিশ।' তারপর একটু থেমে থেকে বেশ বড় রকমের একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে জয়দেব এগিয়ে এসে মহিমাময়ের কাঁধে হাত রাখলেন, অবশেষে বললেন, 'আমাদের কি আর বয়েস আছে রে বিয়ার খাওয়ার? আমরা তো বুড়ো হয়ে গেছি। বিয়ার খাবে তো বাচ্চা ছেলেরা।'

এরকম আশ্চর্য কথা শুনে মহিমাময় কিছু বুঝতে না পেরে বললেন, 'বাচ্চা ছেলেরা খাবে মায়ের বুকের দুধ, ফিডিং বোতলের দুধ, নিদেনপক্ষে গরুর দুধ গেলাসে বা কাপে করে। তারা বিয়ার খাবে কেন?'

জয়দেব মধুর হেসে বললেন, 'আরে না না, অত বাচ্চা নয়। অন্নপ্রাশনের কুড়ি বছর পর থেকে চল্লিশ বছর পর্যন্ত গাঁজা, ভাং, চুরুট, দোক্তা, বিয়ার, তাড়ি যা হোক একটা লোক খাক, খেয়ে যাক, কিছু আসে যায় না। কিন্তু যেই মানে মানে চল্লিশ পার হয়ে গেলি, তখন তোকে মানে মানে ভেবেচিন্তে চলতে হবে। এমন কি সর্ষেবাটা সজনেডাঁটা চিবানোর আগে ভেবে নিতে হবে কটা ডাঁটা চিবনো ঠিক হবে।'

জয়দেবের এরকম বয়সোচিত বক্তৃতা শুনে মহিমাময় অধৈর্য হয়ে পড়লেন, জয়দেবকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'স্টপ জয়দেব! অলরাইট, বিয়ার নয়, একটু আগে বাড়িতে দেখে এসেছি বৌ চা করছে। চল্ দুজনে গিয়ে দু পেয়ালা চা খাই।' এরপর থেমে গিয়ে মহিমাময় দুটি দন্তপাটি কিড়কিড় করে স্বগতোক্তি করলেন, 'এমন সুন্দর দিনটা জলে গেল!' এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর খেয়াল হল, 'জলে নয়, বিনা জলে গেল!'

ততক্ষণে জয়দেব মহিমাময়কে স্বগতোক্তি করা থেকে নিবৃত্ত করেছেন, তিনি উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'এই ভরদুপুরে চা খাবে কোন শালা? আমার সঙ্গে চল, এক বোতল জিন কিনে আনি।'

মহিমাময় এই অবস্থায়ও রফা করার চেষ্টা করলেন, 'জিন খাওয়া যাবে না। বিটারস ফুরিয়ে গেছে।'

জয়দেব এখন রীতিমত উত্তেজিত, বললেন, 'তুই একেবারে সাহেব হয়ে গেছিস মহিমা, বিটারস দিয়ে কী হবে? আর বিটারসের কী দাম জানিস?'

বলা বাহুল্য, এত তর্কাতর্কির মধ্যেও জয়দেব এবং মহিমাময় ইতিমধ্যে বড় রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নিজেদের অজান্তে গড়িয়াহাটের চৌমাথায় মদের দোকানের সামনে এসে গেছেন। এবার জয়দেব নির্দেশ দিলেন, 'মহিমা, তুই এক কাজ কর, সামনের ওষুধের দোকান থেকে তুই এক বোতল কালমেঘ নিয়ে আয়। ততক্ষণে আমি এখান থেকে জিনটা কিনে ফেলছি।'

কিছুই অনুধাবন করতে না পেরে মহিমাময় সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে ভিক্টোরিয়া ফার্মেসি থেকে সাড়ে সাত টাকা দিয়ে এক শিশি কালমেঘ কিনে আনলেন, ততক্ষণে জয়দেব জিনের বোতল কিনে ফুটপাথে নেমে এসেছেন।

দুজনে মিলে বাড়িমুখো হাঁটতে হাঁটতে মহিমাময় জয়দেবের কাছে জানতে চাইলেন, 'কালমেঘ দিয়ে কী হবে? তোর কি লিভার খারাপ হয়েছে?' তারপর বেশ ভেবে নিয়ে বললেন, 'লিভার খারাপ হলে মদ খাবি কেন? শুধু শুধু কালমেঘ খেয়ে কি সুরাহা হবে?'

জয়দেব এবার চটে গেলেন, 'লিভার খারাপ হবে কেন আমার? আমার লিভার পাথরের মত শক্ত। কালমেঘ লিভারের জন্যে নয়, ওটা নেওয়া হল জিন খাওয়ার জন্যে।'

মহিমাময় বেশ অবাক হলেন, 'এই তেতোর তেতো কালমেঘ দিয়ে জিন! এর থেকে কুইনিন মিক্সচার খাওয়া ভাল।'

এতক্ষণে ও'রা দুজনে মহিমাময়ের বাড়ির দরজায় পৌঁছে গেছেন। ঘরে ঢুকে মহিমাময় তাড়াতাড়ি বাড়ির মধ্যে গিয়ে এক বোতল ঠাণ্ডা জল আর দুটো গেলাস নিয়ে এলেন।

এবার ঢালাঢালির পালা জয়দেবের। তিনি জিনের বোতলটা খুলে দু গেলাসে দু আঙুল পরিমাণ নিয়ে তার মধ্যে জল মেশালেন, তারপর সত্যি সত্যি ঐ কালমেঘের শিশিটা খুলে দু গেলাসে দু ফোঁটা ঢেলে দিলেন। তারপর এক গেলাস মহিমাময়ের

দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'নে, খেয়ে দ্যাখ, মধুর মত লাগবে।'

'মধুর মত কালমেঘ? তুই কি একেবারে পাগল হয়ে গেলি জয়দেব? কাল রাতে কয় লোটা ভাং খেয়েছিস বল্ তো?' হাতে গেলাস ধরে মহিমাময় জিজ্ঞাসা করলেন।

পরম আয়েস ও তৃপ্তির সঙ্গে একটা লম্বা চুমুকে গেলাসটা প্রায় অর্ধেক ফাঁক করে দিয়ে জয়দেব বললেন, 'দ্যাখ্ মহিমা, কালমেঘ হল দিশি বিটারস। বিলিতি বিটারসের চেয়ে ডবল ভাল। আর বিলিতি বিটারসও তেতো একটা গাছের রস। মদের মধ্যে দু ফোঁটা দিলেই এর স্বাদ বদলিয়ে যায়। আমার বড় জামাইবাবু আমেরিকায় এক ডজন সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল। যাদের যাদের দিয়েছিল, তারা এখনও চিঠি লেখে, খোঁজ নেয়।'

এবার মহিমাময় সন্তর্পণে তাঁর হাতে ধরা গেলাসটা জিবে ছোঁয়ালেন। সত্যিই তো, সামান্য কালমেঘের যাদুর পরশে ঝাঁঝাল ড্রাই জিনে অমৃতের স্বাদ এসেছে।

এ ঘটনা দীর্ঘ চার বছর আগেকার।

তারপর কলকাতার রাজপথে অনেক জনস্রোত বয়ে গেছে। সে জনস্রোতে আজকাল কদাচিৎ মহিমাময়ের সঙ্গে জয়দেবের দেখা হয়। স্রোতের স্বতন্ত্র পথে নিজ নিজ ধান্দায় দুজনে দু-ধারায় প্রবাহিত হন।

শহরটা তেমন বড় নয়। তাই তবুও কখনও কখনও এখানে সেখানে দেখা হয়ে যায়। জয়দেবকে দেখে খুশি হন মহিমাময়। মহিমাময়কে দেখে খুশি হন জয়দেব।

জয়দেবকে মহিমাময় আমন্ত্রণ জানান, বলেন, 'আয় জয়দেব, বাসায় যাই। সেই কালমেঘ এখনও শিশিতে অনেকটা রয়েছে। চল, বাসায় গিয়ে একটু জিন খাই।'

জয়দেব আপত্তি করেন, 'ধ্যুৎ জিন পুরুষমানুষে খায় নাকি, ও তো মেয়েলী পানীয়। আর তোর ঐ কালমেঘ, ওয়াক, থুঃ! কুইনিন জলে গুলে খাবি, নিমপাতা চিবিয়ে খাবি, সজনেডাঁটা উচ্ছে কাঁচা খাবি। অনেক স্বাদ পাবি।'

ক্ষুণ্ণ মনে মহিমাময় বাড়ি চলে আসেন। তিন কোনাচে বাইরের ঘরের পুরনো বেতের চেয়ারে বসে পা দোলাতে সামনের দেয়ালে তাকের উপরে চোখ রাখেন। ওখানে কালমেঘের শিশিটা রয়েছে। এখনও ঐ শিশিটার মধ্যে প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কালমেঘ আছে। অন্তত পাঁচ টাকার জিনিস। এই দুর্দিনে জিনিসটা নষ্ট করতে মন চায় না।

কিন্তু শিশিটা কিছুতেই ফুরোচ্ছে না। গেলাসে এক-দুই ফোঁটা, এক বোতলে পনের পেগ, পনের গেলাস। পনের গেলাসে পনের থেকে তিরিশ ফোঁটা।

গত চার বছরে কত গেলাসের পর গেলাস, বোতলের পর বোতল জিন শেষ হয়ে গেল, কিন্তু ঐ কালমেঘের শিশি সদ্য গলা পর্যন্ত নেমেছে।

কালমেঘের জন্যে জিন, নাকি জিনের জন্যে কালমেঘ? একটা কঠিন ধাঁধায় পড়ে যান মহিমাময়। তারপর কাগজ-পেন্সিল টেনে নিয়ে সমান কঠিন একটা অঙ্ক কষতে থাকেন।

সপ্তাহে দু বোতল জিন, একশো ষাট টাকা বছরে আট সাড়ে আট হাজার টাকা।

এই চার বছরে সে অন্তত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা হবে।

এখনো বাকি যা কালমেঘ আছে তাতে আরো হাজার সত্তর টাকার জিন খেয়ে যেতে হবে। আট আট বচ্ছর—মোটামাট এক লাখ টাকার ধাক্কা!

প্রৌঢ় মহিমাময় করুণ চোখে কালমেঘের শিশিটার দিকে তাকিয়ে থাকেন। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ভাবেন, একটা ছোট একতলা বাড়ি হয়ে যেত। ভাবতে ভাবতে পাঞ্জাবি গলিয়ে পথে বেরিয়ে পড়েন আরেক বোতল জিন আনতে।

হাস্যকর

ডাক্তারবাবু তাঁকে সিগারেট খেতে মানা করেছেন। বলেছেন, 'যদি চান, সন্ধের দিকে মদ একটু-আধটু খেতে পারেন, অল্প মদ শরীরের পক্ষে খারাপ নয়, বরং স্বাস্থ্যকর। কিন্তু সিগারেট নৈব নৈব চ।'

অর্ণব দত্ত বলেছিলেন, 'কিন্তু সিগারেট ঠোঁটে না থাকলে এক লাইন লিখতে পারি না।'

ডাক্তারবাবু, তিনি কোনও সামান্য ডাক্তার নন, একশো টাকা ভিজিট, ডাক্তার সাহেব বলাই উচিত, তিনি বললেন, 'অন্য কোনও উপায় দেখুন! একেকটা সিগারেট গড়ে তিন ঘণ্টা করে পরমায়ু কমিয়ে দেয়।'

অর্ণব দত্ত একজন খ্যাতনামা লেখক। অবশ্য নিতান্ত এইটুকু বললে তাঁর অবমাননা করা হয়। এখনকার বাংলা ভাষার পাঠক-পাঠিকারা তাঁকে জানেন, হাসাহাসির গল্পে তাঁর জুড়ি নেই।

বছরে দু-টারটে বই বেরয় অর্ণব দত্তের। সেই বইগুলোও চমৎকার বিক্রি হয়। সম্প্রতি একটি বই অর্ণববাবু উক্ত ডাক্তারসাহেবকেও উৎসর্গ করেছেন। তাঁর আশা ছিল হয়তো ডাক্তারবাবু এর পরে আর ভিজিট নেবেন না। কিন্তু তা হয়নি, ডাক্তারবাবু এর পরেও অত্যন্ত নির্বিকারভাবে ভিজিটের টাকা নিয়েছেন।

অবশ্য উৎসর্গের ব্যাপারটাও খুব সুবিধের নয়। বই উৎসর্গ করতে লেখকের কোনও পরিশ্রম বা অর্থ ব্যয় করতে হয় না। একটু ভেবে-চিন্তে চেনাজানা বা দামি কোনও লোকের নামে এই উৎসর্গ করলেই হল। অথচ উৎসর্গ করলে উৎসর্গপত্র ও তার পরের সাদা পৃষ্ঠাটি সমেত বইয়ের দুই পৃষ্ঠা বেড়ে যায়। যার জন্যে বইয়ের দাম আজকের বাজারে পঞ্চাশ ষাট পয়সা বেশি হয়। আনুপাতিক হারে লেখকের রয়ালটিও বাড়ে।

তাছাড়া কারও নামে খ্যাতনামা লেখক বই উৎসর্গ করলে সেই ব্যক্তি যদি অনুগত বা প্রিয়জন কেউ হন, তিনি কৃতার্থ বোধ করেন। আবার ইচ্ছে হলে, নামীদামি লোকদেরও বই উৎসর্গ করে খুশি করা যায়।

অর্ণব দত্তের মতো জনপ্রিয় লেখকের একটা উৎসর্গীকৃত বই পেয়ে ডাক্তারসাহেবও নিশ্চয় খুব খুশি হয়েছিলেন, কিন্তু তার কোনও বহিঃপ্রকাশ ঘটেনি, তাঁর ভিজিট তিনি যথারীতিই নিয়েছেন।

সে যা হোক, অর্ণব দত্তের শরীরের আজ বেশ কিছুদিন হল বেহাল অবস্থা চলছে। ডাক্তারের নিষেধ অমান্য করা তাঁর পক্ষে উচিত নয়।

তবে এ বয়সে মদ ধরা তাঁর পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়। জিনিসটা পার্টি-টার্টিতে দুয়েকবার খেয়ে দেখেছেন অর্ণববাবু, তাঁর মোটেই সহ্য হয় না। অনেক সময় বমি পর্যন্ত করে ফেলেছেন। মাথা ঘুরছে, পা টলেছে, পরের দিন সকালে কপাল টনটন করেছে। তাঁর তালেবর বন্ধুরা অর্ণববাবুকে বলেছেন, 'এসব কিছু নয়। ধীরে ধীরে নিয়মিত খেয়ে যাও সয়ে যাবে। সকলে খেতে পারে, আর তুমি পারবে না।'

কিন্তু অর্ণববাবুর মদ্যপানে রুচি নেই। ডাক্তার সাহেবের নির্দেশের পরে একদিন এক বোতল মদ কিনে সন্ধ্যাবেলা লেখার টেবিলে নিয়ে বসেছিলেন। কিন্তু অল্প একটু পান করার পরে লেখা তো এগোলই না, বরং সবকিছু ঘুলিয়ে গেল।

তখন আরও একটু খেলেন। এবার কিন্তু ফ্লো এসে গেল। তাড়াতাড়ি কাগজকলমে টেনে নিয়ে তরতর করে লিখে গেলেন।

পরের দিন সকালবেলা আগের রাত্রে লেখা পাণ্ডুলিপি পড়তে গিয়ে তাঁর চোখ কপালে উঠল। এসব কি আবোল তাবোল লিখেছেন। গল্পের নায়ক শেয়ালদা স্টেশন থেকে পুরী এক্সপ্রেসে চড়ে আসানসোল চলেছে। গল্পের শুরুতে নায়কের স্ত্রীর নাম মালতী, আসানসোল বাড়িতে তাঁর স্ত্রীর নাম সরমা, পরে পুরী থেকে নায়ক স্ত্রীকে চিঠি লিখেছেন প্রিয়তমা অমলিনা বলে। অবশ্য নায়কের নামও ধাপে ধাপে পরিবর্তিত হয়েছে, প্রথমে পুরন্দর, তারপরে পুণ্ডরীকাক্ষ অবশেষে পৌণ্ড্রবর্ধন।

নিজের লেখা রচনা পড়ে অর্ণব দত্ত একেবারে থ মেরে গেলেন। টেবিলের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, দেখলেন, প্রায় আধবোতল মদ খেয়েছেন কালরাতে। পরে রাতে বিছানা থেকে উঠে বমিও প্রচুর করেছেন। এই সকালবেলায় বাথরুম দিয়ে টক গন্ধ বেরোচ্ছে। জমাদার ডাকিয়ে পরিষ্কার করাতে হবে।

কিন্তু এই গল্পটা কাল রাতেই শেষ করার কথা ছিল। পুরনো দেয়ালঘড়ির দিকে

তাকিয়ে অর্ণব দত্ত দেখলেন সাড়ে দশটা বাজে। অতিরিক্ত মদ্যপান করে এবং শেষ রাত পর্যন্ত ঘর-বাথরুম করে অর্ণব দত্ত ঘুম থেকে উঠতে বেলা করে ফেলেছেন, সাড়ে ন'টা বেজে গেছে।

এখন আর লেখার সময় নেই। আরেকবার করুণ চোখে গতরাতের হাবিজাবি লেখাটার দিকে তাকালেন অর্ণব দত্ত। মদ খেয়ে, কঠোর পরিশ্রম করে, হেঁচকি তুলতে তুলতে গল্পটা লিখেছিলেন অর্ণববাবু। খুব বেশি লেখা এতটা মেহনত করে তিনি লেখেননি। এখন লেখাটা সামনের কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

এই রকম ভাবতে ভাবতে নিজের মনে একটু হাসলেন অর্ণববাবু। জ্ঞানী, গুণী লোকেরা, সমালোচকরা অনেকেই অনেক সময় বলেন অর্ণব দত্তের কোনও লেখাই পড়বার যোগ্য নয়। বাজে কাজের ঝুড়িতে ফেলে দেওয়া উচিত, আজ অবশেষে তিনি নিজেই তাঁর এত কষ্টের লেখা বাজে কাগজে ফেলে দিচ্ছেন।

ফেলে না দিয়ে উপায় নেই। কিন্তু এখন কী করা যাবে? রামলগন তেওয়ারির এগারোটার সময় আসার কথা, পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে অর্ণববাবু জানেন যে কাঁটায় কাঁটায় এগারোটাতেই রামলগন এসে যাবে।

কাল রাতে রামলগনের গল্পটাই লেখার। কথা ছিল অর্ণববাবুর। এর জন্যে ইতিমধ্যে কিছু আগামও তিনি নিয়েছেন।

রামলগন ভাল টাকা দেন। তার চেয়ে বেশি টাকা আজকাল আর কেউ দেন না। রামলগন তেওয়ারির কাগজের নাম নবযুগ'। কলকাতা থেকে একসঙ্গে পাঁচটি ভাষায় প্রকাশিত হয়, বাংলা, হিন্দি ওড়িয়া, অহমিয়া এবং নেপালি—পূর্বাঞ্চলের সব কয়টি ভাষায়।

প্রত্যেক ভাষায় একজন করে আলাদা সম্পাদক আছে। কিন্তু সে নামমাত্র। রামলগনই সব। তিনিই প্রতিষ্ঠাতা তাঁর নিজস্ব কোম্পানি 'রামলগন অ্যান্ড সন্স'ই কাগজগুলির মালিক।

রামলগনের অবশ্য কোনও ছেলে নেই। তিনি এখন বিয়েই করেননি। কিন্তু ভবিষ্যতে বিয়ে করলে, তখন যদি ছেলে হয়, তাদের মালিকানার ক্ষেত্রে তাঁর মৃত্যুর পরে যদি কোনও বাধা হয় তাই আগে থেকেই ব্যাপারটা তিনি কোম্পানির নামকরণের মধ্যে দিয়ে সেরে রেখেছেন।

'রামলগন অ্যান্ড সন্স' তথা রামলগন তেওয়ারির আর কোনও ব্যবসা নেই, একমাত্র পত্রিকা প্রকাশ করা ছাড়া। মাসে মাসে পাঁচটি ভাষায় মোটমাট বেশ কয়েক লক্ষ পত্রিকা ছাপা হয় এবং দ্রুত নিঃশেষিত হয়ে যায়। পাঠককুলে 'নবযুগ' পত্রিকার খুব চাহিদা।

সব কাগজে একই লেখা ছাপা হয়। হিন্দি ধারাবাহিক উপন্যাস, ওড়িয়া রম্যরচনা, বাংলা গল্প ইত্যাদি একেকটি ভাষায় অনুবাদ হয়ে একেকটি পত্রিকায়। যোগ্য অনুবাদকদের ভাল মাইনে দিয়ে রেখেছেন রামলগন। সেই অনুবাদকদের নামই যাঁর যাঁর ভাষায় পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে ছাপা হয়।

সাহিত্য ছাড়াও সিনেমা, থিয়েটার, যাত্রা, দূরদর্শন আছে, আছে খেলাধুলা, ফুটবল, ক্রিকেট। এসবের ওপর রামলগনের প্রবল উৎসাহ, অধিকাংশ মূল রচনাই হিন্দিতে তৈরি করেন তিনি। নানা খবরের কাগজ থেকে টুকে।

তবে 'নবযুগ' পত্রিকা মূলত হালকা চরিত্রের কাগজ। রম্যরচনা, হাসির গল্প, কেচ্ছা-কেলেঙ্কারির কাহিনী এই সবের জন্যে পাবলিক 'নবযুগ' পড়ে, কাড়াকাড়ি করে পড়ে।

কিন্তু রাজনীতির লাইনে রামলগন বা তাঁর কাগজ নবযুগ নেই। রাজনীতি থেকে শতহাত দূরে থাকার চেষ্টা করে 'নবযুগ'। তবু আজকালকার বাজারে রাজনীতির মধ্যেও এতসব হাসাহাসি মজার ব্যাপার এসে গেছে যে একটা তরল পত্রিকার পক্ষে সব সময় রাজনীতি বর্জন করে দূরে থাকা সম্ভব হয় না।

এই গল্পে রামলগন তেওয়ারি এবং তাঁর প্রবর্তিত জনপ্রিয় মাসিক পত্রিকা 'নবযুগ' সম্পর্কে বোধহয় আর কিছু বলার প্রয়োজন নেই।

এবার আমরা ফিরে যাব শ্রীযুক্ত অর্ণব দত্তের শয়নকক্ষে। বেলা প্রায় এগারোটা বাজে। একটু পরেই রামলগন গল্প নিতে আসবেন।

অর্ণব দত্ত থাকেন উত্তর-পূর্ব কলকাতার প্রত্যন্ত অঞ্চলে লেকটাউনের কাছাকাছি। নিজেই বাড়ি করেছেন। দোতলা করার ইচ্ছে আছে, সেই ভাবেই প্ল্যান পাস করিয়েছেন, কিন্তু এখনও দোতলা করে উঠতে পারেননি। দোতলায় সিঁড়ির মুখে একটা বড়সড় চিলেকোঠা মতন ঘর করেছেন, সেটাই অর্ণববাবুর আস্তানা, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের হাসাহাসির গল্পের পীঠস্থান।

এই চিলেকোঠা ঘরই অর্ণববাবুর শয়নকক্ষ, ঘরের একপাশে দক্ষিণ দিকের জানালার পাশে একটি মাঝারি সাইজের খাট আছে। ঘরের অন্যপাশে উত্তর-পূর্ব কোণে দেয়াল ঘেঁষে লেখার টেবিল, তার দু'দিকে দুটো চেয়ার। একটায় বসে অর্ণববাবু লেখাপড়া করেন, অন্যটায় বাইরের কেউ এলে বসে। টেবিলে লেখার প্যাড, কালিকলম। বইয়ের মধ্যে রয়েছে বাংলা ইংরেজি অভিধান, সঞ্চয়িতা আর কয়েকটি বিলিতি জোকবুক। বইপত্র এঘরে বিশেষ নেই। সবই একতলায় বইয়ের ঘরে আলমারিতে, কিছু অতি প্রয়োজনীয় এবং সদ্য উপহার পাওয়া তৎসহ নিজের সদ্যপ্রকাশিত বই দোতলায় উঠবার সিঁড়ির বাঁকে একটা ছোট সেলফে রয়েছে।

অর্ণববাবুর তিন ভাই নীচতলায় সপরিবারে থাকেন। ভাইয়েরা বিশেষ কোনও উপার্জন করেন না। তাঁদের সংসার বলতে গেলে অর্ণববাবুই প্রতিপালন করেন। তাঁর বিনিময়ে এঁরা তাঁর দেখাশোনা করেন। খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করেন। অসুখ হলে ডাক্তার ডেকে আনেন। তাঁর লেখার সময়ে টেলিফোন এলে বলেন, 'বাথরুমে আছেন।'

অনেকের ধারণা অর্ণব দত্ত চিরকুমার, কোনও কালে দার পরিগ্রহ করেননি। কথাটা ঠিক নয়।

এখন অর্ণববাবুর বয়স প্রায় পঞ্চাশ। পঁচিশ বছর আগে একটি চলনসই সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। অর্ণব দত্ত তখনই বেশ খ্যাতনামা, নবোদিত গল্পকার। আর সেই মহিলা, যাঁর ডাক নাম ছিল মালতী, ভাল নাম ছিল সরমা আর যিনি পদ্য লিখতেন 'শ্রীমতী অমলিনা' এই ছদ্মনামে, তখন উদয়ীমতী কবি।

আজ এই ঘন বর্ষার সকালবেলা আদিগন্ত হ্যাংওভার মাথায় এবং একটি বাতিল পাণ্ডুলিপি চোখের সামনে নিয়ে ছিন্নবিচ্ছিন্ন স্মৃতিচর্চা করছিলেন অর্ণব দত্ত।

সামনের লেখার টেবিলের গতকাল রাতের আধবোতল মদ নির্বিকার পড়ে আছে, অর্ণববাবুর যত রাগ গিয়ে পড়ছে ডাক্তারসাহেবের ওপর। এ কি রকম ডাক্তার, রোগীকে মদ খাওয়ার তাল দেয়। মেডিকাল কাউন্সিল কিংবা কনজিউমারস কোর্টে গিয়ে ডাক্তারের ভিটেতে ঘুঘু চরিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর খেয়াল হয় ডাক্তার সাহেব তো লিখিতভাবে মদ খাওয়ার পরামর্শ দেননি, শুধু মুখের কথা ধোপে টিকবে না। তখন মানহানির মামলায় অর্ণব নিজেই জেলে যাবেন।

হ্যাং ওভারের ব্যাপারটা হ্যাং পার্লামেন্টের মতই গোলমেলে। পোড় খাওয়া মাতালেরা হ্যাং ওভারটা মোটামুটি ম্যানেজ করে নেন কিন্তু অর্ণব দত্তের এটা নতুন অভিজ্ঞতা, তিনি ক্রমাগত দোল খেতে লাগলেন, 'ডাক্তার সাহেব জেলে যাচ্ছেন,' 'আমি জেলে যাচ্ছি'।

এরই পাশাপাশি একটা স্মৃতিচারণ কাজ করছিল অর্ণববাবুর মনে। এসব কথা ভুলেই গিয়েছিলেন তিনি, সেই পঁচিশ বছর আগের কথা।

গতকাল রাতে মদ খেয়ে গল্প লিখতে লিখতে কাহিনীর প্রধান স্ত্রী চরিত্রের যে তিনটি নামকরণ তিনি করেছেন সেটা কোনও কাল্পনিক ব্যাপার নয়, পুরো ব্যাপারটা ঘটেছে অবচেতন মনের দৌলতে। অর্ণববাবুর সেই উদয়মতী কবিপত্নীর যে যে নাম ছিল সেগুলি ওই স্ত্রী চরিত্রে আরোপিত হয়েছে।

বিয়ের পরে মাস ছয়েক সুখে, তারপরে বছরখানেক সুখ-দুঃখে কেটেছিল অর্ণববাবুর। তবে বিবাহিত জীবনের দুর্ভোগ তার পরে আর খুব বেশি সইতে হয়নি তাঁকে। শ্রীমতী অমলিনা পৌনে দু'বছরের মাথায় কেটে পড়েছিলেন।

অর্ণববাবুর সেই প্রথম যুগের একটা ছোটগল্প নিয়ে তখন সিনেমা করবেন ঠিক করেছিলেন এক পরিচালক। সেই পরিচালকের উপদেষ্টা তথা অভিভাবক ছিলেন নেলোদা নামে এক ব্যক্তি। খদ্দরের পাজামা-পাঞ্জাবি, পকেটে নস্যির কৌটো, মুখময় বসন্তের দাগ। সব সময়ে হাসি-হাসি ভাব, ডাইনে-বাঁয়ে সত্যি-মিথ্যে বলেন। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে সবাইকে কথা দেন। একদা টালিগঞ্জের ভরাডুবি হয়েছিল যাদের জন্যে—নেলোদা তাঁর অন্যতম।

তা এই নেলোদার সঙ্গে একদিন কেটে পড়লেন শ্রীমতী অমলিনা। রাজ কাপুর না দেবানন্দ কে যেন নতুন নায়িকা খুঁজছেন ; কবিত্বের বদলে রূপালি পর্দার মায়াজালে আকৃষ্ট হয়ে ঘর ছাড়লেন অমলিনা।

তারপর আর অমলিনার কোনও খোঁজ নেননি অর্ণব দত্ত। এবং স্বস্তি পেয়েছিলেন এত তাড়াতাড়ি ঘাড় থেকে নেমেছে বলে। অমলিনার অবশেষে কী হয়েছিল সেটাও আর খোঁজ করেননি অর্ণব, সে স্পৃহাও ছিল না।

মধ্য দিয়ে ঝড়ের মতো বিশ-পঁচিশ বছর কেটে গেছে। প্রথম দিকে ছোটখাট একটা টুকটাক চাকরি করেছিলেন, তারপর শুধু লেখা। সোজা গল্পে খুব একটা সুবিধে করতে পারেননি, তখন বাঁকা গল্পের দিকে ঝোঁকেন। ব্যঙ্গ-কৌতুক, টিকা-টিপ্পনি। ফাঁকে ফাঁকে দুয়েকটা করে রস ও রহস্যের উপন্যাস। পাবলিক তাঁর লেখা পড়ে, সেটা তাঁর রচনার চাহিদা এবং বইয়ের কাটতি দেখে টের পান অর্ণব দত্ত। তবে তিনি এটাও বুঝতে পারেন, তাঁর যতটা নাম হয়েছে ততটা খ্যাতি-প্রতিপত্তি হয়নি।

আজকাল খ্যাতি-প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি পেতে গেলে কিছুটা ভেক লাগে, কিছুটা বোলচাল লাগে। গল্পে কাহিনীতে সমাজচিন্তা, আর্থ-রাজনীতিক মশলা দিতে হয়। অর্ণব দত্তের সে সব আসে না।

সে সব চুলোয় যাক। অর্ণববাবু এসব নিয়ে আর মাথা ঘামান না। এখন তিনি মাথা ঘামাচ্ছেন, রামলগনবাবুকে কী বলবেন তাই নিয়ে।

রামলগনবাবু বোধহয় এসে গেছেন। এই মাত্র নীচে কলিং বেলের আওয়াজ শোনা গেছে।

দোতলায় সিঁড়ি দিয়ে বড় ভাইপো অলক উঠে এল, এসে ঘোষণা করল, 'রামবাবু এসেছেন।' ঠিক তার পিছনেই রামলগন ছিলেন, তিনি ঘরে প্রবেশ করলেন, অলক নীচে নেমে গেল।

রামলগন তেওয়ারি হৃষ্টপুষ্ট লোক। সব সময় হাসিখুশি। তাঁর নাম শুনে যে ছবি মনে আসে তিনি মোটেই তা নন। শৌখিন মানুষ, ঘিয়ে রঙের সফারি সুট পরে এসেছেন আজ, পায়ে সাদা রঙের চামড়ার চপ্পল-কাম-কাবুলি।

অর্ণববাবু বসতে বলার আগেই রামলগন চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসলেন। কপালটা বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে টিপে মুখ ব্যাজার করে অর্ণব দত্ত বিছানায় আধশোয়া হয়ে বসেছিলেন। তিনি ইঙ্গিতে রামলগনকে চেয়ারটা বিছানার কাছে টেনে নিয়ে আসতে বললেন।

রামলগন চেয়ারটা নিয়ে অর্ণববাবুর কাছে এসে বসলেন। ঘুরে বসার সময় তাঁর চোখ পড়ল টেবিলের ওপরে অর্ধশূন্য পানীয়ের বোতলের দিকে। একটু মৃদু হেসে বোতলটির দিকে অর্থবহ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে রামলগন জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হয়েছে আপনার?'

অর্ণব দত্ত বললেন, 'মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে। এদিকে আপনার গল্পটাও লেখা হয়নি।'

রামলগন বললেন, 'আপনি ডোবালেন। একদিনে একসঙ্গে পাঁচটা কাগজ বের করতে হয়। ডেট ঠিক না থাকলে খুব গড়বড় হয়ে যায়।'

অর্ণব দত্ত বললেন, 'গল্পটা তো লিখেছিলাম।'

রামলগন চঞ্চল হয়ে বললেন, 'সে কি? অন্য কাগজে দিয়ে দিলেন নাকি?'

অর্ণব দত্ত মাথা নেড়ে বললেন, 'তাই হয় নাকি? আপনার গল্প অন্যকে দিয়ে দেব? গল্পটা আমার নিজের দোষে মাঠে মারা গেছে।'

রামলগন নড়েচড়ে বসলেন, 'আপনার কথার মানেটা বুঝলাম না।'

কপালের শিরাদুটো এখনও দপদপ করে, সে দুটো চেপে ধরে আস্তে আস্তে অর্ণব দত্ত গতকাল রাতের ঘটনা এবং তার আগে ডাক্তারের পরামর্শ সবই রামলগনকে বললেন। এরপর লেখার টেবিলের মদের বোতলটা দেখিয়ে তিনি বললেন, 'ওই আধা বোতলটা খেয়েছিলাম।'

কথাটা শুনে রামলগন যেন একটু খুশিই হলেন। বললেন, 'মদ খেয়ে তো ঠিক কাজই করেছেন। মদ খেয়ে লিখলে গল্পে যোশ হয়।'

'যোশ' জিনিসটা যে কি সেটা অর্ণব দত্ত জানেন না, এর আগে শব্দটা তিনি শোনেননি। তিনি প্রশ্ন করলেন, 'যোশ? যোশ আবার কি? আপনি কি যশের কথা বলছেন?'

রামলগন বলেন, 'আরে তা নয়। যোশ হল লেখার আসল জিনিস। আপনার গল্পে হাসিঠাট্টা পাওয়া যায় কিন্তু যোশ থাকে না। এই দেখুন বনমালী মৈত্রের উপন্যাস যোশে ভর্তি, কলেজের ছেলেমেয়েরা হই-হই করে পড়ে। বনমালীবাবুর লেখা নিয়ে চায়ের কাপে তুফান উঠে যায়। টিভিতে সিরিয়াল হয়।'

হ্যাং ওভারের মাথা জোরে নাড়াতে গেলে কষ্ট হয়। তবুও মাথা নাড়িয়ে অর্ণববাবু প্রতিবাদ জানালেন, 'অসম্ভব কথা বলছেন মিঃ তেওয়ারি। আমি মরে গেলেও কখনও বনমালী মৈত্রের মতো লেখার কথা ভাববো না।'

'বনমালীবাবুর ওপর আপনার রাগ আছে আমি জানি,' তেওয়ারি বললেন, 'কিন্তু যোশের কথা যদি বলেন, কাল একটা লেখা পেয়েছি মুম্বই থেকে, 'মুনিয়ার ঘরে রাত'। কি যোশ তাতে পাতায় পাতায়, লাইনে লাইনে যোশ। পড়তে পড়তে মনে হয় মুনিয়ার সুখে আমি সুখী, এমন মধুর রাত যেন না ফুরোয়।'

ভাল করে এসব কথা শুনছিলেন না অর্ণব দত্ত, অন্যমনস্ক ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, 'লেখা কার?'

রামলগন বললেন, 'একদন নতুন লেখিকা। শ্রীমতী অমলিনা, মহিলা প্রথম লেখাতেই বাজার মাত করবেন।'

'শ্রীমতী অমলিনা' নামটি শুনে অর্ণব একটু নড়ে চড়ে বসলেন, প্রশ্ন করলেন, 'মুম্বই থেকে লেখা পাঠিয়েছেন?'

তেওয়ারি বললেন, 'বুঝলেন দত্তদা, সব এক্সপেরিয়েন্সের ব্যাপার। আপনিও আপনার এক্সপেরিয়েন্সের কথা লিখুন। এখন মদ ধরেছেন, দেখবেন শোঁ শোঁ করে যোশের লেখা কলম থেকে বেরবে।'

'যোশের নিকুচি করেছে।' হ্যাং ওভারটা তখন চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে আধকপালেতে পরিণত হয়েছে। অর্ণব দত্ত খেঁকিয়ে উঠলেন, 'মদ খেয়ে কখনও গল্প লেখা যায়। কাল রাতে কাগজ, কলম, স্বাস্থ্য সব নষ্ট হয়েছে। বৃথা পণ্ডশ্রম করেছি।'

এতক্ষণে তেওয়ারি আসল জায়গায় এসে গেছেন। অর্ণব দত্তের মতো জনপ্রিয় লেখক মদ খেয়ে বেসামাল হয়ে কী লিখেছেন, সেটা দেখা দরকার। তিনি কথা ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাল রাতের গল্পটা কী করলেন?'

শুকনো মুখে অর্ণববাবু বলেনল, 'ওয়েস্ট পেপার বাসকেটে ফেলে দিয়েছি।'

টেবিলের পাশেই বাজে কাগজের ঝুড়ি। রামলগন একটু উঠে গিয়ে গল্পটা সেখান থেকে তুলে আনলেন। ওপরেই রয়েছে, খুঁজতে হল না। তারপর পাকা সম্পাদকের মতো গভীর অভিনিবেশ সহকারে পড়তে লাগলেন।

পড়তে পড়তে উত্তেজিত হয়ে পড়লেন রামলগন। 'কেয়াবাৎ', 'কেয়াবাৎ', 'সুপার-ডুপার' এইসব বিশেষণ স্বগতোক্তি করতে লাগলেন, সেই সঙ্গে জোরে জোরে বলতে লাগলেন, 'কি যোশ,' 'কি যোশ'।

ওই অখাদ্য এলেবেলে গল্প পড়ে ঝুনো সাহিত্য ব্যবসায়ী রামলগন তেওয়ারি এমন বিহ্বল হয়ে যাবেন, সেটা কল্পনারও অতীত। অর্ণব দত্ত বিমূঢ় দৃষ্টিতে তেওয়ারির দিকে তাকিয়ে রইলেন।

তেওয়ারি বললেন, 'দত্তদা, আপনার এ গল্প বাংলাভাষার সুরাযুগের পথিকৃৎ হয়ে থাকবে। কিন্তু আগে আমাকে বলুন, আপনার গল্পে দেখলাম শ্রীমতী অমলিনার কথা লিখেছেন। ওনাকে জানলেন কবে?'

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে অর্ণব দত্ত বললেন, 'খুব ব্যক্তিগত ব্যাপার, ও প্রসঙ্গ বাদ দিন। কিন্তু আপনি বলুন তো এ গল্প চলবে কী করে? নায়কের নাম তিনবার বদলে গেল, তিন জায়গায় নায়কের বউয়ের নাম তিনরকম। পুরী এক্সপ্রেস শেয়ালদা থেকে ছাড়ছে—একটা কাহিনীতে এত গোলমাল থাকা উচিত?'

এবার তেওয়ারির সম্পাদক-স্বরূপ দেখা গেল। 'পাঁচটি ভারতীয় ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত নবযুগ মাসিক পত্রের প্রধান সম্পাদক রামলগন অর্ণবকে বললেন, আপনার এই গল্প যেটা কাল মদ খেয়ে লিখেছেন, এরকম যোশের গল্প লেখা সোজা কথা নয়। শুধু দু'চারটে ঠেকা দিতে হবে।'

'গল্পে ঠেকা দিতে হবে?' গল্পে আবার কি করে ঠেকা দেয়, ঠেকা কীভাবে দিতে হয়, অর্ণব দত্ত তাঁর তিন দশকের সাহিত্যিক অভিজ্ঞতা নিয়ে চিন্তায় পড়লেন, সতত পরিবর্তনশীল চরিত্র নামগুলি এবং রেলপথের ধাঁধা এ দুয়ের সমাধান হবে কী করে?

রামলগনবাবু তুখোড় সম্পাদক, তুখোড়তর ব্যবসায়ী। তিনি অর্ণবকে বললেন, আপনি আপনার গল্পের প্রথমে যেখানে ভূমিকা থাকে সেখানে একটা ফুটনোট বা পাদটীকা দিয়ে দিন।'

অর্ণব দত্ত বিড়ম্বিত বোধ করলেন, 'গল্পের প্রথমে ফুটনোট, পাদটিকা?'

রামলগন বললেন, 'ওসব প্রশ্ন বাদ দিন দত্তদা। ফুটনোট না দিয়ে ভূমিকা না হয় দিলেন। প্রথমে লিখে দিন এ গল্পের নায়ক হাওলা, গওলা আর মওলা করেন।'

অর্ণব দত্ত কিছুই বুঝতে না পেরে বললেন, 'হাওলা তো দিল্লির ব্যাপার কাগজে দৈনিক দেখছি আর গওলা হল গরুর খাবার-চুরি। এটা পাটনার। দুটো না হয় বুঝলাম।

কিন্তু মওলাটা আবার কী?'

রামলগন ব্যাখ্যা করলেন, 'মাওলা হল মৌলবাদ, ওটা মুম্বইয়ের ব্যাপার, মুম্বই ব্লাস্ট তো জানেন।'

চিন্তিত অর্ণব দত্ত বললেন, 'কিন্তু এতে আমার গল্পের নায়কের কী সুবিধে হবে?'

তেওয়ারি বললেন, 'তার না হোক আপনার সুবিধে হবে। সে যখন হাওলা করে তখন সে পুরন্দর, যখন গাওলা করে তখন...'

অর্ণব তেওয়ারিকে থামিয়ে বললেন, 'ও আর বলতে হবে না। কিন্তু তিন জায়গায় তিন বৌয়ের কী হবে? রেলের স্টেশনগুলোর নাম না হয় কেটে ঠিক করে দিলাম।'

ঠিক এই সময়ে বাধাপড়ল। নীচতলা থেকে ভাইপো ওপরে এসে বলল, 'জেঠু, এক ভদ্রমহিলা এসেছেন, বলছেন আমি তোমার জেঠিমা।' বালকের কথা শেষ হওয়ার আগেই এক মধ্যবয়সিনী মহিলা অর্ণব দত্তের ঘরে প্রবেশ করলেন।

সকলেই বুঝতে পারছেন যে কাহিনী এবার নাটকীয় মোড় নিতে চলেছে। পাঠক-পাঠিকাদের অনাবশ্যক উত্তেজনার মধ্যে রাখা আমার পছন্দ নয়। অনতি অতীতের মানে এই গত চব্বিশ ঘণ্টায় দু'য়েকটি ঘটনা একটু বলতেই, আশা করি উত্তেজনা প্রশমন হবে।

ডাক মারফত গতকালই রামলগন শ্রীমতী অমলিনার গল্পটি পেয়েছেন। ডাকের কোনও লেখাই রামলগন ফেলে রাখেন না। ছাপতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দেন, ছাপতে না পারলে লেখেন, 'আরও ভাল লেখা দিন। আশা করি ভবিষ্যতে আপনার সহযোগিতা হতে বঞ্চিত হব না।'

আসলে রামলগন জানেন যারা লেখা পাঠায় তাদের অধিকাংশই কাগজের পাঠক, তাই তিনি তাদের চটাতে চান না।

সে যা হোক, গতকালই আমলিনার গল্পটি তিনি পড়েছেন এবং নতুন লেখিকার লেখায় অসাধারণ যোশ পেয়ে চমৎকৃত হয়েছেন। তিনি তখনই অমলিনাকে চিঠি লিখে জানাতে যাচ্ছিলেন যে লেখাটি ভাল লেগেছে এবং শিগগিরই ছাপা হবে। এমন সময় অমলিনার ফোন আসে।

রামলগন অমলিনাকে বলেন যে তাঁর লেখাটি ছাপা হচ্ছে। তখন অমলিনা তাঁকে জানান যে তিনি দু দিন আগে কলকাতায় এসেছেন, কাল দুপুরের ফ্লাইটে মুম্বই ফিরে যাচ্ছেন, যাওয়ার আগে একবার দেখা করে যেতে চান।

রামলগন তখন বলেন, 'কাল সকালে দেখা হতে পারে। তবে সকালে আমি অফিসে থাকি না, লেখকদের বাড়ি যাই।' তারপর ডায়েরি দেখে বললেন, 'কাল সকাল এগারোটায় আমি গল্পকার অর্ণববাবুর বাড়িতে যাচ্ছি। আপনার সুবিধেই হবে বাড়িটা এয়ারপোর্টের পথেই, ওখানেই চলে আসুন, ঠিকানাটা নিয়ে নিন।'

তখন অমলিনা প্রশ্ন করেন, 'অর্ণববাবু মানে কি অর্ণব দত্ত?'

রামলগন বললেন, 'তা ছাড়া আর কী? লেখক অর্ণববাবু উনি একাই।'

এবার ফোনের ওপারে অমলিনা একটু চিন্তা করলেন এবং ঠিকানাটা নিয়ে বললেন,

'ঠিক আছে, আমি যাব।'

সেই তিনি, শ্রীমতী অমলিনা, এসেছেন।

বহুকাল হয়ে গেছে, জীবন গিয়েছে চলে কুড়ি-কুড়ি বছরের পার। তবুও সাবলীলভাবে ঘরে ঢুকে অর্ণবের পাশে খাটের উপরে বসে রামলগনের দিকে একবার তাকিয়ে বললেন, 'আপনি নিশ্চয় রামলগনবাবু।' তারপর মুখ ঘুরিয়ে অর্ণবের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ভীষণ মুটিয়ে গেছ তুমি। একেবারে গোলগাল, নাদুসনুদুস। নামও খুব করছ শুনছি।'

অমলিনার এই আকস্মিক প্রবেশে অর্ণব দত্ত যতটা বিস্মিত হয়েছেন, তার থেকে অনেক বেশি বোকা বনে গেছেন রামলগন।

রালগন বললেন, 'এ কী ব্যাপার। আপনাদের পরিচয় আছে নাকি। অর্ণববাবু আপনি তো সাংঘাতিক লোক।'

অর্ণব নির্নিমেষ নয়নে অমলিনার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। একটু সময়ের ছাপ পড়েছে একটু বয়েসের কারিকুরি। তবু চোখের কোনায় এখনও পুরনো দিনের বিদ্যুৎ ঝিলিক দিচ্ছে।

চোখ নামিয়ে নিয়ে রামলগনকে বললেন, 'ইনি আমার স্ত্রী।'

স্তম্ভিত ও উল্লসিত রামলগন বললেন, 'এ তো রাজযোটক। বাংলা সাহিত্যে নতুন যুগ যে এসে গেল।' তারপর ব্যবসায়ী বুদ্ধিবশত অমলিনাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার প্লেন কখন? ছেড়ে যাবে না তো?' অমলিনা বললেন, 'যাক।'

একদিন রাত্রে

আজ সকাল থেকে টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। শীতের প্যাচালো বৃষ্টি। সেই সঙ্গে যথারীতি উত্তুরে হাওয়া। ঠাণ্ডাও পড়েছে খুব। অনেকদিন কলকাতা শহরে এরকম জমাট ভাব, ভারী ঠাণ্ডা দেখা যায়নি।

সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটা হয়ে গেলো, বৃষ্টি থামবার কোনো নামগন্ধ নেই। যদি জোরে দু-চার পশলা হয়ে যেতো তবে সে ছিলো মন্দের ভালো, হয়তো মেঘটা কেটে যেতো। কিন্তু আকাশ ঘন হয়ে শীতের রাতের অন্ধকার নেমে এলো, টিপটিপ করে বৃষ্টিও হয়ে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে লোডশেডিং, আজ সারাদিন ধরেই বিদ্যুৎবিভ্রাট হচ্ছে। অথচ কাগজে কোলাঘাট-ব্যান্ডেলের কোনো গোলমালের খবর নেই, কি জানি, হয়তো ঠাণ্ডার জন্যেই বিদ্যুতের বাবুরা কাজে আসেনি, বিদ্যুৎ সরবরাহ করার লোকের অভাব হয়েছে।

সে যা হোক, এ সব অবান্তর চিন্তা। জয়দেব বলছিলেন, ঠিক পাঁচটার সময় আসবেন। একেবারে কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটায়। সওদাগরি অফিস মহিমাময়ের, ঐ ঠিক পাঁচটাতেই ছুটি হয়। দশটা-পাঁচটা—ইংরেজ আমলের সেই পুরনো রুটিন এখনো বদল হয়নি।

পাঁচটা থেকে জয়দেবের জন্যে মহিমাময় বসে আছেন। এই বৃষ্টির দুর্দিনে বিকেল-বিকেলই অফিস ফাঁকা হয়ে গিয়েছিলো, এখন ছুটির পরে প্রায় কেউই নেই। শুধু বড়সাহেবের ঘরে আলো জ্বলছে। আর ওখানে বড়সাহেবের কাছে বোধ হয় কোনো ভিজিটর এসেছে। আর এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দুচারজন দারোয়ান, চাপরাসী রয়েছে। ওরা এ অফিসেরই কেয়ারটেকারের স্টাফ, অফিসেরই একতলায় থাকে।

এ ছাড়া এক প্রান্তে অপেক্ষা করছেন নরহরিবাবু। বিপত্নীক, প্রৌঢ় এবং এই অফিসের বড়বাবু। অফিসের মধ্যে নরহরিবাবুর পোষা নিজস্ব হুলো বেড়াল আছে,

সাদা-কালো শরীর, মোটা মাথা, বেড়ালটার নরহরিবাবুর প্রদত্ত নাম কালাহরি। কালাহরিটা এক নম্বরের শয়তান, পাকা চোর। এই পরশুদিনই একটা ফিস কাটলেট টিফিনের সময় প্লেটে টেবিলের উপর রেখে বারান্দায় কলে হাত ধুতে গিয়েছিলেন মহিমাময়, কালাহরি সেটা নিয়ে চম্পট দেয়।

এসব কথা অবশ্য নরহরিবাবুকে বলা চলবে না। কলাহরি অন্ত-প্রাণ তাঁর। বৃষ্টির মধ্যে এই ঠাণ্ডায় হুলোটা কোথায় বেরিয়েছে, এখনো ফেরেনি। প্রতিদিন অফিস থেকে বেরোনোর সময় নরহরিবাবু কালাহরিকে চারটে মিল্ক বিস্কুট খাইয়ে যান। আজ কালাহরি আসছে না বলে তিনি বেরোতে পারছেন না, এখন ভ্রূকুটি-কুটিল মুখে অধীর প্রতীক্ষা করছেন হুলো বেড়ালটার জন্যে।

জয়দেব হুলো বেড়াল নয়, একটা আস্ত মানুষ। মহিমাময় ঘড়িতে দেখলেন, কাঁটা প্রায় ছটার কাছে পৌঁছেছে। উঠে গিয়ে রাস্তার দিকে জানালায় উঁকি দিয়ে দেখলেন, রীতিমত অন্ধকার, লোডশেডিং এখনো চলছে, তার মধ্যে বৃষ্টির ঝিরঝির শব্দ আসছে।

এ অফিসটার একটা জেনারেটর আছে তাই রক্ষা, অন্ধকারে ঘুপচি মেরে জয়দেবের জন্যে অপেক্ষা করতে হচ্ছে না। কিন্তু আর নয়, ছটা বেজে যাওয়ার পর মহিমাময় আর এক মুহূর্তও জয়দেবের জন্যে অপেক্ষা করবেন না।

দুপুরে আড়াইটে নাগাদ মহিমাময় টিফিন করতে বেরিয়ে এক পাঁইট বাংলা দু নম্বর খেয়ে এসেছিলেন। সবদিন এটা করেন না, কিন্তু আজ জয়দেব আসবেন, দুজনের সারা সন্ধ্যার প্রোগ্রাম, তাই টেম্পোটা একটু তুলে রাখতে চেয়েছিলেন। তা ছাড়া জয়দেবের সঙ্গে পাল্লা দিতে গেলে একটু তৈরি হয়ে থাকতে হয়।

দুপুর আড়াইটের সে নেশা কখন কেটে গেছে। জয়দেব সত্যিই আসছেন না। মিনিট কয়েক আগে কালাহরি এসে নরহরিবাবুর হাত থেকে বিস্কুট খেয়ে নরহরিবাবুকে ভারমুক্ত করে গেছে। এবার টেবিল গুছিয়ে নরহরিবাবুও রওনা হলেন। মহিমাময় ঠিক করলেন ঠিক করলেন তিনিও উঠবেন, আর অপেক্ষা করা যায় না।

যাওয়ার পথে নরহরিবাবু একবার মহিমাময়ের টেবিলের পাশে এলেন। মহিমাময় ভাবলেন, বোধহয় বড়বাবু কোনো দরকারী কাজের কথা বলবেন। কিন্তু বড়বাবু যা বললেন তা শুনে মহিমাময় বিস্মিত হয়ে গেলেন।

জয়দেবকে বিশ্বসংসারে চেনে না এমন লোক নেই। এ অফিসেও মহিমাময়ের বন্ধু হিসেবে তাঁকে সবাই চেনে, নরহরিবাবুও চেনেন। নরহরিবাবু অফিস থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'আপনার বন্ধু জয়দেববাবু বড়সাহেবের ঘরে আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

বড়সাহেবকে জয়দেব কী করে চিনলো, কবে কোথায় আলাপ হলো? তা ছাড়া তাঁর কাছে তাঁর অফিসে এসে, তাঁর ঘরে না গিয়ে, তাঁকে কিছু না জানিয়ে বড়সাহেবের ঘরে জয়দেব—মহিমাময় ব্যাপারটা ঠিক হিসেবে মেলাতে পারলেন না। তবে জয়দেবের কটা ব্যাপারই বা মহিমাময় বা অন্য কেউ কোনোদিন মেলাতে বা বুঝতে পেরেছেন।

সে যা হোক, এখন সমস্যা দুটো। জয়দেব ঠিক কী অবস্থায় আছে এবং বড়সাহেবের ঘরে গিয়ে ডেকে বার করে আনা কতটা সঠিক হবে । এই প্রশ্ন দুটো মনে মনে বিবেচনা করতে করতে মহিমাময় বড়সাহেবের ঘরের দিকে এগোলেন। কিন্তু শেষ পর্যায়ে এসে বাধা পেলেন। বড়সাহেবের খাস আর্দালি জানালো, এখন কামরায় ঢোকা যাবে না। সাহেব দোস্তেব সঙ্গ বাত করছেন।

এরই মধ্যে মহিমাময়ের সুশিক্ষিত কানে একটু গেলাসের টুংটাং, খুব পরিচিত একটা শব্দ, ধরা পড়েছে। সর্বনাশ! জয়দেব এখানে অফিসের মধ্যে খোদ বড়সাহেবের সঙ্গে জমিয়ে মদ খাচ্ছে?

নিঃশব্দে কেটে পড়তে যাচ্ছিলেন মহিমাময় বড়সাহেবের দরজার ওপাশ থেকে, কিন্তু ভারি পর্দার অন্তরাল থেকেও সামান্য ফাঁক দিয়ে মহিমাময়কে দেখে ফেলেছেন বড়সাহেব, তিনি বেল বাজিয়ে আরদালিকে ডাকলেন, 'এই দ্যাখো তো ওখানে কে দাঁড়িয়ে?'

আরদালি এগিয়ে আসার আগেই মহিমায় পর্দা উঁচু করে বডসাহেবের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন, 'ভেতরে আসবো, স্যার?'

বড়সাহেব যথেষ্ট মুডে আছেন, অস্বাভাবিক সৌজন্যে বিগলিত হয়ে সাদর আহ্বান জানালেন, 'আরে আসুন আসুন, মহিমবাবু, বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?'

মহিমাময় ঠিক এতটা আশা করেননি। তা ছাড়া এই মুহূর্তে তাঁর চোখ জুড়িয়ে গেলো অন্য একটা দৃশ্য দেখে। একটা মদের বোতল এবং দুটো গ্লাস। খুব মহার্ঘ্য বা দুর্লভ পানীয় বলা যাবে না, স্কচ বা শ্যাম্পেন নয়, তবে মোটামুটি উচ্চমানের দিশি প্রিমিয়াম হুইসকি।

মহিমাময়েব নজরে এটাও এড়ালো না যে বোতল প্রায় অর্ধেক ফাঁকা। তাঁকে চেয়ারে বসতে বলে বড়সাহেব ভেতরের টিফিনঘরে গেলেন। মহিমাময় বসার পরে জয়দেব তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বোতলের দিকে তাকিয়ে কী দেখছিস্?'

নিজের অফিসের বড়কর্তার ঘর, মহিমাময় নিচু গলায় বললেন, 'অর্ধেক ফাঁকা।'

জয়দেব ভুরু কুঁচকিয়ে বললেন, 'তুই ভালো কিছু দেখতে পাস না। অর্ধেক ফাঁকা দেখলি, অর্ধেক ভরা সেটা দেখলি না?'

ইতিমধ্যে বড়সাহেব পিছনের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন হাতে একটা কাচের গেলাস নিয়ে। ইঙ্গিতটা স্পষ্ট, মহিমাময়কেও পানীয় দেবেন। একটু চিন্তান্বিত হলেন মহিমাময়, অফিসের বড়সাহেবের সঙ্গে বড়সাহেবের ঘরে বসে মদ্যপান কতটা নিরাপদ সে বিষয়ে তিনি ভাবতে লাগলেন।

কিন্তু ভাবার অবসর দিলেন না বড়সাহেব। নিজেই একটা গেলাসে পানীয় ঢেলে তার সঙ্গে নিজের জলের ফ্লাস্ক থেকে জল মিশিয়ে এগিয়ে দিলেন মহিমাময়কে। তারপর জয়দেবের দিকে তাকিয়ে মহিমাময়কে বললেন, 'আমার বন্ধু জয়দেব পালের সঙ্গে শুনলাম আপনার আলাপ আছে, তা তো থাকবেই, নামকরা লোক, সিনেমা ডিরেক্টর। আমার ছোটবেলার বন্ধু। একসঙ্গে স্কুলে পড়েছি।'

পরিচয়ের শেষ অংশ শুনে মহিমাময় একটু বিস্মিত হলেন। অবশ্য এরকম আগেও হয়েছে। বহু ব্যক্তিরই মনে ধারণা যে স্বনামধন্য সিনেমা ডিরেক্টর জয়দেব পালের সঙ্গে তিনি একই স্কুলে পড়েছেন। শুধু কলকাতায় নয়, পশ্চিমবঙ্গে বিহারে এমন কি বাংলাদেশে এই সব স্কুল। যেভাবেই হোক জয়দেব বেশ কিছু লোককে সব সময়েই বোঝাতে পারেন কিংবা ধারণা দেন যে তিনি তাঁদের সঙ্গে এক স্কুলে এক ক্লাসে পড়তেন। এই ধারণাটা মহিমাময়ের বড়সাহেবের মধ্যেও ঢুকেছে, বিগত বিদ্যালয়-জীবনের মধুর স্মৃতি স্মরণ করে তিনি এখন কাল্পনিক সহপাঠী সুবিখ্যাত জয়দেব পালের দিকে গর্বিত ও আপ্লুত নয়নে তাকিয়ে আছেন।

বহু অভিজ্ঞতা-সূত্রে মহিমাময় জানেন, যদি এই মুহূর্তে বড়সাহেব তাঁর প্রাক্তন স্কুল বিষয়ে কোনো আলোচনা শুরু করেন, অতীতকালের এক সহকারী শিক্ষকের নিষ্ঠুরতা নিয়ে বা ফাইন্যাল খেলায় অবিশ্বাস্যভাবে স্কুলের শূন্য-চার গোলে হেরে যাওয়া বিষয়ে, সেই স্মৃতিচারণে অনায়াস দক্ষতায় জয়দেব যোগ দেবেন। এ ঘটনা বহুবার মহিমাময় প্রত্যক্ষ করেছেন।

এতক্ষণে 'চিয়ারস' বলে গেলাস তুলে বড়সাহেব মহিমাময়কে পানে যোগদান করতে আহ্বান জানিয়েছেন। বহুক্ষণ শুকনো মুখে বিরক্তিকর প্রতীক্ষার পরে মহিমাময়ের এবার দ্বিধা কেটে গেছে। তিনি এক চুমুকে অর্ধেক গেলাস খেয়ে নিলেন। দুপুরের নেশাটা সবে জুড়িয়ে আসছিলো, অল্প পান করেই মহিমাময় বেশ চনমনে বোধ করলেন।

চেয়ারে একটু নড়েচড়ে বসে মহিমাময় জয়দেবের দিকে একবার, আরেকবার বড়সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমিও জয়দেবের ক্লাসফ্রেন্ড স্যার, একই স্কুলে ক্লাস ওয়ান থেকে ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়েছি।'

মহিমাময়ের কথা শুনে বড়সাহেব চমকিত ও চিন্তিত হলেন, মহিমাময়কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'নেবুতলা?'

মহিমাময় বললেন, 'হ্যাঁ স্যার। নেবুতলা করোনেশন বয়েস হাই ইংলিশ স্কুল। আমার লাস্ট স্কুল ফাইন্যাল ব্যাচ।

বিস্মিত বড়সাহেব বললেন, 'কিন্তু আমি তো জয়দেবের সঙ্গে পূর্ণিয়া জুবিলি স্কুলে একসঙ্গে পড়েছি। সিক্সটির হায়ার সেকেন্ডারি।'

মহিমাময় বলতে যাচ্ছিলেন যে জয়দেবের চৌদ্দপুরুষে কেউ পুর্ণিয়া যায়নি কিন্তু তার আগেই জয়দেব চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, 'সরি, এ খনই আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, রাত্রে দেখা হবে।' বলে তিনি দ্রুতপদে নিষ্ক্রান্ত হলেন। মহিমাময় কী করবেন স্থির করতে না পেরে হাতের গেলাসের বাকি অংশটুকু মুহূর্তের মধ্যে গলাধঃকরণ করে জয়দেবের অনুগামী হলেন। বড়সাহেবের সামনে এই রকম আচরণ সমীচীন কি না, বেরিয়ে যাওয়ার আগে অনুমতি গ্রহণ করা উচিত কি না এসব প্রশ্ন এই মুহর্তে চাপা পড়ে গেলো।

বাইরে লোডশেডিং এখনো আছে তবে বৃষ্টিটা ধরেছে। ঠাণ্ডা আরো জোরদার।

মহিমাময় মোড়ের মাথায় পৌঁছেই দেখতে পেলেন, জয়দেব প্রাণপণ চেষ্টা করছেন যে কোনো একটা ট্যাক্সি দাঁড় করাতে। কিন্তু এই দুর্দিনের সন্ধ্যায় কোনো ট্যাক্সিই দাঁড়াচ্ছে না। মহিমাময় জয়দেবকে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিলেন, এই সময় দুম করে বিদ্যুৎ ফিরে এলো। আলো ফিরে আসায় মনটা একটু প্রসন্ন হয়েছে, তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখলেন জয়দেব তাঁকে দেখতে পেয়েছেন এবং হাতে তুলে ডাকছেন।

মহিমাময় জয়দেবের কাছে গিয়ে বুঝতে পারলেন যে জয়দেব এখনো পুরো মাতাল হননি, তবে তাঁর বেশ নেশা হয়েছে। জয়দেব মহিমাময়কে দেখে বললেন, 'তুই পুরো ব্যাপারটা কাঁচিয়ে দিচ্ছিলি। জানিস তোর বড়সাহেব আমার একটা বইয়ের প্রডিউসার হতে চলেছে।'

এ তথ্যটা মহিমাময়ের জানা ছিলো না। নিজের অফিসের বড়কর্তা অফিসে বসে মদ্যপান করছেন, তার ওপর সিনেমা প্রয়োজনা করতে যাচ্ছেন সম্ভবত অফিসেরই টাকায়—ব্যাপারটা ভালো ঠেকলো না মহিমাময়ের কাছে। কোম্পানিটা এবার লাটে না ওঠে।

কিন্তু আশাব বাণী শোনালেন জয়দেব, 'তোর বড়সাহেবের কাছে তোর খুব প্রশংসা করেছি। এবার তুই অফিসার হয়ে যাবি। নির্ঘাৎ প্রমোশন হবে।' খুব যে আশ্বস্ত হলেন মহিমাময় তা নয়, তিনি মনে মনে ভাবলেন, আগে কোম্পানি টিকুক, তারপরে প্রমোশন।

ইতিমধ্যে জয়দেবের অনুরোধ উপেক্ষা করে আরো দু-তিনটি ট্যাক্সি তাঁকে অতিক্রম করে চলে গেছে। কয়েকদিন আগে লালবাজার থেকে কাগজে বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে, ট্যাক্সি যাত্রী নিতে না চাইলে সেই গাড়ির নম্বর পুলিশে জানিয়ে দিতে।

বেশ কয়েকটি ট্যাক্সি পাত্তা না দেয়ার পর উত্তেজিত জয়দেবের সেই পুলিশি বিজ্ঞপ্তির কথা হঠাৎ মনে পড়লো, তিনি হিপপকেট থেকে একটা নোটবুক বার করলেন আর একটা ডট পেন। এইমাত্র মিটার নামানো যে ট্যাক্সিটা তাঁকে পার হয়ে গেছে তিনি সেটার নম্বর টুকতে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে একটা বিসদৃশ কাণ্ড ঘটলো। যে ট্যাক্সিটি চলে গিয়েছিলো তার ড্রাইভার পিছন ফিরে তাকিয়ে জয়দেবকে গাড়ির নম্বর টুকতে দেখে ব্যাচ করে গাড়িটা ব্যাক করে একদম জয়দেবের পাশে দাঁড়িয়ে গেলো, তারপর ট্যাক্সির বাঁ দিকের জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে বলল, 'আপনি এখন সিনেমা করেন, তাই না?'

এই আকস্মিক প্রশ্নে জয়দেব একটু পিছিয়ে এলেন, একটু আমতা আমতা করে অপ্রস্তুতভাবে একবার মহিমাময়ের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, 'হ্যাঁ, আমি জয়দেব পাল, সিনেমা করি। তাই কি হয়েছে?'

ট্যাক্সিওয়ালা উত্তেজিত হয়ে বললো, 'কি হয়নি! আজ আপনার নাম হয়েছে। সিনেমা তুলছেন, হিল্লি-দিল্লি যাচ্ছেন। খবরের কাগজে আপনার নাম বেরোচ্ছে ছবি বেরোচ্ছে। আপনি মোটা হয়েছেন, লম্বা জুলফি রেখেছেন, মোটা গোঁফ রেখেছেন। আপনি এখন পকেট থেকে নোটবুক বার করে ট্যাক্সির নম্বর নিচ্ছেন। পুলিসকে দিয়ে

আমাদের জেল ফাঁসি করাবেন। ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ!' ঘৃণাভরে বার—বার ধিক্কার দিলো ট্যাক্সি-ড্রাইভার।

জয়দেব তখন একেবারে বেকুব বনে গেছেন, কাঁচুমাচু মুখে ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে আছেন, কী যে করবেন কিছুই বুঝতে পারছেন না এবং কেনই বা ট্যাক্সিওয়ালা এসব বলছে তাও ধরতে পারছেন না।

ট্যাক্সিওয়ালা কিন্তু তখনো নিরস্ত হয়নি, সমানে ধিক্কার বর্ষণ করে চলেছে, 'ছিঃ ছিঃ জয়দেববাবু, আপনার কোনো লজ্জা নেই! আপনি এত নেমকহারাম। আপনি আজ ট্যাক্সি ড্রাইভারদের পিছনে লাগছেন? কিন্তু এই কলকাতার ট্যাক্সিওয়ালারা না থাকলে আজ আপনি কোথায় থাকতেন, কোন ভাগাড়ে? জোড়াবাগান থেকে, খালাসিটোলা থেকে, খিদিরপুর থেকে, ফুটপাথ থেকে, গুণ্ডাদের হাত থেকে, পুলিসের হাত থেকে রাত বারোটা, একটা, দুটো, ট্যাক্সিওয়ালারা আপনাকে কোলে করে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছে। আপনি তাদের গাড়ির সিটে, তাদের গায়ের জামায় বমি করে দিয়েছেন। আজ এই তার প্রতিদান!'

এই ভয়াবহ অভিযোগমালার সামনে জয়দেব অসহায় হয়ে পড়লেন, করুণ কণ্ঠে বললেন, 'ঠিক আছে, যাও-যাও। তোমার নম্বর নিচ্ছি না।'

ট্যাক্সিওয়ালার রাগ তখনো যায়নি, 'কিসের জন্যে নম্বর নেবেন, দাদা? বৃষ্টির রাতে একটু শেয়ারে ট্যাক্সি খাটাচ্ছি, মাতাল-বদমাইশের তুলছি না, এটা কি অন্যায়?'

নিস্তব্ধ হয়ে মহিমাময় এতক্ষণ ধরে এই নাটক দেখছিলেন, এবার যথেষ্ট হয়েছে এই ধরে নিয়ে এগিয়ে এসে ট্যাক্সিকে বললেন, 'ঠিক আছে, এবার আপনি যান। শেয়ারে খাটুন।'

মহিমাময়কেও মনে হলো ট্যাক্সিওলা চেনে, সে বললো, 'ও আপনিও আছেন! নিশ্চয়ই কোথাও বসবেন। কাছাকাছি কোথাও হলে বলুন আমি আপনাদের নামিয়ে দিয়ে আসছি।'

বহুরকম গালাগাল খেয়ে জয়দেব নিজের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছেন, এই ট্যাক্সিতে উঠতে তাঁর ভরসা হচ্ছে না। কিন্তু মহিমাময় বুঝলেন এ সুযোগ হাতছাড়া করা উচিত হবে না। জয়দেবকে ঠেলে তুলে দিলেন ট্যাক্সিতে, তারপর নিজেও উঠলেন, উঠে ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে বললেন, 'পার্ক স্ট্রিট।'

পার্ক স্ট্রিটে একটা পুরনো বারে ওঁদের দুজনেরই একটা চেনা আড্ডা আছে। আজ কিন্তু নিয়মিত আড্ডাধারীদের কেউই আসেনি। এই ঠাণ্ডায় আর বৃষ্টিতে কেউ বাড়ি থেকে বেরোয়নি মনে হচ্ছে। দুজনে গুটিগুটি বারে ঢুকে এক প্রান্তে এসে একটা টেবিলে বসলেন।

ট্যাক্সির মধ্যে জয়দেব গুম মেরে বসেছিলেন, 'মহিমাময়ও কোন কথা বলেননি। এখন বারে ঢুকে দুটো পানীয়ের অর্ডার দিয়ে জয়দেব বললেন, 'এই ট্যাক্সিগুলো যা হয়েছে না।'

মহিমাময় এই দুঃখজনক আলোচনায় গেলেন না। এক প্লেট সসেজ নিয়ে নিঃশব্দে

পানীয় খেতে লাগলেন। দুজনের মধ্যে একটা ভারী ভাব, কেউ কোনো কথা বলছেন না। মহিমাময় একটা সসেজ তুলে জয়দেবকে অফার করলেন, জয়দেব প্রত্যাখ্যান করলেন।

আরো কিছুক্ষণ পরে আরো দু-তিন গেলাস পানীয় প্রায় নিঃশব্দে শেষ হওয়ার পরে মহিমাময় আপনমনে বললেন, 'আবার বোধ হয় বৃষ্টি আসছে। যাই বাড়ি ফিরি।'

জয়দেব এবার হাত তুলে বাধা দিলেন। বললেন, 'কোথায় যাচ্ছিস? আজ রাতে যে তোর বড়সাহেবের বাড়িতে আমাদের ডিনারে নিমন্ত্রণ, তোকেও নিয়ে যাবো বলেছি।'

মহিমাময় আতঙ্কিত হয়ে বলেন, 'সন্ধ্যায় অফিসে বড়সাহেবের সঙ্গে মদ খেয়েছি, তারপরে রাতে তাঁর বাসায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে ডিনার খাবো। এবার নির্ঘাৎ চাকরিটা খোয়াবো।'

জয়দেব শুনে বললেন, 'আরে এত ভয় কিসের? আমার যে বইটায় উনি টাকা দেবেন সেটা নিয়ে আলোচনা আছে। আরো দু-একজন আসবে, তুইও যাবি। নিশ্চয়ই যাবি, আমার জন্যে এটুকু করবি না।'

মহিমাময় বললেন, 'কিন্তু তোর স্কুল নিয়ে যদি আবার কথা ওঠে।'

জয়দেব বললেন, 'ধুর, ওসব এড়িয়ে যাবো। কত লোক যে ভাবে আমি তার সঙ্গে পড়েছি, সবাইকে কি আর সব ব্যাখ্যা দিতে হয়!'

কি জানি কি ভেবে উঠতে গিয়েও মহিমাময় বসে গেলেন। মনে মনে ভাবলেন, বড়সাহেবের ব্যাপারটা একবার শেষ পর্যন্ত দেখা যাক।

সুতরাং বারের এক প্রান্তে জয়দেব এবং মহিমাময়ের সময় ধীরেসুস্থে কাটতে লাগলো আরো কিছুক্ষণ পরে আরো বেশ কয়েক গেলাস পানীয়ের অবসানে, যখন জয়দেবের মুখটা মহিমাময়ের কাছে এবং মহিমাময়ের মুখটা জয়দেবের কাছে ঝাপসা দেখাতে লাগলো দুজনে টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালেন!

দুজনেরই প্রচুর মদপান হয়েছে। দুজনেই এখন টইটম্বুর অবস্থা। জয়দেব বললেন, 'দাঁড়া একটু বাথরুম থেকে আসি।' মহিমাময় একটা দেয়াল ধরে বাইরের দরজার ধারে দাঁড়িয়ে রইলেন কিন্তু জয়দেব সেই যে গেলেন আর আসেন না। ঝিম মেরে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ একসময় মহিমাময়ের মনে হলো জয়দেব বহুক্ষণ গেছেন, দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করার আর কোনো মানে হয় না।

মহিমাময় কিঞ্চিৎ টলতে টলতে রাস্তায় বেরিয়ে এলেন, পাশে একটা চেনা পানের দোকান। বহুদিনের পুরনো অভ্যেস, এখান থেকে এক খিলি জর্দাপান খেয়ে তারপরে বাড়ি ফেরা। পানের দোকানটায় এখন বেশ একটু ভিড়। আশেপাশের বার-রেস্তোরাঁগুলো খালি হচ্ছে। রাত দশটা বেজে গেছে। বৃষ্টিটা নেই, হাওয়া কম। ঠাণ্ডাটাও তেমন নয়। আসলে অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলেই ওরকমটা মনে হচ্ছে মহিমাময়ের।

সে যা হোক, পান কিনতে গিয়ে ভিড়ে বাধা পেয়ে একটু সামনের দিকে একটা

বন্ধ ওষুধের দোকানের সিঁড়িতে একটু বসলেন মহিমাময়। তাঁর ঝিমুনি মত এসেছিলো, হঠাৎ একটা রাস্তার কুকুর এসে পাশে শোয়ার চেষ্টা করতেই তাঁর তন্দ্রাটা আচমকা ভাঙলো।

তন্দ্রা কেটে যাওয়ামাত্র মহিমাময়ের খেয়াল হলো জয়দেবের কথা এবং মনে পড়লো সেই বারের বাথরুমে তিনি ঢুকেছিলেন, বারটা যে পাশেই, মাত্র কয়েক কদম দূরে এটা তাঁর চট করে খেয়াল হলো না। বিশেষ করে গাড়িবারান্দার নিচে এই সিঁড়িতে কুকুরের পাশে বসে পরিচিত জায়গাটা নেশার ঘোরে বেশ অচেনা লাগছিলো তাঁর।

মাতালের আর যতই দোষ থাক, কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করে না। মহিমাময়ও মুহূর্তের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন, এইভাবে জয়দেবকে ফেলে যাওয়া উচিত হবে না।

তিনি সঙ্গে সঙ্গে ফুটপাতে নেমে সামনের রাস্তায় একটা ট্যাক্সিকে ডাকলেন। এই সময়ে পার্ক স্ট্রিটের রাস্তায় ট্যাক্সির অভাব নেই, দিগ্‌দগন্তের নেশাতুরদের জন্যে সারি সারি ট্যাক্সি অপেক্ষমান রয়েছে।

ডাকতেই সামনের ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে গেলো। মহিমাময় সেটায় উঠে বললেন, 'পার্ক স্ট্রিট।

বলেই সিটে হেলান দিয়ে আবার তন্দ্রাচ্ছন্ন হলেন। ড্রাইভার একটু অবাক হলেও এরকম সওয়ারি নিয়ে চালানো তার অভ্যেস আছে। সে একটুক্ষণ থেমে থেকে বললো, 'পার্ক স্ট্রিটে কোথায়?' জড়ানো কণ্ঠে চোখ বোজা মহিমাময় একটু আগে ছেড়ে আসা বারের নামোল্লেখ করলেন। বারের নাম শুনে ড্রাইভারও আর দ্বিরুক্তি না করে তিন সেকেন্ডে ব্যাক করে ট্যাক্সিটাকে ঐ বারের দরজার সম্মুখে নিয়ে এসে বললো, 'এই তো আপনার বার!'

মহিমাময় চোখ খুলে দেখেন সত্যি তাই। সঙ্গে সঙ্গে তিনি গাড়ি থেকে নেমে বখশিশসুদ্ধ একটা দশ টাকার নোট ড্রাইভারকে দিয়ে বললেন, 'খুব তাড়াতাড়ি চালিয়ো না, অ্যাক্সিডেন্ট করে বসবে একদিন।'

বারের দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে মহিমাময় দেখতে পেলেন দাঁড়িয়ে আছেন। জয়দেব। মহিমাময়কে দেখে বললেন, 'আমি ভাবলাম তুই বোধ হয় কোথায় চলে গেলি।'

এই সময় জয়দেবের পরিচিত এক ভদ্রলোক কালুবাবু, বারে ঢুকছিলেন, তিনি জয়দেবকে দেখে বললেন, 'কি হলো, এত তাড়াতাড়ি বেরোচ্ছেন নাকি?'

জয়দেব মহিমাময়কে দেখিয়ে বললেন, 'না, এই আমাদের দুজনের একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, ডিনারে। তাই একটু তাড়াতাড়ি।'

কালুবাবু আটকালেন, 'এক রাউন্ড, বসে যান।'

মহিমাময় কোনো আপত্তি করার সুযোগ পেলেন না, জয়দেবের সঙ্গে তাঁকেও বসতে হলো। মাতালের শেষ রাউন্ড কিছুতেই শেষ হতে চায় না, ওয়ান ফর দ্যা রোড,

ওয়ান ফর দ্যা ডিনার, এই রকম ধারাবাহিক চলতে থাকে। তাছাড়া কালুবাবুর নিজস্ব একটা ভয়াবহ সমস্যা আছে, তিনি বারে এসে সদাসন্ত্রস্ত থাকেন। নিজেই দুঃখ করে ভাঙলেন ব্যাপারটা, 'জানেন জয়দেববাবু, আমার স্ত্রীর জন্যে মুখ দেখতে পারছি না। প্রত্যেকদিন বারে আসে।'

মহিমাময়ের নেশাটা জমজমাট হয়ে উঠেছে, কিন্তু কথাটা তাঁর কানে গেলো, তিনি বললেন, 'ছিঃ ছিঃ, তিনি বারে আসেন কেন?'

কালুবাবু সদ্য আলাপিত মহিমাময়ের হাত ধরে বললেন, 'আর বলবেন না দাদা, প্রত্যেকদিন রাতে এসে আমাকে জামার কলার ধরে এখান থেকে টেনে বার করে বাড়ি নিয়ে যায়। আজ আপনারা আছেন দাদা, আমাকে একটু রক্ষা করবেন।'

জয়দেব ঝিমোচ্ছিলেন, সন্ধ্যা থেকে পেটে কম তরল পদার্থ পড়েনি। কিন্তু তিনি মাতাল হলেও সেয়ানা মাতাল, কালুবাবুর দজ্জাল স্ত্রীর কথা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো। মহিমাময়ের ব্যাপারটা ভালো জানা নেই, কারণ তিনি সাধারণত রাত করেন না। কিন্তু জয়দেব জানেন কালুবউদি মধ্যরজনীর বারে এক মূর্তিমতী বিভীষিকা। জয়দেব চট করে গেলাসের অবশিষ্ট পানীয়টুকু গলাধঃকরণ করে মহিমাময়কে বললেন, 'এই ওঠ। ডিনারের নেমন্তন্নে দেরি হয়ে যাচ্ছে।' তারপর মহিমাময়ের হাত ধরে প্রায় হিঁচড়ে বার করে রাস্তায় নেমে এলেন, অসহায় কালুবাবুর ঘাড়ে বিল মেটানোর পুরো দায় ঢেলে দিয়ে।

রাত সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে। এখন আবার গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়েছে। নিঝুম, শীতল পার্ক স্ট্রিট। তবে ভাগ্য ভালো, এখনো দু-একটা ট্যাক্সি রয়েছে শেষ সওয়ারির আশায়।

মহিমাময়ের স্ত্রী পিত্রালয়ে গেছেন দুদিনের জন্যে। তবু এত রাত হবে তিনি ভাবেননি। এখন বাড়ি ফিরলে সিঁড়ির নিচে থেকে ঘুমন্ত বুড়ি ঝিটাকে ডেকে তুলে দরজা খোলাতে পুরো পাড়া জেগে যাবে। সুতরাং জয়দেবের সঙ্গে থাকাই মহিমাময় শ্রেয় মনে করলেন। তাছাড়া ইতিরিক্ত মদ্যপান করে তাঁর মনে একটা সাহস এসেছে, চাকরি তুচ্ছ করে তিনি এখন বড়সাহেবের মোকাবিলা করতে প্রস্তুত।

সুতরাং জয়দেব এবং মহিমাময় দুজনে এবার ট্যাক্সিতে রওনা হলেন বড়সাহেবের বাড়ির ডিনারে। বড়সাহেবের বাড়ি সেই সল্টলেকে। ট্যাক্সিওয়ালা কুড়ি টাকা একস্ট্রা চাইলো। জয়দেব তাতেই রাজি হলেন। পার্ক স্ট্রিটে আলো ছিলো কিন্তু সল্ট লেকে এখন গভীর অন্ধকার। লোডশেডিংয়ে ধুঁকছে উপনগরী।

দেখা গেলো, জয়দেব বাড়িটা চেনেন। কোনো রকমে খুঁজে খুঁজে বাড়িটা বেরোলো। নতুন একতলা বাড়ি, বাইরের ঘরের সঙ্গে লাগানো ছোট একটা শোয়ার ঘরে কোনো অজ্ঞাত কারণে সংসার থেকে একটু আলাদা হয়ে বড়সাহেব থাকেন। জয়দেব ঘরটা জানেন। ঘরের জানালায় গিয়ে টুকটুক করতে অন্ধকারে কম্বল জড়িয়ে এসে বড়সাহেব একপাশের দরজাটা খুলে দিলেন। তিনি আশা করেননি রাত বারোটার পরে এই দুই ব্যক্তি ডিনার খেতে আসবেন। তবু ভদ্রতার খাতিরে তিনি এঁদের দুজনকে

ভেতরে নিজের শোয়ার ঘরে নিয়ে বসালেন।

বড়সাহেব একটা মোমবাতি ধরানোর জন্যে বালিশের নিচে দেশলাই হাতড়াচ্ছিলেন। জয়দেব বললেন, 'গলাটা বড় শুকিয়ে গেছে। কোনো ড্রিঙ্ক আছে?'

দেশলাই খুঁজতে খুঁজতে বড়সাহেব বললেন, 'না, বাসায় তো কোনো ড্রিঙ্ক নেই!' ততক্ষণে দেশলাই জ্বালিয়ে সামনের তেপায়া টেবিলের ওপরে একটা মোমবাতি ধরিয়ে ফেলেছেন তিনি।

মোমবাতির ক্ষীণ আলোয় জয়দেব দেখতে পেলেন, বড়সাহেব মিথ্যে কথা বলেছেন, তেপায়া টেবিলের নিচে একটা পানীয়ের বোতলে প্রায় গলা পর্যন্ত ভর্তি পানীয় রয়েছে।

হঠাৎ দমকা ফুঁ দিয়ে, কেউ কিছু বুঝবার আগে জয়দেব মোমবাতিটা নিবিয়ে দিলেন, তারপরে 'তবে রে শালা, মদ নেই' এই বলে তেপায়া টেবিলের নিচ থেকে অন্ধকারে বোতলটা তুলে নিয়ে মুখের মধ্যে ঢকঢক করে ঢেলে দিলেন।

বড়সাহেব যথাসাধ্য বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তার আগেই জদয়দেবের আর্ত চিৎকার শোনা গেল, 'সর্বনাশ, ওরে বাবা রে মারা গেলাম, গলা পুড়ে গেলো, বুক জ্বলে গেলো। হাঁচতে হাঁচতে কাশতে কাশতে বমি করতে লাগলেন জয়দেব। ঘটনার আকস্মিকতায় ভীষণ ভয় পেয়ে ঘামতে লাগলেন মহিমাময়, ভাবলেন হয়তো বোতলে অ্যাসিড-ট্যাসিড কিছু ছিলো, জয়দেব তাই খেয়ে ফেলেছেন। এদিকে বড়সাহেব আবার মোমাবাতি জ্বালিয়ে ফেলেছেন, মোমবাতির আলোয় পানীয়ের বোতলটার আর এক পাশে উবু হয়ে জয়দেব গলায় আঙুল দিয়ে বমি করেছেন।

বড়সাহেব কপাল চাপড়াতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন, 'ছিঃ ছিঃ, আমার শালা খাঁটি জিনিসটা এনে দিয়েছিলো আলিগড় থেকে, কলের ঘানির খাঁটি সরষের তেল, এটা এইভাবে নষ্ট হলো।'

মহিমাময় কিছু বুঝতে পারছিলেন না। একে ঘোর নেশা হয়েছে, তার উপরে এই বিচিত্র বিপজ্জনক কাণ্ড। ব্যাপারটা বড়সাহেবের খেদোক্তিতে ক্রমশ স্পষ্ট হলো।

বড়সাহেবের শীতকালে গায়ে সরষের তেল মাখার বাতিক আছে। শীতকালে তাঁর চামড়া ফেটে যায় প্রত্যেক বছর। উত্তরপ্রদেশে আলিগড়ে থাকেন তাঁর এক শালা। তিনি শীতের আগে জামাইবাবুকে সরষের তেল দিয়ে গেছেন গায়ে মাখবার জন্যে। সেই তেলটাই ছিলো বিছানার কাছে তেপায়া টেবিলের নিচে ঐ খালি হুইস্কির বোতলে। আর তাই পান করে জয়দেবের এই দুর্দশা।

এই গল্প এর পরে আর টেনে নিয়ে যাওয়ার কোনো মানে হয় না। কিন্তু পরবর্তী একটি মর্মান্তিক দৃশ্যের কথা না বললে ঘটনাটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়, যদিও ঘটনাটির সঙ্গে মদ্যপানের কোনো সম্পর্ক নেই।

সেদিন রাত্রে বড়সাহেবের বাইরের ঘরে জয়দেব আর মহিমাময় শুয়েছিলেন। পরদিন সকালবেলা মহিমাময় ঘুম থেকে উঠে দেখলেন, মেঘ কেটে গেছে, বৃষ্টি নেই,

নির্মল আকাশ, সুন্দর ঝকঝকে রোদ উঠেছে। জানালা দিয়ে রোদ এসেছে বড়সাহেবের ঘরে। সেই রোদে একটা লুঙ্গি মালকোচা দিয়ে পরে মহিমাময়ের পরম শ্রদ্ধেয় বড়সাহেব মেঝের বমির উপরে ভাসমান সরষের তেল হাত দিয়ে আলতো করে তুলতে গায়ে মাখছেন। মহিমাময়ের এদিকে দৃষ্টি পড়ায় কিঞ্চিৎ লজ্জিত হলেন তিনি, তারপরে বললেন, 'জিনিসটা বড় খাঁটি। নষ্ট করতে মন চাইছে না। আপনিও মাখবেন নাকি একটু?'
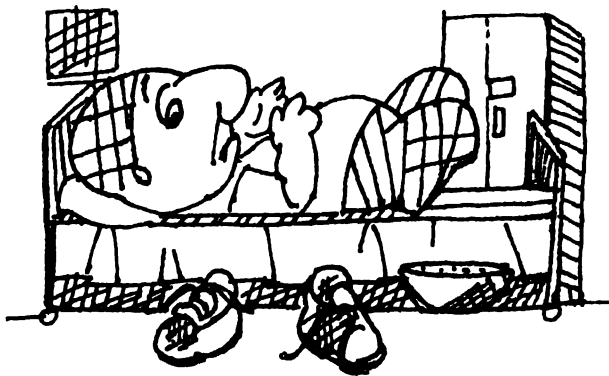
ভাল খবর, খারাপ খবর

কাছাকাছি চেনা-পরিচিত লোকজন একেবারেই কেউ নেই, তা নয়। কিন্তু তেমন ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব, এদিকে কেউ নেই। যাদের সঙ্গে বসে গল্প-গুজব-পরনিন্দা, পরচর্চা করতে পারি, হো হো করে হাসতে পারি—সাদা কথায় প্রাণ খুলে আড্ডা দিতে পারি আমার সে রকম আপনজনেরা এই প্রান্তে কেউ নেই।

বেশি বয়েসে পুরনো এলাকা ছেড়ে চলে এসেছি, এরকম যে হবে সেটা জানতাম। কিন্তু কেমন খালি খালি লাগে। বিশেষ করে শনিবারের সন্ধেবেলায় মনটা হু-হু করে ওঠে।

এর জন্যে আমি নিজেকে দোষ দিতে পারি না। অবলুপ্তপ্রায় বান্ধবতান্ত্রিক সমাজের শেষ জীব আমরা দু-চারজন এখনো আছি। অর্ধেক বা অর্ধেকের বেশি বোধ হয়, শেষ হয়ে গেছে। আকাশ প্রদীপ জ্বালিয়ে তাদের আহ্বান করতে হয়। অনেকদিন আগে এক কবি লিখেছিলেন,

'পুরনো বন্ধুরা সব
স্মৃতির গম্বুজ হয়ে আছে।'

আমার বন্ধুরা যাঁরা এখনও বেঁচে আছেন, তাঁরা সবাই যে গম্বুজ হয়ে গেছেন, তা কিন্তু নয়। উৎসবে, ব্যসন তাঁদের সঙ্গে দেখা হয়। কখনও সাবেকি দক্ষিণ কলকাতায়,

কখনও অন্যত্র।

দেখা হয়, কথাবার্তা হয় কিন্তু আড্ডা আর আগের মত জমে না। অসম্পূর্ণ আড্ডার শেষ অতৃপ্ত চিত্তে নতুন বাসায় ফিরে আসি। শহরের অন্য প্রান্তে।

একটা পুরনো ইংরেজি শ্লোক আছে।

'প্রকৃতি শূন্যতা বর্জন করে।' আসলে কথাটা হল প্রকৃতি কিছু শূন্য হতে দেয় না যথাস্থান পূর্ণ করে। এই লবণ হ্রদে আমারও তাই হয়েছে। পুরনো শূন্যতাকে নতুন শূন্যতা পূরণ করেছে।

অর্থাৎ এখানে আমার নতুন-নতুন বন্ধু জুটেছে, অসমবয়সী সব বন্ধু। ঠিক হালফিলের যুবক না হলেও এখনো তেমন প্রৌঢ় হয়নি।

এই নতুন বন্ধুদের নিয়ে শনিবারের সন্ধেয় একটা আড্ডার শুরু করেছি। এদের সঙ্গে আমার বয়েসের মিল নেই, চিন্তার বা লেখাপড়ার মিল নেই কিন্তু একটা জায়গায় মিল আছে। এরা রাজনীতির ধার ধারে না, সিনেমার আলোচনা করে না, আবোল-তাবোল কথা, উলটো-পালটা গল্প বলতে ভালবাসে।

আমিও তাই ভালবাসি। আমার পুরনো আড্ডার পুরনো বন্ধুরাও তাই ভালবাসতেন। সমাজ-সংস্কার, শিল্প-সাহিত্য, সিনেমা-খেলা এ সব কিছুই নয়, নেহাত নিরর্থক কথাবার্তা, অট্টহাসি—এ না হলে আড্ডা?

দক্ষিণ কলকাতার সনাতন আড্ডার মত না হলেও আমাদের এই আড্ডায় আজ কিছুদিন হল, ঐ সপ্তাহান্তে শনিবার বেশ ভিড় হচ্ছে। শুধু মধ্যবয়েসীরাই নয়, আমার মত বিগত যৌবন দু-চারজন আসছেন। তবে আবদুস সালাম না এলে আড্ডাটা ভাল জমে না।

আবদুস সালাম বর্ধমানের ছেলে। মোটামুটি ভাল সরকারি চাকরি করে আবগারি দপ্তরের ইনস্পেক্টর। কাছাকাছি একটা সরকারি আবাসনে সপরিবারে থাকে।

সালামের গল্পগুলো একটু গাঁজাখুরি পর্যায়ের। তার বন্ধুরা পরিহাস করে বলে আবগারি দপ্তরের কাজে যে পরিমাণ গাঁজা সালাম সিজ করে তার প্রায় সবটাই ও নিজে খেয়ে নেয়, অতি অল্প অংশই সরকারের ঘরে জমা পড়ে।

এই আবদুস সালামই আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'দাদা, ইংরেজীতে তো স্ত্রীকে বেটার হাফ বলে, তাই না?'

সে সুচতুরভাবে কোনো একটা রসিকতায় ঘোরাপথে পৌঁছানোর চেষ্টা করছে বুঝতে পেরে আমি সতর্কভাবে উত্তর দিলাম। খুব সংক্ষিপ্ত উত্তর 'হ্যাঁ'।

সালাম বলল, 'তা হলে একজন লোক যদি দুবার বিয়ে করেন তো শেষ হয় যাবে।

আমি আবার সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করলাম, 'কেন?'

সালাম বলল, 'বুঝতে পারছেন না? হাফে হাফে ফুল, একেবারে ফিনিশ।'

এই রকম সব বাজে কথা বলায় ওস্তাদ, তার প্রতিবেশী চিরঞ্জীব, নিউ সেক্রেটারিয়েটে কাজ করে। সে সালামকে দুচোখে দেখতে পারে না। কিন্তু এদিকে দু'জনে একসঙ্গে আমার বাসায় আসে। এবং সালামের হাসির কথা গম্ভীর হয়ে শোনে,

কিছুতেই হাসে না।

একদিন সালাম এসে বলে, চিরঞ্জীবের বাড়িতে দেশ থেকে ওর এক কাকা এসেছে। প্রত্যেকদিন দুবেলা তার সঙ্গে ঝগড়া হচ্ছে।'

চিরঞ্জীব সঙ্গেই ছিল, সে একটু মোটাসোটা হাসিখুশি ধরনের লোক। দেখলাম তাকে বেশ কাহিল দেখাচ্ছে। বললাম, 'কী ব্যাপার? কিসের ঝগড়া কাকার সঙ্গে?'

চিরঞ্জীব বলল, 'আর বলবেন না দাদা। পারিবারিক বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপার। কাকা খুব জ্বালাচ্ছে। সাতদিনে দু কেজি ওজন কমে গেছে আমার।'

এ রকম ক্ষেত্রে যা বলতে হয় তাই বললাম, 'কাকাকে বরদাস্ত করছ কেন?'

চিরঞ্জীব কিছু বলার আগে সালাম বলল, 'দাদা জানেন তো, সব ব্যাপারেই একটা ভাল দিক আছে, একটা খারাপ দিক আছে।'

ভাল দিক, খারাপ দিক, ভাল ব্যাপার, খারাপ ব্যাপার, ভাল খবর, খারাপ খবর এই রকম সব ভাল-খারাপ নিয়ে সালামের কারবার, এটা তার মুদ্রা দোষ।

কিন্তু চিরঞ্জীবের আজকের ব্যাপারটার মধ্যে সালাম সেই ভাল খারাপ টেনে আনায় একটু বিস্মিত হলাম, এর মধ্যে ভাল কী থাকতে পারে।

এই শনিবারীয় সান্ধ্য আড্ডায় আর যাঁরা আসেন তাঁরা প্রবীণ মান্যগণ্য লোক। সালাম আর চিরঞ্জীব থাকলে বিশেষ কথা বলার সুযোগ পান না। এবং প্রাজ্ঞের মত চুপ করে থাকেন। এঁদেরই একজন রণদাপ্রসাদবাবু একজন অবসরপ্রাপ্ত হাকিম। তিনিই মাঝে মধ্যে দুয়েকটা প্রশ্ন তোলেন, আজ তিনিই আমার মনের জিজ্ঞাসাটি ব্যক্ত করলেন, 'চিরঞ্জীববাবুর এই ব্যাপারের মধ্যে ভাল দিক কী থাকতে পারে?'

সালাম বলল, 'হাকিম সাহেব কাকার অত্যাচারে চিরঞ্জীবের দু কেজি ওজন কমে গেছে। ও কাকাকে তাড়িয়েই দিচ্ছিল। আমি বলেছি, দ্যাখ ওজন কমানো সোজা ব্যাপার নয়। আজকাল এসব ব্যাপারে খুব খরচা। কাকার জন্যে দু কেজি ওজন কমেছে, আর কয়েকদিনে আরো তিন কেজি ফ্যাট ঝরিয়ে নে। পাঁচ কেজি ওজন কমে গেলেই কাকাকে ঘাড় ধরে বাসা থেকে বের করে দিবি।'

এই সালাম এবং চিরঞ্জীব আমাদের এই সাপ্তাহিক সান্ধ্য বাসরটি মোটামুটি জমিয়ে রেখেছে। এক শনিবার সালামকে বললাম, 'সালাম, সামনের শনিবার আমার পুরনো আড্ডার বন্ধুদের এখানে ডেকেছি। মাছের কচুরি পনীরের সিঙ্গাড়া আর তেঁতুল-লঙ্কা-কুচো চিংড়ির চাট—তোমাদের বৌদি বাসায় করবেন। তুমি আর চিরঞ্জীব অবশ্য আসবে। তোমার সেদিন স্পেশাল পারফরম্যান্স চাই।'

সালাম বলল, 'আমি বিশেষ কিছু পারব না, তবে পঁচিশ গ্রাম গাঁজা, চার বোতল চোলাই, দু বোতল বাংলা, দু বোতল রাম নিয়ে আসবো।'

আমি চমকে গিয়ে বললাম, 'এ সব তোমার কাছে কে চেয়েছে? আমি তোমার কাছে পারফরম্যান্স চাইছি, যাতে আমার পুরনো বন্ধুরা বুঝতে পারেন আমি এই নতুন পাড়ায় ভালই আছি।'

পরের শনিবার যথাদিনে এল। সন্ধের একটু আগে সালাম অফিসের একটা জিপে

করে এসে গাঁজা থেকে রাম পর্যন্ত তার ফিরিস্তি মতো সব জিনিস নামিয়ে দিয়ে গেল। আমাকে বলল, 'আমি একটু একটা নার্সিংহোমে যাচ্ছি। আমার ছোটসাহেবের একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। আমি তাঁকে একটু দেখে সরাসরি এখানে ফিরে আসব।'

আমি বললাম, 'দেরি করবে না।'

সালাম বলল, 'না দেরি হবে না। ছোটসাহেবকে দেখে, তাঁর স্টকটা বুঝিয়ে দিয়ে চলে আসব।'

আমি বললাম, 'স্টক আবার কী?'

সালাম বলল, 'নার্সিংহোমে একা একা পড়ে আছেন। একটু সাহচর্য দিতে হবে তো?'

আমি প্রশ্ন করি, 'সাহচর্য?'

সালাম মৃদু হেসে জিপের সামনের সিটে উঠতে উঠতে বলল, 'অল্প গাঁজা কিছু চোলাই, কিছু বাংলা আর অল্প রাম। এই আর কি?'

আমাদের শনিবারের আড্ডা সেদিন নতুন-পুরনোয় জমজমাট।

প্রায় শেষাশেষি সালাম এল। চোখ লাল, একটু টলছে। এসে ঢুকতে চিরঞ্জীব আমাকে ফিসফিস করে বলল, 'গাঁজা আর মদ দুইই খেয়েছে।'

সালামের দৌলতে সেদিন আমার আড্ডাতেও গাঁজা আর মদ দুই চলছিল। আমি চিরঞ্জীবের কথায় পাত্তা না দিয়ে সালামকে বললাম, 'কী খবর?'

সালাম বলল, 'দাদা ভাল খবর খারাপ খবর দুইই আছে।'

আমি বুঝলাম শ্রীমান প্রস্তুত হয়ে এসেছে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'খারাপ খবরটা বা কী? ভাল খবরই বা কী?'

সালাম বলল, 'আমার নয়, আমার সাহেবের।'

আমি অনুমতি দিলাম, 'তাই বলো।'

সালাম যা বলল সেটা অকল্পনীয়। সন্দেহ হল, বোধহয় সত্যি কথাই বলেছে। কারণ এতটা বানানো সহজ নয়।

সালামের ছোটসাহেবের খুব জুতোর শখ। গাঁজা, মদের পরই তাঁর জুতোর নেশা। প্রায় বিশপঁচিশ জোড়া জুতো তাঁর। চেনাশোনা কারো পায়ে নতুন এক জোড়া ভাল জুতো দেখলেই তিনি খোঁজ নেন, কোথা থেকে কিনলেন? কত দাম?'

সেই ছোটসাহেব পরশুদিন চিনেবাজারে জুতো কিনতে গিয়েছিলেন। অনেক দর দাম করে সাড়ে আটশো টাকা দিয়ে একজোড়া লাল চামড়ার ফিতেওলা জুতো কিনে, সেই নতুন জুতো জোড়া পায়ে দিয়ে পুরনো জুতো জোড়া জুতোর বাক্সে ভরে, বগলে করে অফিসে ফিরছিলেন।

চিনেবাজারের অদূরেই অফিস। পায়ে হেঁটেই ছোটসাহেব ফিরছিলেন।

সেদিন সকালবেলা থেকে টিপটিপ করে বৃষ্টি হচ্ছিল। রাস্তা-ঘাট পিছল। চিৎপুর আর লালবাজারের মোড়ে তাড়াতাড়ি রাস্তা পেরোতে গিয়ে ছোটসাহেব পা পিছলে রাস্তার ওপরে চিত হয়ে পড়ে গেলেন। একটা মোটর সাইকেল বাস লরির পাস

কাটিয়ে কলাকৌশল সহকারে ড্রিবল করতে করতে আসছিল, সেটা অবলীলাক্রমে ছোটসাহেবের পায়ের ওপর দিয়ে উঠে গেল।

এরপরে আর ছোটসাহেবের কিছু মনে নেই। জ্ঞান হয়েছে পরের দিন সকালে নার্সিং হোমে, জ্ঞান ফেরার পরই খোঁজ করেছেন, আমি কোথায়? এবং তারপরে আমার নতুন জুতোজোড়ার কি হল? পায়ে এত ব্যথা কেন?

ধীরে ধীরে লোকের কথা শুনে তাঁর সবই অল্প অল্প মনে পড়ল। বুঝতে পারলেন পা দুটো একেবারে থেঁতলে গেছে। তবে নতুন জুতোজোড়া আছে, সেটা পা থেকে খুলে তাঁর কেবিনেই রেখে দেওয়া হয়েছে।

একটু পরে ডাক্তারবাবু বললেন, 'আপনার এক্স-রে টেক্স-রে সব করা হয়ে গেছে। কাল রিপোর্ট পাবেন।'

পরের দিন সকালে ডাক্তারবাবু এলেন, এসে বললেন, 'আপনার খবর আছে।' ছোটসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী খবর, ডাক্তারবাবু?'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'খারাপ খবর আর ভাল খবর দুইই আছে।'

ছোটসাহেব বললেন, 'এ আবার কী হেঁয়ালি। ব্যাপারটা খুলে বলুন বলুন ডাক্তারবাবু।'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'আগে খারাপ খবরটা শুনবেন, না ভাল খবরটা?'

ছোটসাহেব বহুকালের পোড খাওয়া লোক। বললেন, 'আগে খারাপ খবরটাই বলুন।'

ডাক্তারবাবু নির্বিকারভাবে বললেন, 'আপনার দুটো পা-ই কেটে ফেলতে হবে।'

এই কথা শুনে ছোটসাহেব কপালে করাঘাত করে আর্তনাদ করে উঠলেন, তারপর বললেন, 'এর পরে আর ভাল খবর কী থাকতে পারে ডাক্তারবাবু?'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'পাশের কেবিনের ভদ্রলোক আপনার নতুন জুতো জোড়া কিনতে চেয়েছেন।'

তখন আমাদের বাসায় আড্ডা একেবারে তুঙ্গে। গাঁজার ধোঁয়ায়, মদের গন্ধে ঘর জমজমাট।

সালামের গল্প শুনে সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগল। পুরনো বন্ধুরা বললেন, 'এ রকম আড্ডা ছাড়া যায় না। এখন থেকে প্রত্যেক শনিবার আসব।'

সালাম বলল, 'সেটা ভাল খবর কি খারাপ খবর বুঝতে পারছি না।'

পুনশ্চ মাতালের গল্প

পাঠিকা ঠাকুরানি নিজগুণে ক্ষমা করবেন। আপনি ঠিকই ধরেছেন, মাতালের গল্প ছাড়া আমার গতি নেই।

মাতাল যেমন বারবার তার ঠেকে ফিরে যায়, তেমনি আমি ঠেকে গেলেই মাতালের গল্পে ফিরে আসি।

এক মদ্যপ মধ্যরাতে রাস্তায় হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়েছিলেন, তার কপাল কেটে যায়। বাড়িতে এসে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কপালের কাটা জায়গায় স্টিকিং প্ল্যাস্টার লাগিয়ে সে শুতে যায়। পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখে তার কপালে কোথাও স্টিটিং প্ল্যাস্টার লাগানো নেই, বিছানাতেও পড়ে নেই। পরে দাড়ি কামাতে গিয়ে সে দেখে ছোট স্টিচিং প্ল্যাস্টার আয়নার সঙ্গে লেগে আছে। তার মানে তার কপালের কাটা জায়গায় প্ল্যাস্টারটা না লাগিয়ে সে সেটা আয়নায় তার ছায়ার কপালে লাগিয়ে দিয়েছিল।

জগৎ সংসারে মাতালের মত রহস্যময় জীব আর নেই। সে একাধারে সরল ও জটিল, বশংবদ ও মারকুটে, কৃপণ ও উদার, সনাতন ও আধুনিক। প্রকৃত মদ্যপের কথাকার হতে পারেন চেকভ কিংবা শরৎচন্দ্র।

আমার দৌড় ঐ আয়না পর্যন্ত। ছায়ার কপালে স্টিকিং প্ল্যাস্টার লাগানো। রক্ত মাংসের মানুষটাকে আমি মোটেই কায়দা করতে পারি না, আয়নার মধ্যের ছায়াই আমার ভরসা।

আরম্ভ

এ গল্প উত্তম বা প্রথম পুরুষে আমি লিখবো না। এর মধ্যে 'আমি' কোথাও নেই। আমি এই কাহিনীর তথাকথিত কোনো চরিত্র নেই। কিন্তু গল্পলেখক হিসেবে কিঞ্চিৎ ভূমিকা করার প্রয়োজন আছে।

নির্মদ পাঠক এবং নির্মদিনী পাঠিকাদের কাহিনীর সুবিধার্থে, দুয়েকটি মোটা তথ্য নিবেদন করি। মাতাল নিয়ে গল্প, তাই মদের ব্যাপারটা অল্প বলে নিচ্ছি। কেউ যেন ভাববেন না, প্রচুর মদ্যাসক্তির জন্যে এসব জিনিস আমি ধরে ধরে জেনেছি। তা নয়, প্রথম যৌবনে অধুনালুপ্ত ঐতিহাসিক রাজস্ব পর্ষদের বিলীয়মান আবগারি শাখায় কয়েক বছর কাজ করে কিঞ্চিৎ জেনেছিলাম।

ছোটগল্পের পরিসরে বিস্তারিত বলা যাবে না। আমাদের এই আখ্যানের কুশীলবেরা বাংলা খান। বাংলা মানে দিশি মদ, এযাত্রা দিশি মদের কথাই বলছি।

দিশি মদ, বাংলা মদ নামেই সমধিক প্রচলিত। বাংলাদেশেও শুনেছি, পশ্চিমবঙ্গেও তাই সরকারি দিশি মদের পরিচয় বাংলা বলে। অবশ্য এর বাইরে বেআইনি, বেসরকারি চোলাই দিশি মদ আছে, যাকে গ্রাহকেরা ভালোবেসে চুল্লু বলে।

সরকারি দিশি মদকে যে বাংলা মদ বলা হয় এ বিষয়ে আমার মনে একটা খটকা আছে। দিশি মদ এই বাংলাতেই বাংলা মদ, বিহারে কিন্তু বিহার মদ নয়। মাদ্রাজে মাদ্রাজ মদ বা তামিল মদ নয়।

আরেকটা কথা উল্লেখ করে রাখি, আমাদের দেশে যে সব বিলিতি মদ তৈরি হয়ে সরকারি পরিভাষায় সেও দিশি মদ, কানট্রি মেড ফরেন লিকার, সংক্ষেপে (সি.এম.এল) আর বাংলা মদ হলো কানট্রি লিকার, দিশি মদ।

বাংলা মদের দোকানের আরেকটা বিশেষত্ব হলো এ সব দোকানের কোনো নাম থাকে না। সাইনবোর্ড পর্যন্ত থাকে না। কোথাও কদাচিৎ সাইনবোর্ড থাকলে তাতে দোকানের কোনো নাম দেয়া থাকে না। সেখানে লেখা থাকে, মদের দোকান, ভেন্ডার রামচন্দ্র সাউ কিংবা শ্যামনাথ সাধুখাঁ।

মূল কাহিনী

আপাতত যথেষ্ট হয়েছে। পাঠক-পাঠিকাদের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এক গল্পের সুযোগে নিষিদ্ধ বিষয়ে এর চেয়ে বেশি জ্ঞানদান করা যুক্তিসঙ্গত নয়।

এবার আমরা মূল গল্পে প্রবেশ করি। প্রথমেই ভ্রম সংশোধন। বাংলা মদের দোকানের নাম যে থাকে না তা নয়। বাংলা মদের নামহীন দোকান সব, যেগুলোকে তার গ্রাহক-অনুগ্রাহকেরা ভালোবেসে ঠেক বলে থাকে, কখনো কখনো গ্রাহকদের দ্বারস্থ গৌরবার্থে নামান্বিত হয়। যেমন খালাসিটোলা, বারদুয়ারি, হাবিলদার বাড়ি, মায়ের ইচ্ছা ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই সব ঠেকে দু-চারজন যে বিক্ষিপ্তভাবে যায় না তা নয় কিন্তু অধিকাংশই দলবদ্ধভাবে যায়। বন্ধু-বান্ধবের একেকটা দলে চার-পাঁচ জন থেকে পনেরো-বিশজন পর্যন্ত থাকে।

* * *

পূর্ব কলকাতার হাবিলদার বাড়ি একটি সুপ্রাচীন বিখ্যাত ঠেক। কেন এই মদের দোকানটির নাম হাবিলদার বাড়ি সেটা কেউ জানে না। শোনা যায়, কোনোকালে কোনো হাবিলদার সাহেব বেনামে এই মদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, কালক্রমে

কৃতজ্ঞ গ্রাহকবৃন্দ বেনামকে স্বনামে এনে দাঁড় করিয়েছেন।

এই হাবিলদারবাড়ি ঠেকের নিয়মিত খদ্দেরদের মধ্যে কয়েকটি দল আছে, তার একটি হলো বুড়ো শিবতলার নাচগানের একটি সমিতি। অবশ্য যাঁরা সন্ধ্যাবেলা এই দলের সঙ্গে বসে এই ঠেকে নেশা করেন তাঁরা সবাই এই ধার্মিক সংঘের লোক নয়। সমিতিটির পোশাকি নাম নামব্রত সঙ্ঘ।

মদের দোকানটির উত্তর সীমান্তে ডানদিক ঘেঁষে মুখোমুখি দুটো লম্বা বেঞ্চে সঙ্ঘের রাজত্ব। মধ্যে কোনো টেবিল নেই। বেঞ্চের নিচে বোতল, জল ইত্যাদি এবং সুরাপাত্র সামনের বেঞ্চের লোকটির পাশেই রাখা নিয়ম। এ-তো আর বিলিতি মদের বার নয়, সাহেবি ক্লাসও নয়। তবে অসুবিধা হয় শনিবার সন্ধ্যাবেলা, রবিবার দুপুরে। ভিড় উপচিয়ে পড়ে। হাবিলদার বাড়ি মাতালের ভিড়ে গিজগিজ করে। হই হট্টগোলে গমগম করে, মদ-চাট-ঘামের গন্ধে থই থই করে।

এই ঠেকে বুড়ো শিবতলা নামব্রত সঙ্ঘের নিয়মিত সদস্যের সংখ্যা পাঁচ-ছয় জন। কিন্তু শনি-রবিবারে পনেরো বিশজনে পৌঁছে যায়। হই হই কাণ্ড হয়।

'নামব্রত সঙ্ঘ' এই নাম শুনে যদি কারো মনে ধারণা হয় যে সমিতিটি সাম্প্রদায়িক তা হলে তিনি ভুল করবেন। সাম্প্রদায়িক কেন, সঙ্ঘটি ধার্মিকও বোধহয় নয়।

সঙ্ঘের প্রাণপুরুষ হলো মিস্টার ডেভিড পাল, সাতপুরুষ কিংবা ততোধিক পুরুষ ধরে তালতলাবাসী এবং অ্যাংলো। তবে ডেভিডের জীবনের আরো একটা দিক আছে। ডেভিড তার সংক্ষেপিত নাম। তার আসল নাম দেবীদয়াল, দেবীদয়াল থেকে ডেভিড হয়েছে।

দেবীদয়াল নামটা তাঁর ঠাকুমা রেখেছিলেন, তিনি ছিলেন ঘোর বোষ্টমী। কাটোয়ার ছোট লাইনে রেলগাড়ির গার্ডসাহেব ছিলেন ডেভিডের পিতামহ। ওখান থেকেই ডেভিডের ঠাকুমাকে তিনি বিয়ে করে নিয়ে আসেন। খ্রীস্টান সংসারেও মহিলা তাঁর বোষ্টমী সত্তা রক্ষা করেছিলেন। কপালে চন্দনের রসকলি এঁকে স্বামীর সঙ্গে গির্জায় যেতেন, পালা পার্বণে, রবিবার। 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ' করে খাটিয়ায় তুলে মৃত্যুর পরে তাঁকে কবর দেয়া হয়েছিলো।

ডেভিড বেশ লম্বা, গায়ের রঙ ফর্সা। ইংরেজি বলতে-কইতে পারে। নিউ মার্কেটে একটা বড় সুতোর দোকানে কাজ করে, হেড সেলসম্যান। শীতের দিনে কোট-প্যান্ট, টাই পরে, বড়দিনে ইস্টারে সপরিবারে গির্জায় যায়। তবে তার প্রধান দুর্বলতা সে পেয়েছে তার ঠাকুরমার কাছ থেকে, সে একজন কীর্তনিয়া, নামগান সঙ্ঘের মূল স্তম্ভ।

কিন্তু এই মূল স্তম্ভটি মাঝেমধ্যেই হেলেদুলে যায়। তার কারণ ঐ কারণবারি বা মদ।

ডেভিড একেক সময় মদ খাওয়া ছেড়ে দেয়, হাবিলদারবাড়িতে তাকে আর দেখা যায় না, বেশ কয়েক দিন, এমন কি কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত বেপাত্তা হয়ে যায়। নামব্রত সঙ্ঘের সহশিল্পীরা তার নাম খোঁজ পায় না।

অবশ্য এ জন্যে ডেভিডকে খুব একটা দোষ দেওয়া যায় না। মদ্যপানে তার

উৎসাহের কোনো অভাব কখনোই হয় না। সে ইচ্ছে করে হাবিলদার বাড়িতে আসে না তা নয়, তার আসা হয় না। তার আসাব উপায় থাকে না তার ধর্মপত্নী জারিনার জন্যে।

জারিনার কথা কম করে বা বেশি করে, বাড়িয়ে বা কমিয়ে বলা যাবে না। তার কোনো প্রয়োজন নেই। খুব বেশি বলার দরকারও নেই।

আশেপাশের বাড়ি ঘরে, পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে জারিনাকে সবাই সুল্পবিস্তর দেখেছেন, তাকে সবাই হাড়ে হাড়ে চেনেন।

জারিনার প্রতাপে জগৎ সংসার তটস্থ, স্বামী বেচারা ডেভিড তো তুচ্ছাতিতুচ্ছ। এমনকি হাবিলদারবাড়ি নামক প্রবল পরাক্রান্ত দিশি মদের ঠেকের দুঃসাহসী মদ্যপদের পা ঠকঠক করে কাঁপে জারিনার নাম শুনলে।

বলা বাহুল্য, মিঃ ডেভিড পালকে উদ্ধারকল্পে মিসেস জারিনা পাল বহুবারই হানা দিয়েছে হাবিলদার বাড়ির নৈশ ঠেকে এবং সেই সব রাতে সেখানে একই সঙ্গে রামরাবণের যুদ্ধ, কুরুক্ষেত্র এবং দক্ষযজ্ঞ হয়ে গেছে। কিংবা পূর্বাপর বিবেচনা করে বলা যেতে পারে দনুজদলনীব মহিষাসুর বধ পালা মঞ্চস্থ হয়েছে।

মদের ওপর, জারিনা বিবির একটা জাতক্রোধ আছে, (অজাতক্রোধও বলা যায়), কারণ তাঁর বাবা জুয়েল মণ্ডল খিদিরপুরে 'ওভারসিজ বেকারিজ অ্যান্ড প্রভিসন্স' কারখানার সহকারী প্রধান পাউরুটি তৈরির কারিগর ছিলেন। জনিসাহেব নামে তাঁর এক মদ্যপ সহকারী বন্ধুর সঙ্গে এক শীতার্ত বড়দিনের প্রভাতে বহু রুটি এবং বহুতর কেক তৈরি করতে করতে জুয়েলকারিগর উক্ত বন্ধুর প্ররোচনায় কেক ও রুটি তৈরির ইস্ট বা শর্করার গাদ দুই গামলা পান করেন। তাড়াতাড়ি সম্ভব হয়নি, ঘণ্টা দুয়েক লেগেছিলো। পুরোটা পেয় ছিলো না, চর্ব না হলেও অনেকাংশ চোষ্য এবং লেহ্য ছিলো, চুষে এবং চেটে খেতে হয়েছে।

পরিণাম ভালো হয়নি। জুয়েল মণ্ডল ঐ সপ্তাহেই নববর্ষের দিন সকালে দেহত্যাগ করেন। জারিনা তখন মাতৃগর্ভে। জারিনা জন্মইস্তক রিষড়ায় তার মাতুলালয়ে মানুষ হয়েছে এবং আজন্ম মদ্যপ পিতার কীর্তিকলাপের খোঁটা শুনে এসেছে। সুতরাং স্বামীর ওপরে সে পরবর্তীকালে প্রতিশোধ নেবে, বিশেষত মদ্যপানের ব্যাপারে, এটা স্বতঃসিদ্ধ।

তবে জারিনাবিবির লাজ-লজ্জা, সম্ভ্রমবোধ আছে। নিতান্ত আপারগ না হলে বিবি হাবিলদার বাড়িতে হানা দিতো না।

ডেভিডের নামচক্র সঙেঘর সাঙাতেরা, অনাদি, অনন্ত, অনিল, অক্ষয়—এরা সবাই জানে আসল দোষী ডেভিড ওরফে দেবীদয়াল ওরফে অমর।

এখানে বলে রাখা ভালো নামচক্রের সকলেরই নতুন নাম। শুধু নামগানের সময় নয় হাবিলদার বাড়ির ঠেকেও সেই নামই চালু। ডেভিড যেমন অমর, গদা মিস্ত্রি হলো অনাদি, ছিমন্ত হলো অনন্ত এবং শেষমেশ বাদলচন্দ্র হলো অক্ষয়।

নামচক্রে বাদলচন্দ্রই সবচেয়ে ধর্মপ্রাণ, তার পূর্ব ইতিহাসও খুব সেকুলার।

এগারো-বারো বছর বয়েসে ভারত-বাংলাদেশ একাকার হয়ে যাওয়া এক বন্যায় সে পদ্মা পেরিয়ে রাজশাহী থেকে মুর্শিদাবাদে ভেসে গিয়েছিলো। সেটা সেই পাতাল রেলের কলকাতার ময়দান খোঁড়ার যুগ। আজিমগঞ্জের পাশে ভাগীরথী পারের গ্রামের রহমতুল্লা ছিলেন পাতাল রেলের লেবার কনট্রাক্টর। বন্যায় ভাসমান এই কিশোরকে তিনি উদ্ধার করেন, এবং তাকে পাতাল রেলের গর্ত খোঁড়ার কাজে কলকাতায় নিয়ে আসেন।

এ গল্পে বাদলচন্দ্রের কাহিনীর স্থান নেই। আমরা এখন ডেভিড এবং জরিনা বিবির কেচ্ছায় ফিরে যাচ্ছি। এবার নয়, যথাসময়ে বাদলচন্দ্র ওরফে অক্ষয়ের সঙ্গে দেখা হবে।

ডেভিড ঠিক সংসারী টাইপের লোক নয়। তার হয়তো বিয়ে করাই উচিত হয়নি। সে অবশ্য বলে যে, 'আমি তো বিয়ে করিনি। জারিনা আমাকে বিয়ে করেছে।'

ডেভিডের প্রধান দোষ ছিলো সে মাইনে পাওয়ার পর তিন-চারদিন বেপাত্তা হয়ে যেতো। তারপর সব টাকা উড়িয়ে বাড়ি ফিরতো। কোনো সংসারই এ জিনিস বরদাস্ত করতে পারে না।

জারিনা বিবির কল্যাণে ডেভিডের এই দোষটি কিঞ্চিৎ সংশোধিত হয়েছে। হাবিলদার বাড়ির ঠেকে অতর্কিত আবির্ভূতা হয়ে জারিনা ডেভিডের টুঁটি চেপে বাড়ি নিয়ে যেতো, সেই সঙ্গে ইয়ার বন্ধুদের যার কাছে যা মালকড়ি আছে সেটাও হস্তগত করতো।

সে সময় ঝামেলার ভয়ে ডেভিড মাসের প্রথম দিকে নামচক্রের আড্ডায় আসতো না। জারিনা বিবিও এসে তাকে খুঁজে পেতো না। জারিনা তখন বুদ্ধি করে ডেভিডের কর্মস্থলে মাসমাইনের দিনে সকাল সকাল গিয়ে উপস্থিত হতো। এ ছাড়াও জারিনা দোকানের প্রবীণ মালিককে অনুরোধ করে যেন সে না এলে কিংবা কখনো আগের দিন মাইনে দেওয়া হলে সেটা যেন ডেভিডকে না দেয়া হয়। প্রাজ্ঞ দোকানদার সেই অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন।

অবশ্য এই ঘটনার ফলে ডেভিডের যথেষ্ট সম্মানহানি হয়েছিলো। দোকানের এবং আশেপাশের দোকানের অন্য কর্মচারীদের কাছে মুখ দেখানো দুষ্কর হয়ে পড়ে। মনের দুঃখে সে মদ খাওয়া ছেড়ে দেয়।

মদ খাওয়া ছেড়ে দেওয়া খুব সোজা নয়। সব মাতালই কখনো না কখনো মদ খাওয়া ছেড়ে দেয়, আবার ধরে। আবার ছাড়ে, আবার ধরে। আরো জোর দিয়ে ধরে।

একই নিয়মে কয়েকদিন মদ খাওয়া ছেড়ে দেওয়ার পরে হঠাৎ করে ডেভিড আবার নামচক্রে চলে আসে। অধিকতর উদ্যমের সঙ্গে মদ্যপান, হইচই শুরু করে। হাবিলদার বাড়ির ঠেক বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরেও সে বাড়ি যেতে চায় না। আরো খাবে, আরো আরো খাবে।

এইরকম সময়ে বন্ধুরা অনেকেই তাকে বুঝে কিংবা না বুঝে তাল দেয় কিন্তু তারা সবাই ডেভিডের সঙ্গে যুঝে উঠতে পারে না। রাস্তায় বেরিয়ে করতালি সহযোগে

নামগানের সঙ্গে ডেভিড যখন 'হেলিয়া-দুলিয়া' নাচে, তারা তাল রাখতে গিয়ে রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ে যায়।

রাত বাড়ে। দায় বাড়ে নামব্রত সঙ্ঘের ঠাণ্ডামাথা সদস্যদের। তারা এভাবে ডেভিডকে রাস্তায় ফেলে যেতে পারে না।

* * *

এককালে কলকাতার ট্রাফিক পুলিশে মাতাল স্কোয়াড ছিলো। এক অ্যাংলো সার্জেন্ট সাহেব লাল মোটর সাইকেলে রাত সাড়ে দশটার পর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেন। কোথায় কোন্ মাতাল বাড়ি ফেরেনি, তাকে বাড়ি পাঠানোই তাঁর ডিউটি। সেই সার্জেন্ট সাহেব কলকাতার পানশালার একটি অনবদ্য গল্পে অমর হয়ে আছেন। (গল্পটা অন্যেরা লিখেছেন বা বলেছেন। আমার অন্য লেখায়ও সম্ভবত রয়েছে। তবু কাহিনীর খাতিরে আরেকবার উল্লেখ করা যেতে পারে।)

মোদো কলকাতার মধ্যে নিশা। চৌরাস্তার মোড়ে দুই মাতাল পরস্পরকে জাপটিয়ে ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বহুদূর থেকে এই দৃশ্য দেখে সার্জন্ট সাহেব তাঁর সেই লাল মোটর সাইকেল যুগ্মমদ্যপের পাশে দাঁড় করিয়ে বললেন, 'বাবুরা বাড়ি যাও। Go Home-এর পরে বিবিরা পেটাবে।'

সবাই চলে গেছেন। শুধু ঐ দু'জন দাঁড়িয়ে রইলেন, চুরচুর অবস্থায় দু'জনায় দু'জনকে পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ করে রাস্তায় মধ্যখানে সম্পূর্ণ নিশ্চল। সার্জেন্ট সাহেব তাঁর মোটর সাইকেল নিয়ে তাঁদের পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে জোর করতে লাগলেন বাড়ি যাওয়ার জন্যে। কিন্তু তাঁদের তো বাড়ি যাওয়ার উপায় নেই, তাঁদের বক্তব্য, 'United we stand, divided we fall' অর্থাৎ একত্রে জড়াজড়ি করি দাঁড়িয়ে থাকলেই তাঁরা আছে, ছাড়াছাড়ি হলেই পড়ে যাবেন। বাড়ি যাওয়ার উপায় কী?

মিস্টার ডেভিড ওরফে শ্রীযুক্ত দেবীদয়াল ওরফে অমরের সমস্যা অনেক জটিল। অধিক মদ্যপান করলে ডেভিডের কদাচিৎ পদস্খলন হয়, সে তখন উদ্বাহু নৃত্য করে।

আর সে বাড়ি যাবেই বা কেন? সেখানে জারিনা বিবির উদ্যত ঝাঁটা অপেক্ষা করছে।

বেচাল অবস্থায় রাত দুপুরে পাড়ার কুকুরদের বিচলিত না করে নিজের বেলায়ও নিঃশব্দ প্রবেশ খুব সহজ নয়। সুতরাং যত রাতই হোক জারিনা জেগে উঠবেই এবং তারপর ওরকম অভ্যর্থনা, ঝাঁটাপেটা এবং অনাহার ডেভিডের মোটেই পছন্দ নয়। সুতরাং সে নানা কারণেই বাড়ি ফিরতে চায় না।

নামব্রত সঙ্ঘের বন্ধুরা উদ্যোগ নিয়ে আগে দুয়েকবার ডেভিডকে বাড়ি পৌঁছে দিতে গেছে। কিন্তু তার পরিণতি সুখের হয়নি। অনাদি, অনন্তরা সেই বিভীষিকাময় স্মৃতি এখনো বহন করে চলেছে।

একবার বাদলচন্দ্র জারিনার কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে ডেভিডকে ঘরের মধ্যে ঢুকে একেবারে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আসার চেষ্টা করেছিলো। জারিনা ঘরের মধ্যে অন্ধকারে, নিঃশব্দে ওঁৎ পেতে ছিলো। সে মাতাল ও অসতর্ক কেরামতের কোমরে

আচমকা একটা হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে চোর-চোর বলে চেঁচাতে থাকে।

সঙ্গে সঙ্গে সেই ঘনবসতি ঘিঞ্জি ও হাফবস্তি অঞ্চলের বিভিন্ন বাড়িঘর থেকে পিল পিল করে লোক লাঠি-বল্লম-ভোজালি-চাবুক-হাতদা-বঁটি-দা ইত্যাদি নিয়ে রে রে করে বেরিয়ে আসে। পূর্বপুরুষদের বহু পুণ্যে সে যাত্রা বাদলচদন্দ্র মত্ত অবস্থাতেও আত্মপরিচয় দিয়ে নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছিলো। বলা বাহুল্য, নামব্রত সঙেঘর সহযোগী বন্ধু-বান্ধবেরা যারা সেদিন তার সঙ্গে ডেভিডকে বাড়ি পৌঁছতে গিয়েছিলো, দুর্যোগের আভাস পাওয়ামাত্রেই তারা দৌড়ে পালিয়েছিলো।

এখনো শীতে-বর্ষায় বাদলচন্দ্রের কোমরের গাঁটটা টনটন করে।

অবশ্য এর পরেও উপায়ান্তর না থাকায়, বন্ধুরা কখনো কখনো মধ্যরাতে কিংবা তারো পরে ডেভিডকে বাড়ি পৌঁছতে গেছে। কোনোবারই অভিজ্ঞতা মনোরম হয়নি। জারিনার কেমন যেন বদ্ধমূল ধারণা হয়ে যায় ডেভিডের পদস্খলনের জন্যে এরাই দায়ী। হিংস্র ভাষায় এবং হিংস্রতর ভঙ্গিতে সে এই বন্ধুবৎসল এবং হিংস্রতর ভঙ্গিতে সে এই বন্ধুবৎসল এবং পরোপকারী বন্ধুদের তাড়া করে যেতো। একবার 'ডাকাত ডাকাত' করে চেঁচিয়ে একরাত্রি তালতলা থানায় এদের হাজতবাসের ব্যবস্থাও করেছিলো।

সে যা হোক, এখন নামব্রত সঙেঘর সম্মুখে বিশাল সমস্যা। প্রত্যেকবার জন্মাষ্টমীর সময় তারা ঢোল-করতাল-কাঁসি সহযোগে নামগান করে পথ প্রদক্ষিণ করে। বলতে গেলে এটাই নামগান সঙেঘর বাৎসরিক প্রধান উৎসব।

এই উৎসব ডেভিডকে বাদ দিয়ে হতে পারে না। সবচেয়ে বড় খোলটা নিপুণ হাতে ডেভিড বাজায়। তার গানের গলাও খুবই সুরেলা। তাছাড়া দীর্ঘকায়, সুদর্শন, গৌরবর্ণ ডেভিড ওরফে দেবীদয়ালই নায়কেরই মত ওই শোভাযাত্রার নেতৃত্ব দেয়। তখন তার চন্দনচর্চিত ললাট, গলায় জুঁইফুলের মালা, সাদা অঙ্গবস্ত্র ইত্যাদি দেখে কে বলবে যে এই লোকটিই জুতোর দোকানের টাইপরা সেলসম্যান।

তা সেই ডেভিডেরই দেখা নেই এবং এবার বিরতি খুব দীর্ঘদিনের। দেড়-দুই মাস তো হবেই। হাবিলদারবাড়ির ঠেকে এত দীর্ঘদিন অনুপস্থিত ডেভিড কখনো হয়নি। কখনো কখনো বড়জোর তিন সপ্তাহ হয়েছে। কিন্তু এবার বিশেষ করে এই জন্মাষ্টমীর আগে ডেভিডের এত দীর্ঘকাল দেখা নেই, ভাবা যায় না।

শেষ যেদিন ডেভিড এসেছিলো, সেদিন অবশ্য বেশ গোলমাল হয়েছিলো। ডেভিডকে বাড়িতে পৌঁছতে যেতে হয়েছিলো, সেটাও রাত দেড়টা নাগাদ প্রায় চ্যাংদোলা করে। সেদিনও অভ্যর্থনা মোটেই সুখের হয়নি। ঘরে ঢোকা মাত্র ডেভিডকে এক ঝাপটায় মেঝেতে চিত করে ফেলে জারিনা বিবি জানলার সামনে এসে দাঁড়ায়। সেখান থেকে পরপর চিনেমাটির পেয়ালা ছোঁড়ে। অব্যর্থ লক্ষ্য তার, প্রথম দুটি অনন্ত এবং অমরের কপালে লাগে, অবস্থা বুঝে বাকি দু'জন দৌড় দেয়। কিন্তু রক্ষা পায় না। অনাদির ঘাড়ে এবং অসীমের পিঠে লাগে। সবাই অল্পবিস্তর আহত হয়, অমরের কপাল কেটে যায়, নীলরতনে গিয়ে দুটো সেলাই দিতে হয়েছিলো।

নামব্রত সঙ্ঘের ঠেকে বসে সবাই খুব চিন্তান্বিত। ক্যালেন্ডার দেখে হিসেব কষে বেরোলো আজ পঞ্চাশদিন ডেভিডের দেখা নেই।

এদিকে বার্ষিক উৎসবের সময় সমাগত। আর দেরি করা যায় না।

মদ্যপানে মানুষের মনে এক ধরনের অলীক সাহস সঞ্চয় হয়। রাত দশটার সময় হাবিলদারবাড়ির দোকান বন্ধ হলে রাস্তায় বেরিয়ে কিছুক্ষণ জটলা করে সবাই সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ঠিক করলো, ঐ দজ্জাল জারিনা বিবিকে ভয় পেলে চলবে না, আমাদের বৌয়েরাই বা ওর চেয়ে কম কিসে, ডেভিডের বাড়িতে আজ যেতেই হবে, ডেভিডকে ছাড়া তো আর নগর সঙ্কীর্তন হবে না।

কিন্তু ডেভিড কোথায়? এক মাস আগে ডেভিড মারা গেছে।

ঐ-রকম লম্বা-চওড়া, যুবক মানুষ সকালবেলা বাজারে গিয়ে বাজার থেকে ফিরে থলে নামিয়ে বৌয়ের কাছে এক গেলাস জল চাইলো। জল আর খাওয়া হয়নি। সামনে বিছানা ওপরে লুটিয়ে পড়ে। আধঘণ্টা পরে হাসপাতাল বলে 'হার্ট ফেল'।

এ খবর তো আর অনাদি-অনন্তদের কাছে পৌঁছয়নি। মাতালদের আড্ডায় এরকম হয়। একেক জন একেক প্রান্ত থেকে আসে। তার মধ্যে কেউ একদিন হঠাৎ বরবাদ হয়ে গেলে সে খবর আড্ডায় অন্যদের কাছে এসে পৌঁছায় না।

আজ বলতে গেলে একটু সকাল-সকালই এসেছে এরা। রাত এগারোটা। পাড়ার অনেক বাড়িতেই আলো জ্বলছে। লোকজন দাওয়ায়, ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আছে। এমন সময় চারমূর্তি গলির মধ্যে প্রবেশ করলো।

এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক সামনের বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে নৈশাহার শেষে রাস্তার কুকুরদের রুটি দিচ্ছিলেন। তিনি এদের দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা কোথা থেকে এসেছেন? কাকে চান?'

অনাদি বললো, 'আমরা ডেভিডের বন্ধু।'

অনন্ত বললো, 'আমরা ঐ সামনের বাড়ির ডেভিডের কাছে এসেছি।'

প্রৌঢ় ভদ্রলোক অবাক হয়ে বললেন, 'আপনার কিরকম বন্ধু? জানেন না একমাস হলো ডেভিড মারা গেছে।'

এই সংবাদে হতভম্ব হয়ে অনাদি-অনন্তেরা পিছু হটছিলো। তাদের মনের মধ্যে দুটো জিনিস কাজ করছিলো। একটা হলো বন্ধুর মৃত্যুর জন্য শোক এবং অন্যটা হলো জারিনা বিবির আক্রমণের মুখোমুখি হওয়ার থেকে নিষ্কৃতিজনিত স্বস্তি।

কিন্তু ইতিমধ্যে নিজের ঘরের জানালা দিয়ে এদের দেখে স্বয়ং জারিনা বিবি রাস্তায় নেমে এসেছে। এরা জারিনাকে দেখে দৌড় দিতে যাচ্ছিলো। কিন্তু রাস্তার নেড়ি কুকুরগুলো এদের পর্যবেক্ষণে রেখেছিলো এবং দৌড় দিলেই তাড়া করবে। বুঝতে পেরে, দ্রুত পা চালিয়ে পালাতে গেলো।

এদের ভাবগতিক দেখে জারিনা দ্রুতপদে এগিয়ে এলো, 'যাবেন না। আপনারা যাবেন না। আপনাদের কাছে আমার দরকার আছে।'

কিছুই বুঝতে না পেরে অনাদি-অনন্তরা দাঁড়িয়ে গেলো। তবে খুব ভয় পাওয়ার কিছু আছে বলে মনে হচ্ছে না। জারিনা বিবির চোখেমুখে চেহারায় রাগের ভাগ দেখা যাচ্ছে না।

জারিনা এদের ডেকে নিয়ে তার ঘরে বসালো। একপাশে একটা বড় খাট, তার ওপরে এক পাশে দুই পিতৃহীন নাবালক ঘুমোচ্ছে। এ পাশটায় জারিনা শোয়। সেখানে দু'জনে বসলো। আর দু'জন দুটো চেয়ারে বসলো, চেয়ার দুটো এবং খাটের মাঝখানে একটা ছোট গোল টেবিল।

জারিনা বললো, 'আপনারা একটু বসুন। আমি কতদিন ধরে আপনাদের কথা ভাবছি।' এই বলে সে টেবিলের দেরাজ থেকে একটা চাবি বার করে ঘরের এক পাশের সাবেকি দিনের বড় কাঠের আলমারিটা খুললো।

অনাদি ফিসফিস করে অনন্তকে বললো, 'পিস্তল-টিস্তল বার করছে বোধহয়।' অন্য দু'জনও মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো।

কিন্তু পিস্তল-টিস্তল নয়। জারিনার হাতে একটা বোতল, এক বোতল দু'নম্বর বাংলা মদ। মৃত্যুর দিন বাজার করার পথে কিনে এনেছিলো ডেভিড। যখন ঠেকে যেতো না, বাজার থেকে আসার সময় একেক দিন এইরকম কিনে আনতো।

বোতলটা অটুট রয়ে গেছে। জারিনা এসে বোতলটা টেবিলের ওপর রাখলো। তারপর পাশের রান্নাঘরে গিয়ে গোটা দুয়েক গেলাস আর তিনটে কাপ নিয়ে এলো।

চারজনের জন্যে পাঁচটা পাত্র। অনাদি ধরে নিলো জারিনাও খাবে। বোতলের ছিপিটা খুলতে খুলতে অনাদি মনে মনে বললো, 'শাবাশ জারিনা।'

বোতলটা খোলা হয়ে যেতেই জারিনা সেটা নিজের হাতে নিয়ে চারটে পাত্রে সমান করে ভাগ করে দিলো। আর পঞ্চম পাত্রে খুব কম ঢাললো।

ভদ্রতা করে অনন্ত বললো, আপনি নিজে এত কম নিলেন?'

জারিনা বললো, 'এটা আমার নয় ডেভিডের।'

চার পাত্র নিঃশেষ করে চার বন্ধু উঠে পড়লো। দরজা দিয়ে বেরোনোর সময় পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলো ডেভিডের পাত্রের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে জারিনা তাকিয়ে রয়েছে। তার চোখে জল।

হাতেখড়ি

পুরনো গড়িয়হাট বাজারের ভিতরে যেখানে আলুর আড়ত ছিলো তারই একেবারে পিছনদিকে ছিল শ্যামাদাসীর ঠেক। ঠেক মানে একটা বে-আইনি চুল্লুর দোকান। এ দোকানের কোনো দরজা-কপাট ছিল না।

সারা দিনরাতই খোলা। সারা দিনরাতই জমজমাট। গড়িয়াহাট মোড়ের এক কিলোমিটার বাসার্ধের মধ্যে চারপাশে দিনরাতে যত মাতাল দেখা যেত তার আধাআধি এই ঠেক থেকে বেরুতো।

গল্পের মধ্যে যাওয়ার আগে শ্যামাদাসী ও তার চুল্লুর একটু বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন।

এ প্রায় তিরিশ বছর আগেকার কথা। শ্যামাদাসীর বয়েস তখন পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন হবে। শক্ত পাকাটে চেহারা। গায়ের রং কালো কুচকুচে, সাদা ঝকঝকে দাঁত। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার এক গ্রাম থেকে সবজি বেচতে এসে সে কী করে চুল্লুর ঠেকওয়ালি হয়েছিল তার ইতিহাস উদ্ধার করা আর মহেঞ্জোদারোর শিলালিপি পাঠ করা প্রায় একই রকম কঠিন।

গাছকোমর করে কালো ফিতে-পাড় সাদা শাড়ি পরতো শ্যামাদাসী, সম্ভবত সে ছিলো বালবিধবা। দুর্দান্ত পরাক্রম ছিল তার, তার আদেশে চোরে-পুলিশে এক গেলাসে চুল্লু খেত।

চুল্লু নামে যে কুটির-শিল্পজাত বঙ্গীয় পানীয় নানা জায়গায় বিক্রি হয় সেটা একেক ঠেকে একেক রকম। কোথাও সেটা নেহাৎ দিশি চোলাই, সাইকেলের টিউবে বা ফুটবলের ব্লাডারে কোনো ঘাঁটি থেকে নিয়ে আসা হয়েছে।

কিন্তু শ্যামাদাসীর ঠেকের চুল্লুর জাত ছিল আলাদা। তার যেমন তেজ, তেমনি ঝাঁঝ। বাইরে থেকে আসতো না, শ্যামাদাসীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে তার ঠেকে সরাসরি

তৈরি হত সেটা। মাতালদের মুখে মুখে তার নামকরণ হয়েছিল শ্যামা চুল্লু। দু গেলাস খাওয়ার পরে জিব জড়িয়ে যেত, আলজিব থির থির করে কাঁপত, মাতালেরা আর শ্যামা চুল্লু বলতে পারত না, বলত 'ছেমাউল্লু'।

শ্যামাচুল্লু প্রস্তুতপ্রণালী ছিল যথেষ্ট সহজ। এক বালতি কর্পোরেশনের জল, এক টিন মেথিলেটেড স্পিরিট আর কয়েক কেজি কলিচুন। সঙ্গে সম্ভবত নিশাদল বা ঐজাতীয় রাসায়নিক দ্রব্য। প্রতি গেলাসের দাম ছিল আট আনা। সাধারণ গেলাস নয়, আজকাল আর সে রকম পেল্লায় সাইজের মহাভারতীয় কাচের গেলাস দেখতে পাওয়া যায় না। মোটা কাচের ভারি ওজনের রীতিমত তিনপোয়া আয়তনের সেই গেলাস শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্কেরাই এক হাতে ধরতে পারতো। শিশু বালক বা দুর্বল নারী-পুরুষের পক্ষে সে গেলাস দু-হাতে না ধরে উপায় নেই।

এই রকম একটা গেলাসে একটু কেমিক্যাল, একভাগ জল, একভাগ স্পিরিট আর একভাগ চুন—সব একসঙ্গে মেলালে প্রথমে ধোঁয়া বেরোবে, ফিকে নীল রঙের ঝাঁঝালো ধোঁয়া। তারপরে প্রচুর বুদ্বুদ এবং সেই সঙ্গে ফেনা আর ফেনা।

বেকুবের ঢালা বিয়ারের ফেনা যেমন কখনো কখনো গেলাস উপচিয়ে পড়ে, এ ফেনাও সেই রকম উপচিয়ে পড়ত, তবে কখনো কখনো নয়, সর্বদাই।

নীল ধোঁয়া মিলিয়ে যাওয়ার পরে প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে তেড়ে তেড়ে উঠে আসত বুদ্বুদ আর ফেনা। গেলাস উপচিয়ে শ্যামাদাসীর কাঠের পাটাতনের ওপরে ছ্যাঁক ছ্যাঁক করে পড়ত সেই গলিত বিষাক্ত তরল। সেই পাটাতনের সর্বত্র চাকা চাকা পোড়া দাগে ভরে গিয়েছিল।

প্রতি গেলাস চুল্লু আলাদাভাবে তৈরি করা হত। তারপরে লোহার জালের ছাঁকনি নিয়ে অন্য একটা গেলাসে ছাঁকা হত। তখন কাদা, ফেনা এসব বাদ দিয়ে প্রায় অর্ধেক গেলাস হত সেই পানীয়। যার দাম ছিল আট আনা। ভুলে গেলে চলবে না তখন এক প্যাকেট চারমিনার সিগারেটের দাম ছিল পুরনো সাত পয়সা, একসঙ্গে বড় দোকান থেকে পাঁচ প্যাকেট নিলে আট আনা।

সন্ধ্যার দিকে যখন চুল্লুর গ্রাহকদের খুব ভিড় বেড়ে যেত, ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়ে যেত, তখন আর ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নেবার অবসর হ'ত না। তখন গেলাসে গেলাসে সেই জলন্ত পানীয় তুলে দেয়া হ'ত গ্রাহকদের হাতে, গ্রাহকদের নিজ দায়িত্বে গেলাসের উপরিভাগের ফেনার অংশ এবং নিচে থিথিয়ে পড়া চুনটুকু ফেলে অত্যন্ত কৌশলে মধ্যভাগের পানীয়টুকু গলাধঃকরণ করতে হ'ত।

তিরিশ বছর। ঠিক তিন দশক আগের গল্প এটা।

বড়দিন।

২৫ ডিসেম্বর।

দুই বন্ধু জয়দেব আর মহিমাময় পার্ক স্ট্রিট, চৌরঙ্গী ইত্যাদি নানা অঞ্চলে ঘুরেফিরে রাত প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ গড়িয়াহাটের মোড়ে এসে পৌঁছলো।

দুই বন্ধুরই তখন অল্প বয়েস, বিশের কোঠার নিচের দিকে। যার যেটুকু

লেখাপড়ার ব্যাপারে ছিল. বেশ কিছুদিন হ'ল সে সব চুকিয়ে ফেলা হয়েছে। এখন চলছে দুঃসহ বেকারত্বের জীবন।

কিন্তু ঠিক নির্ভেজাল বেকারত্ব নয়।

মহিমাময় ভবানীপুরে গাঁজা পার্কের খুব কাছেই একটা আফিং, ভাং এবং গাঁজার দোকানে প্রতিদিন রাত আটটা থেকে সাড়ে আটটা পর্যন্ত আবগারির খাতা লেখে।

খুব কঠিন কাজ।

তখন গাঁজা ছিল দু রকমের—গাঁজা আর চরস। সেই সঙ্গে আরো বিক্রি হ'ত ভাং এবং আফিং।

চার রকম মাদকের চারটে রেজিস্টার ছিল। প্রত্যেক খাতায় দৈনিকের কি স্টক, কতটা বিক্রি, দিনের শেষে কত পরিমাণ কি জিনিস রইল। খুব ঝামেলার হিসেব, সামান্য একটু এদিক ওদিক হয়ে গেলে আবগারির দারোগা এসে ধরবে। আর সেই রোগা, শুঁটকো আবগারি সাবইন্সপেক্টরের সে কি ছিল হম্বিতম্বি। তোলা-ভরি-পুরিয়ার হিসেবে লাল পেন্সিল দিয়ে সই দেয়ার আগে নগদ দশ টাকা নিত আর 'কোমরে দড়ি বেঁধে ঘাড়ে ধাক্কা দিতে দিতে দিতে নিয়ে যাব' এই ধরনের খারাপ শাসানি দিতে থাকত।

সেসবে ভয় পেত না মহিমাময়। আসল অসুবিধে ছিল মাইনে নিয়ে। মহিমাময়ের আগে যে লোকটা খাতা লিখত সে ছিল এক রিটায়ার্ড কেরানী। তার টাকা-পয়সার দিকে খুব লোভ ছিল না। আসলে সে ছিল এক বদ্ধ গেঁজেল।

গাঁজার দোকানদার সেই রিটায়ার্ড কেরানীকে প্রতিদিন সন্ধ্যায় দু-ছিলিম গাঁজা সরবরাহ করত, আর সেই সঙ্গে পাশের মিষ্টান্ন ভাণ্ডার থেকে এক পোয়া গরম দুধ। গেঁজেলদের দুগ্ধ একান্ত আবশ্যক। কিন্তু এত দুধ খেয়েও কিন্তু সেই আগের ভদ্রলোক শেষরক্ষা করতে পারেন নি। একদিন সন্ধ্যায় গাঁজার কলকেতে মুখ দিয়ে একটা চোঁ চোঁ টান দিতেই চোখ উলটিয়ে পড়ে যান তারপর আর জ্ঞান ফেরেনি। দিনকয়েক পরে দেহত্যাগ করেন।

মহিমাময় তখন দু'বেলা ভাত খেত যতীন দাস পার্কের কাছে ভবসিন্ধু পাইস হোটেলে। সেখানে ঐ গাঁজার দোকানের এক কর্মচারীও খেতে আসত। তার সঙ্গে সামান্য মুখ-পরিচয় ছিল মহিমাময়ের।

কি যেন নাম ছিল সেই লোকটার, রসিকলাল, বোধহয় রসিকলালই হবে। সেই রসিকলালই খাতা লেখার প্রস্তাবটা দেয় মহিমাময়কে। দৈনিক সন্ধ্যাবেলা আধঘণ্টাখানেক মাত্র কাজ, আগের লোককে বিনিময়ে মাগনা গাঁজা আর দুধ দেয়া হ'ত।

রসিকলাল পরামর্শ দিল সন্ধ্যাবেলা কয়েক ছিলিম গাঁজা আর একটু দুধ খেলে রাতের মিলের খরচা বেঁচে যাবে, কোনো খাবার খেতে হবে না। হোটেলে শুধু দিনে একবেলা খেলেই হবে, তাতে মাসে অন্তত পনের-ষোল টাকা বাঁচবে, সেটাই বা কম কি!

একাধিক কারণে এই প্রস্তাবে আপত্তি ছিল মহিমাময়ের। গাঁজার দোকানে আবগারির খাতা লেখা, এত ছোট কাজ সে করে কি করে, পিরোজপুরের রায়চৌধুরী বাড়ির ছেলে সে। তার ধমনীতে বইছে নীল রক্ত। পিরোজপুরের বিখ্যাত মোক্তার ভুবনময় রায়চৌধুরীর সে পৌত্র। আজ পার্টিশন হয়েছে বলে তাকে পাইস হোটেলে খেতে হচ্ছে। তাই বলে গাঁজার হিসেব লেখা।

ভাগ্য বিপর্যয়ে মানুষ কত কি করে। না হয় গাঁজার খাতাই লিখতে হবে কিন্তু তার জন্যে গাঁজাও খেতে হবে। তাছাড়া মহিমাময়ের কাছে গাঁজার চেয়েও মারাত্মক হল দুধ। ছোটবেলায় জোর করে বাটি বাটি দুধ তাকে খাওয়ানো হয়েছে। আর সেই পিরোজপুরের ঘন ক্ষীরের মত দুধ, লালচে আভা তাতে। মিষ্টি স্বাদে ভরা সেই দুধ দিনের পর দিন খেয়ে খেয়ে আর খেয়ে মহিমাময়ের দুধ সম্পর্কে প্রচণ্ড অনীহা।

কিন্তু একটা কিছু করাও তো দরকার।

উত্তরাধিকারসূত্রে ভবানীপুরের একটা প্রাচীন তিনমহলা অট্টালিকার শেষ মহলের অর্ধেক অংশ সে পেয়েছে। তার মানে নিচে দেড়খানা আর ওপরে একখানা ঘর। নিচের সেই দেড়খানা ঘরে বারো টাকা ভাড়ার এক ঘর আদ্যিকালের ভাড়াটে। দোতলার ঘরটায় মাথা গোঁজার কাজ চলছে, কিন্তু ঐ একমাত্র বারো টাকা মাসিক আয়ে চালানো অসম্ভব।

অগত্যা বাধ্য হয়েই মহিমাময় গাঁজার দোকানে খাতা লেখার কাজ নিল। তবে গাঁজা দুধ নয়, নগদ টাকার বিনিময়ে। মাসে পনের টাকা।

মহিমায়ের তবু বারো আর পনের এই দুই মিলে মাসে সাতাশ টাকা বাঁধা আয়। তার মাসে দরকার অন্তত সত্তর-বাহাত্তর টাকা। হোটেল, চা-জলখাবার, খবরের কাগজ, ইলেকট্রিক বিল, যৎসামান্যই হাতখরচ, সব মিলে এর থেকে কমে কিছুতেই হতে চায় না।

থাকার মধ্যে আছে কিছু পুরনো কাঁসা পিতলের বাসন আর টুকরো-টাকরা কিছু সোনার গয়না। মহিমাময়ের ঠাকুমা রেখে গেছে মহিমাময়ের বৌয়ের জন্যে।

কোথায় বৌ? কিসের কি? নিজের খাওয়া-পরার সংস্থান নেই, এর মধ্যে বৌ আসবে কোথা থেকে?

সুতরাং সেই অবাস্তব সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দিয়ে, অনাগত বধূর বাসনকোসন, গয়নাগাটি প্রয়োজন অনুসারে বিক্রি করে বা বন্ধক দিয়ে মহিমাময়ের আপাতত চলে যাচ্ছিলো।

সে তুলনায় জয়দেবের অবস্থা কিন্তু ভয়াবহ। সে থাকে-খায় মামার বাড়িতে। কিছু জামাকাপড়ের, ধোপানাপিতের হাতখরচের পয়সা তো চাই।

শুধু এসব নয়। দামী দামী নেশা আরম্ভ করেছে জয়দেব। চোলাই, বাংলা, চুল্লু। হাতে পয়সা থাকলে বিলিতি থ্রি এক্স বা ড্রাই জিন। আর ওপরে উঠতে পারলে সাদা ঘোড়া, কালো কুকুর বা মাস্টারমশায় মার্কা আসল বিলাইতি, সোনালি পানীয়।

জয়দেবের অবশ্য এ ব্যাপারে কোনো বাদবিচার নেই। যখন যা হাতের কাছে

পেলো তাই সই।

এই হাতের কাছে পাওয়ার ব্যাপারটা শুধু পানীয় সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে নয়, পানীয়ের দাম সংগ্রহ করার ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য।

টুকটাক এদিক-ওদিক মামারবাড়ির জিনিসপত্র যখন যেটুকু সম্ভব জয়দেব সরিয়ে ফেলে এবং বেচে দেয়। পুরনো জিনিস বেচার ব্যাপারে তার মতো দক্ষ লোক জগৎ-সংসারে কোনো কালে পাওয়া যাবে না।

পুরনো পাপোশ কোথায় ভাল দামে বিক্রি হয়, রোঁয়া-ওঠা চল্লিশ বছরের ব্যবহৃত পারস্য গালিচা কারা কেনে, বাতিল হয়ে যাওয়া জং-ধরা ডি সি পাখার বাজার কোথায় রমরমা এসব জয়দেবের নখদর্পণে।

এমন কি চিৎপুরের একটা গলিতে পুরনো লেপ, কম্বল, সতরঞ্চি পর্যন্ত যে বিক্রি করা যায়, বৌবাজারের পিছনে একটা বিক্রিওলা পুরনো পাথরের থালাবাটি কেনে আর নিমু গোস্বামীর লেনে এক ভট্টাচার্য বুড়ো পুরনো পাঁজি এককেটা চার আনা দামে কেনে এসব ধীরে ধীরে জয়দেব জানতে পেরেছে।

এতদিন পর্যন্ত ভালোই চলছিলো কিন্তু যখন মামাবাড়ির এ্যালসেশিয়ান কুকুরের তিনটে বাচ্চা জয়দেব হাতিবাগান বাজারে গিয়ে এক রোববার দশ টাকা করে তিনটেকে তিরিশ টাকায় বেচে দিলো, তারপর তার পক্ষে আর মামার বাড়িতে থাকা সম্ভব হলো না। মামা-মামিরা বা মামাতো ভাইবোনেরা হয়তো এ নিয়ে তেমন কিছু বলতো না কিন্তু যে মাদী কুকুরটা এই বাচ্চা তিনটের মা সে ছিলো যেমন হিংস্র তেমনি প্রতিহিংসাপরায়ণ। সে কী করে বুঝতে পেরেছিলো জয়দেবই তার ছানাগুলিকে সরিয়েছে। বাচ্চাগুলিকে হাতিবাগানে বেচে দিন দুয়েক এদিক ওদিক ফুর্তি করে জয়দেব পরের মঙ্গলবার অনেক রাতে যখন মামাবাড়িতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করলো বিউটি নাম্নী সেই সারমেয় জননী মামাবাড়ির দরজা থেকে আধ মাইল রাস্তা তাকে তাড়িয়ে নিয়ে গেলো।

ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত এবং প্রভূত মত্ত অবস্থায় এর পরে সারাজীবন ধরে জয়দেব প্রচুর দৌড়েছে। সেই দীর্ঘ দৌড়যাত্রার হাতেখড়ি হয়েছিলো শ্রীমতী বিউটির কাছে।

খাঁটি জার্মান ব্যাভারিয়ান শেফার্ড বংশের গাঢ় নীল রক্ত ছিলো শ্রীমতী বিউটির ধমনীতে। সে চট করে কাউকে আক্রমণ করে না, শুধু তাড়া করে যায়। যখন কাছে পায় দাঁত দেখায়, নখ দেখায় কিন্তু ছিঁড়ে ফেলে না, হয়তো একটু আধটু ছোঁয়।

ছুটতে ছুটতে সেদিন জয়দেব তিন-চার বার ধরাশায়ী হয়েছিলো, প্রচুর খিদে এবং সুপ্রচুর তৃষ্ণার সেই অভাব তার স্বাভাবিক তুরঙ্গম গতি বার বার ব্যাহত করছিলো। কিন্তু শ্রীমতী বিউটি একবার তাকে বাগে পেয়ে ছিঁড়ে টুকরো করেনি। শুধু উদ্যত নখর, খরশান দন্তরাজি, লেলিহান জিহ্বা ইত্যাদি যথাসাধ্য প্রদর্শন করে জয়দেবের ওঠা এবং পুনরায় দৌড়ানো পর্যন্ত অপেক্ষা করেছে।

এবং তারপর আবার জয়দেবের দৌড়।

এবং তারপর আবার জয়দেবের আড়াই হাত পিছনে শাণিত জিহ্বা, কম্বুকণ্ঠী,

খরনখী শ্রীমতী বাভারিয়া সুন্দরীর ক্রমাগত আস্ফালন।

যে কোন মানুষ এর পরে হয় আত্মসমর্পণ করতে অথবা হার্টফেল হয়ে মরে যেতো।

কিন্তু আত্মসমর্পণ বা সনাতন হার্টফেল করার জন্য জয়দেব জন্মায়নি।

আধ মাইলের মাথায় নিমতলার মড়াখোঁচা কয়েকটি নেড়ি কুকুরকে শেষবার ধরাশায়ী হয়ে ওঠার মুহূর্তে সে লেলিয়ে দিলো বিউটির দিকে।

শ্রীমতী বিউটি পথ-লড়াই বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা. চোঁ চোঁ পালানো ছাড়া আর কিছু করার ছিলো না।

ফলে এযাত্রা জয়দেব রক্ষা পেলো। কিন্তু বিউটির ভয়ে মামাবাড়ির বারোয়ারি আশ্রয় তাকে ছাড়তে হলো। এমন কি দু-একটা পুরনো জামাকাপড়, একজোড়া প্রায় নতুন চটি. গামছা, টুথব্রাশ এই সব দৈনন্দিন ব্যবহারের টুকিটাকি জিনিস মামাবাড়িতে সব কিছুই পড়ে রইলো, সে আর সাহস পেলো না সেগুলো উদ্ধার করে আনতে যেতে।

কিন্তু কোথাও তো মাথা গুঁজতে হবে, রাতে শুতে হবে। তাছাড়া একটা কারণে জয়দেবের একটু ফাঁকা জায়গা লাগে। সে ছবি আঁকে। অল্প অল্প নাম করছে। শিল্পী জয়দেব পালের নাম তত বিখ্যাত না হলেও তখন বেশ ছড়াতে শুরু করেছে।

মনে রাখতে হবে পাকা তিরিশ বছর আগের ঘটনা এটা।

তখনো ভবঘুরে আর ধান্দাবাজেরা রেল স্টেশনের প্ল্যাটফর্মগুলোর স্বত্ব দখল করে নেয় নি।

বলা যায় যে জয়দেবই এ ব্যাপারে পথিকৃৎ। একেকদিন রাতে, অনেক রাতে মদ খেয়ে, অনেক মদ খেয়ে শেয়ালদা স্টেশনে ঢুকে পড়ে জয়দেব। কোনো অসুবিধা হয় না, কেউ আপত্তি করে না।

এটা অবশ্য নতুন কিছু নয়। এ ছাড়াও সে হাওড়া স্টেশনে, লেক গার্ডেন বাস টার্মিনাসের ডিপোতে, ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে, এমন কি একদিন রাজভবনে আর একদিন হাইকোর্টে সে মত্ত অবস্থায় অবলীলাক্রমে গভীর রাতে ঢুকেছে। কখনো কোনো অসুবিধে হয়নি।

শুধু হাইকোর্টে সিঁড়ি দিয়ে উঠে সন্তর্পণে যে ঘরে ঢুকে সে ঘুমিয়েছিলো সেটা ছিলো এক বদরাগী জজ সাহেবের এজলাশ। তাতে কিছু আসে যায় না, রাতের বেলা তো আর জজসাহেবের এজলাশ তখন বসে না।

কিন্তু পরের দিন সকালের জয়দেবের ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়ে যায়, অনেক বেলায় ঘুম থেকে উঠে সে যখন জজবাহাদুরের খাস কামরার বাথরুমে প্রাতঃকৃত্য করছিলো তখন বেলা সাড়ে দশটা। জজবাহাদুর এসে গেছেন, তিনি এজলাশে ওঠার আগে নিত্যনৈমিত্তিক অভ্যাসবশত বাথরুমের আয়নায় একটু চিরুনি চালিয়ে আ-কপাল বিস্তৃত টাকের সামান্য অঙ্গসজ্জা করতে গিয়ে দেখলেন ভেতর থেকে বন্ধ।

এর পরের ঘটনা মুদ্রিত অক্ষরে বিস্তৃত করা আদালত অবমাননার পর্যায়ে পড়বে।

বরং মত্ত জয়দেবের চিড়িয়াখানায় রাত সাড়ে তিনটের প্রবেশ করার গল্পটা অনেক নিরাপদ।

খিদিরপুর খালের চারপাশে আরব্য রজনীর পৃথিবী, সেখানে খারাপ-ভালো, সস্তা-দামী এমন কোনো সাকী ও সুরা জগৎসংসারে নেই যা পাওয়া যায় না।

সুখের কথা জয়দেবের সাকীঘটিত দুর্বলতা কস্মিনকালেও ছিলো না, সেই নবযৌবনেও না। তবে এবং সেই জন্যেই বোধহয় পরের দ্রব্যটি অর্থাৎ সুরার প্রতি তার টান ছিলো অদম্য এবং মাত্রাতিরিক্ত।

সে যা হোক, সেই সময়ে চিড়িয়াখানার উত্তরদিকের গেটের সামনেই মানে খিদিরপুরের খালধারে শতাব্দী প্রাচীন গরু-মোষের আন্তর্জাতিক হাট। আন্তর্জাতিক এই অর্থে যে যদিও তখনো বাংলাদেশ হয়নি, সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের চোরাচালানি গরুবাছুর, ভায়া দ্বারভাঙ্গা নেপালের মোষ, ভায়া কালিম্পং তিব্বতের চমরি ছাগল ইত্যাদি মাংসল জন্তু সেই সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানী উট এবং মুলতানী রামছাগল পর্যন্ত—এই সমস্ত জন্তুর মেলা বসতো সপ্তাহে একদিন।

হাটটা বসতো সপ্তাহের মাঝামাঝি। সজ্ঞানে কখনো জয়দেব মনে করতে পারতো না মঙ্গলবার নাকি বুধবার, একেক সময় ভাবতো নিশ্চয়ই শুক্রবার হবে, বেস্পতিবার বা সোমবার হতেই আপত্তি কি!

কিন্তু এসব চিন্তা ও প্রশ্ন সাদা চোখে। পেটে দু চার পাত্র পড়ার পরে জয়দেব অন্য মানুষ, যাকে বলে ত্রিকালজ্ঞ। তখন আর বার-তারিখ, তিথি-নক্ষত্র এগুলোর জন্যে অপেক্ষা করতে হয় না জয়দেবের, সে রক্তের স্পন্দনে টের পায় আজ অমুক জায়গায় দরজা খোলা, অমুক জায়গায় লেটনাইট পার্টি।

এই গোহাটার যে হাটবাবু অর্থাৎ সরকারী খাজনা আদায়কারী ছিলো, তার সঙ্গে জয়দেবের আলাপ হয়েছিলো ওয়েলেসলি স্ট্রিটের কুখ্যাত দিশি পানশালা খালাসিটোলায়। লোকটির নাম ছিলো খুব কাব্যময়—হৃদয় বৈরাগী।

পানশালায় আলাপ, আলাপ থেকে গভীর বন্ধুত্ব। প্রায় প্রতি হাটবারে রাত দশটার পরে হাটের ভিতরে চিড়িয়াখানার দেয়াল ঘেঁষে আসর বসাতো বৈরাগী। হইহই কাণ্ড। রাজস্থানী উটওয়ালা, দিনাজপুরী গরুর পাইকার, বিহারের ছাগল সম্রাট, জৌনপুরের বলদ শ্রেষ্ঠী কেনাবেচা শেষ করে বৈরাগীর আসরে শামিল হতো। সেই সঙ্গে এদিক-ওদিক, এপ্রান্ত-ওপ্রান্ত থেকে জয়দেবের মতো আরো দু-চারজন রসিক বন্ধুবান্ধব।

এক বর্ষার শেষরাতে, রাত প্রায় তিনটে সাড়ে তিনটে, ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে, পানীয় নিঃশেষিত, আড্ডাধারীরা সবাই ক্লান্ত ও স্তিমিত, এমন সময় রাজস্থানী উটওয়ালা বললো যে সে তার একটা পোষা উট বছরখানেক আগে কলকাতার, চিড়িয়াখানায় উপহার দিয়েছে, সেটা এখন কেমন আছে, তারা খুবই দেখতে ইচ্ছে করছে।

এই ইচ্ছের গভীর ব্যঞ্জনা জয়দেব ছাড়া কেউ বুঝতে পারেনি। জয়দেব উঠে

দাঁড়িয়ে বললো, 'তাহলে সিংজী চল যাই, দেখে আসি।'

যেমন কথা তেমন কাজ। অন্য মাতালেরা কেউ কিছু বোঝার আগে প্রথমে জয়দেব তারপরে সিংজী নিঃশব্দে দেয়াল ডিঙিয়ে চিড়িয়াখানার ভিতরে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

এর পর কী হয়েছিলো বলা খুব কঠিন। কেউ বলে ওরা দু'জনে জলহস্তীর ডেরায় গিয়ে পড়েছিলো, অন্যেরা হিসেব করে বলেছে তা নয়, ভালুকের খাঁচার ওপরে।

জয়দেব পরে বলেছিলো, দেয়াল টপকে ভালুকের খাঁচার উপরে পড়া সম্ভব নয় তবে সামনে পড়েছিলো।

কিন্তু আসল কথা হল তারা দুজনে পড়েছিল চিড়িয়াখানার এক অস্থায়ী অনতিপ্রৌঢ়া জমাদারনির দেয়াল-ঘেঁষা ঝুপড়ির বাঁশের চাল ভেঙে তার বিছানার ওপরে।

তারপরে চিৎকার, চেঁচামেচি, হইচই। যা কিছু হওয়া সম্ভব। চিড়িয়াখানার ভেতরে রাত্রিতে যে দু'চারজন লোক থাকে এদিক-ওদিক নানা কোয়ার্টারে, তারা ভাবলো বাঘ কিংবা সিংহ খাঁচা খুলে বেরিয়েছে। কেউ বললো একটা হাতি খেপে গিয়ে শিকল ছিঁড়ে ছুটছে।

জয়দেবের এই রকম সব বহুমুখী অভিজ্ঞতার কাছে মহিমাময় নিতান্ত শিশু।

আজ এই বড়দিনের উৎসবের রাতে জয়দেব প্রায় জোর করেই মহিমাময়কে নিয়ে বেরিয়েছে পানীয়ের পৃথিবীর সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্যে। এর আগে মহিমাময় একটু-আধটু পানীয় সৌখীনভাবে কখনো কখনো চোখে দেখেছে। সেও সুপরিবেশে দামী পানীয়। কিন্তু সেসব খেতেও তার মোটেই ভালো লাগেনি। কেমন তেতো-তেতো, ঝাঁঝওয়ালা স্বাদ।

আজো একটু আগেই সাহেবপাড়ায় পার্ক স্ট্রিটে জয়দেবের সঙ্গে একটা বারে গিয়েছিলো মহিমাময়। বড়দিনের বাজারে সেখানে ভীষণ ভিড়, হই-হুল্লোড় ঠেলাঠেলি। বহু কষ্টে ধাক্কাধাক্কি করে জয়দেব কাউন্টার থেকে দু গেলাস হুইস্কি সোডা সংগ্রহ করেছিলো, একটু দূরে কিঞ্চিৎ ফাঁকায় মহিমাময় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলো।

আসার পথে এক স্থূলকায়া মেমসাহেবের গুঁতো খেয়ে গেলাসসুদ্ধ জয়দেব উলটিয়ে গেলো। মেমসাহেবের মহার্ঘ্য গাউন প্লাবিত হয়ে গেলো দুই গেলাস মদে।

কোথায় দু গেলাস বৃথা গেলো বলে শোক করবে, সে জায়গায় উলটে মেমসাহেব জয়দেবের কলার চেপে ধরলো বদমায়েশি করে গাউন নষ্ট করে দেয়ার জন্যে। জয়দেব যত বোঝাতে চেষ্টা করে যে ক্ষতিটা তারই বেশি হয়েছে, এই দুর্দিনের বাজারে বহুকষ্টে আহরিতপাত্র দুর্মূল্য পানীয় লোকসান করে বদমায়েশি করার ক্ষমতা বা ইচ্ছে তার নেই, ততই মেমসাহেব 'শাটআপ' 'শাটআপ' বলে চেঁচাতে থাকে এবং সেই সঙ্গে মাঝে মাঝে জয়দেবকে 'স্কাউড্রেল' এবং 'রাস্কেল' বলে সম্বোধন করতে থাকে।

এ অবস্থায় কী করবে বুঝতে না পেরে দূরে দাঁড়িয়ে মহিমাময় ভয়ে ঠকঠক করে

কাঁপছিলো, এমন সময় বারের ম্যানেজার এসে জয়দেবকে উদ্ধার করলেন। জয়দেব এখানকার পুরনো এবং বাঁধা খদ্দের, তার হেনস্তা দেখে তিনি বাধ্য হয়ে এগিয়ে এসেছেন।

অবশ্য ম্যানেজার সাহেব যা করলেন তা কহতব্য নয়। মোটা মেমসাহেবের ঘাড় ধরে দরজার দিকে ঠেলে নিয়ে গেলেন, যেতে যেতে বললেন 'ফ্যাট গার্ল গো হোম, দিস ইস নট ইয়োর নাইট (Fat girl go home, this is not your night.) সরাসরি অর্থ হলো, 'মোটা মেয়ে বাড়ি যাও, এ রাত তোমার রাত নয়।'

মেমসাহেব কি বুঝে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে ম্যানেজার সাহেবের গালে চকাস করে একটা চুমু খেয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরে গাইতে লাগলেন, 'কে সারা সারা।'

জয়দেব কি ভাবলো কি ভাবলো না কে জানে, কিন্তু মহিমাময়ের এ ধরনের অভিজ্ঞতা এই প্রথম। তার মনে হলো দ্রুতপায়ে এখান থেকেসরে পড়াই ভালো। এবং এ কথা মনে হওয়ামাত্র সে বার থেকে ফুটপাতে গিয়ে নামলো।

ফুটপাথে তখন বড়দিনের সন্ধ্যা জমজমাট। রাত প্রায় আটটা বাজে। বারের ভেতরের থেকে ফুটপাতের ভিড় আরো বেশি। ভিড়টা চৌরঙ্গীর দিক থেকে সুতরাং মহিমাময় পার্ক স্ট্রিট ধরে পুবমুখী পার্কসার্কাসের দিকে হাঁটা শুরু করলো।

বেশিক্ষণ যেতে হলো না। এই ভিড় আর হই-হুল্লোড়ের গণ্ডগোলে জয়দেব একটু পরেই তাকে এসে ধরলো, 'কিরে, পালাচ্ছিস কোথায়?'

মহিমাময় বলেন, 'না পালিয়ে উপায় কী? ভিড়ে দমবন্ধ হয়ে মারা পড়বো নাকি?'

জয়দেব জিব দিয়ে একটু চুক চুক করে বললো, 'ভিড় তো ভালোই, শুধু এই বড়দিনের রাতে দু গেলাস হুইস্কি অদানে অব্রাহ্মণে গেলো, তারপর মেমসাহেবের গালাগাল খেলাম। আর সাহেবপাড়ায় নয়, চল বাঙালিপাড়ায় নিরিবিলিতে ফুর্তি করা যাক।

মহিমাময় জানাতে চাইলে, 'বাঙালিপাড়ায় আবার কোথায়?'

জয়দেব বললো, 'গড়িয়াহাটায় শ্যামাদাসীর ওখানে, চমৎকার জায়গা।'

এর আগে শ্যামাদাসীর নাম শোনেনি মহিমাময়, সে চমকিয়ে উঠলো, 'না না, ওসব খারাপ জায়গায় যাবো না।'

জয়দেব হাত তুলে আশ্বস্ত করলো, 'আরে না, কোনো খারাপ ব্যাপার নেই। মোটেই খারাপ জায়গা নয়। শ্যামাদাসীর খুব ডিসিপ্লিন। তাছাড়া দামে সস্তা এবং খাঁটি মাল। চোখের সামনে তৈরি করে দেয়।'

'খাঁটি মাল' শুনে খুব ভয় পেয়েছিলো মহিমাময়, তবে 'সামনে তৈরি করে দেয়' শুনে বুঝতে পারলো জয়দেব সুরা সম্পর্কে বলছে, সাকী সম্পর্কে নয়।

এতক্ষণে হাঁটতে হাঁটতে দুজনে লোয়ার সার্কুলার রোডের ট্রাম রাস্তায় এসে গেছে। এখানেও বড়দিনের জটলা, অধিকাংশ দিশি ফিরিঙ্গি আর অ্যাংলো ইন্ডিয়ান।

সামনের ফুটপাত থেকে দুটো রঙিন কাগজের টুপি কিনে জয়দেব নিজে একটা মাথায় দিলো আর একটা মহিমাময়কে দিলো। মহিমাময় অবশ্য সেটা মাথায় দিলো

না, রাস্তা দিয়ে একটা বাচ্চা ছেলে যাচ্ছিলো তার মাথায় পরিয়ে দিলো। জয়দেব সেদিকে দৃষ্টিপাত না করে তাড়াতাড়ি মহিমাময়ের হাত ধরে টানতে টানতে রাস্তার ওপারে ট্রাম স্টপে এলো।

উত্তর দিক থেকে একটা গড়িয়াহাটার ট্রাম আসছিলো, প্রায় ফাঁকা। দুজনে মিলে সেটায় উঠলো। তারপরে গড়িয়াহাটায় নেমে সোজা আলুর আড়তের পিছনে শ্যামাদাসীর ঠেক।

প্রিয় পাঠক মহোদয়, অনুগ্রহ করে একবার তিরিশ বছর পিছন ফিরে তাকান।

ঐখানে আলুর আড়তের ফাঁক দিয়ে দেখুন। কলঙ্কিত তক্তাপোষের ওপরে জয়দেব এবং মহিমাময় বসে আছে। আশেপাশে আরও দুচারজন। আগামী তিরিশ বছরের বর্ণোজ্জ্বল মাতাল জীবনে আজ মহিমাময়ের হাতেখড়ি। সামনে বড় কাচের গেলাসে টগবগ করে ফুটছে কড়া পানীয়, উচ্ছল ফেনা গেলাস থেকে চারপাশে গড়িয়ে পড়ছে, ছ্যাঁক, ছ্যাঁক করে শব্দ হচ্ছে।

একটু পরে গেলাসের উচ্ছ্বাস থেমে গেলো। নতুন খদ্দের দেখে শ্যামাদাসী নিজের হাতে ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে মহিমাময়ের হাতে একটা গেলাস এগিয়ে দিলো। কম্পিত হাতে গেলাসটা ধরে একটু ঠোঁটে ছোঁয়ালো মহিমাময় স্বাদ নেওয়ার জন্যে এবং সঙ্গে সঙ্গে টের পেলো যে শুকনো লঙ্কা সরষের সঙ্গে বেটে অ্যাসিডে মেশালে যে স্বাদ হবে সে এর চেয়ে অনেক নরম ও সুস্বাদু।

কিন্তু মুহূর্তের দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে এক হাতে নাক টিপে, চোখ বুজে এক নিঃশ্বাসে মহিমাময় সেই তরল গরল গলাধঃকরণ করলো। বন্ধুর এই কীর্তি দেখে জয়দেব হাততালি দিয়ে উঠলো। শ্যামাদাসীও অবাক হয়ে মহিমাময়ের দিকে তাকিয়ে রইলো, তার পোড়খাওয়া আসববৃত্তির দীর্ঘজীবনে এর আগে আর কাউকে দেখেনি, জীবনের প্রথম পানীয় বিশেষ করে এই এস্‌পেশাল চুল্লু এমন চোঁ-চোঁ করে এক টানে মেরে দিতে।

মহিমাময়ের নাক আর কান দিয়ে তখন গরম ধোঁয়া বেরোচ্ছে, গলায় আগুন জ্বলছে, পায়ের গোড়ালি থেকে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত ঝিমঝিম করছে, সে হঠাৎ দেখতে পেলো শ্যামাদাসী তাকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করছে, এবং একটু পরেই দেখলো শ্যামাদাসীকে হটিয়ে দিয়ে তার প্রাণের বন্ধু জয়দেব গড় হয়ে তার পায়ের ধূলি নিচ্ছে।
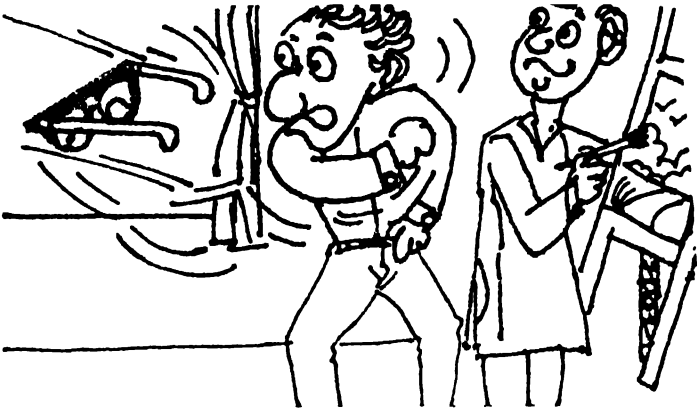
চশমা

এ কাহিনী জয়দেব ও মহিমাময়ের অল্প বয়েসের। তখনো তাবা মদ্যপ হিসেবে এত বিখ্যাত হয়নি। সন্ধ্যাবেলা হাজরার মোড়ে আমাদের একটা আড্ডা ছিলো, সেখানে প্রতি সন্ধ্যায় এদিক-ওদিক থেকে মদ খেয়ে এসে ঝামেলা বাধাতো। তখন তাদের নবীন যৌবন। তাদের দুজনেরই মাথায় ঢুকে গিয়েছিলো যে ছবি আঁকা ছবি এঁকে নাম করা সবচেয়ে সোজা এবং তার আনুষঙ্গিক হিসেবে প্রয়োজন রং, তুলি, ক্যানভাস এবং মদ্যপান।

মহিমা একটু বেশি, জয় একটু কম, কিন্তু দুজনেই অতিমাত্রায় আধুনিক। মহিমার যে-ছবিটি বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিলো, সেটি আরা কিছুই বুঝতে পারিনি। বিরাট ক্যানভাসে হলুদ রঙ মাখানো, নীচে তিনটে কালো দাগ পাশাপাশি! লাহিড়ি অবশ্য বোঝানোর চেষ্টা করেছিলো, এগুলি হলো পাপবোধ। জয় তর্ক করেছিলো. তাহলে লাইনগুলো উত্তর-দক্ষিণে না হয়ে পুবে-পশ্চিমে হওয়া উচিত ছিলো। এই তর্ক কোথায় শেষ হতো বলা যায় না, যদি না মজুমদারসাহেব যথাসময়ে অংশগ্রহণ করতেন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমরা পিকাসোতে পৌঁছে গেলুম। দক্ষিণ ফ্রান্সের এক মাঝারি জেলায় পিকাসো নামের চার রকম বানান হয়। পিকাসোর পিসেমশায় কলকাতায় ফ্রেঞ্চ ব্যাংকে দেড় বছর কাজ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর কলকাতার টিকটিকি দেখলে গা কেমন ঘুলিয়ে উঠতো, বাধ্য হয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁকে কলকাতা ছেড়ে যেতে হয়। দু-একবার মল্লিকমশায় কিসব প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু মল্লিকমশায় দৈনিক আড্ডায় আসতে পারেন না, তাই বোধহয় কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে তাই চুপ করে রইলেন।

কিন্তু কথায় কথায় মহিমা আর জয় খুব চটে গেলো, চটে গেলো বললে কম বলা হয়, ভয়ংকর ক্ষেপে গেলো বলা উচিত। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, জয়ের একটা বাজে

অভ্যাস আছে, মদ ছাড়াও সন্ধ্যাবেলায় একটু গাঁজা খায়, রাতের দিকে চোখ লাল থাকে, একটু ব্যোম-ব্যোম ভাব যাকে বলে। মহিমা ঠিক সেরকম নয় তবে সে কদাচিৎ স্নান করে। অনেকে বলে মাসে একদিন, মজুমদার সাহেবের মতে বছরে একদিন, সে-ও সেই দোল-পূর্ণিমার দিন গায়ের বঙ তোলার জন্যে। মোট কথা, দুজনেই একটু তিরিক্ষি মেজাজের। বিশেষত সন্ধ্যার পরে।

ঝগড়াটা লেগেছিল মজুমদার সাহেবেরই সঙ্গে। গঞ্জিকাসেবী বা মদোমাতাল তিনি কাউকে ভয় পেয়ে তর্কে রেহাই দেবেন, এমন পাত্র নন। আমি আর মল্লিকমশায় মৃদু মৃদু হাসছিলাম।

ঘরের মেঝেতে জল যেন গড়ায়, সেইরকম ঝগড়া গড়াতে লাগলো। কখনো খুব দ্রুতগতিতে, তারপর কোথাও কিছু নেই একটু থমকে, থাকে, কিছুক্ষণ আবার চুপচাপ, তারপর দুদিকে কেটে ছড়িয়ে পড়লো। একটা দিক খুব চিকন হয়ে ফুরিয়ে গেলো, মজুমদারসাহেব বনান জয় হঠাৎ সেখান থেকে একটা ধারা বেরিয়ে আগের মূল ধারার সঙ্গে জুড়ে তর্‌তর করে পাহাড়ী নদীর মতো ঝগড়া চললো জয় আর মহিমার মূল নায়কদের মধ্যে।

আধঘণ্টার মধ্যে জয় সম্বন্ধে আমরা এমন সব তথ্য শুনতে পেলাম মহিমার মুখে, আর মহিমা সম্বন্ধে জয়ের মুখে, যা ভাবাই যায় না, বহু গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে গেলো, দুজনের মধ্যেকার অনেক নিবিড় ষড়যন্ত্র। জয়ের যে 'গৃহপালিত কুকুর' ছবিটার আমি খুব প্রশংসা করি আসলে সেটা নাকি আমাকে নিয়েই আঁকা। (এতদিন পরে মনে পড়ছে, কুকুরটাকে দেখে আমার কেমন মায়া হয়েছিলো, কেমন যেন চেনা-চেনা মনে হয়েছিলো, কোথায় যেন অনেকবার দেখেছি, এখন কারণটা বোঝা গেলো।)

অন্যদিকে জয়ের মুখে জানা গেলো মহিমার পাপবোধ ছবিটা নাকি মল্লিক মশায়ের চরিত্র নিয়ে আঁকা। হলদে রঙ আর তিনটে কালো দাগের কী অর্থ তা এবার বেরুলো। তিনটে কালো দাগ তিনটি মহিলাকে বোঝাচ্ছে, আর তারা প্রত্যেকেই আমাদের অতি-পরিচিতা। তাদের সঙ্গে শান্তশিষ্ট, রসিকপ্রকৃতির মল্লিকমশায়ের এমন সরল সম্পর্ক থাকতে পারে আমরা কখনো ভাবতেই পারিনি।

জয় এবং মহিমা ক্রমশ গোপনতর তথ্য ফাঁসের দিকে উৎসাহ দেখতে লাগলো। জয় কেন প্রত্যেকদিন রাত্রি এগারোটায় বসুশ্রী সিনেমার উল্টোদিকের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে থাকে, তার মেজোমামা কি এক কুখ্যাত মামলায় ছ' বছর জেল খাটছে, তার ছোটবোন কেন প্রত্যেক সপ্তাহে বিরাটি যায়—সব জানাজানি হয়ে গেলো।

আর মহিমাই বা কী করে প্রাইজ পেয়েছিলো, মহিমার পায়ে যে সৌখিন লেডিস্ চপ্পল রয়েছে, তা মালিকান্ যে কে, সেটাও আমাদের জানতে হলো।

ইতিমধ্যে চৌমাথায় আমাদের চারদিকে ভিড় জমতে আরম্ভ করেছে। ঝগড়ার সুযোগে একটা ভিখিরী বেশ দু'পয়সা কামানোর চেষ্টা করতে লাগলো।

ঝগড়া করতে করতেই জয়দেব আর মহিমাময় মিনিট পনেরোর জন্যে হাজারা পার্কের পেছন দিকে চলে গেলো। তখনো হাজরা পার্ক পাতাল রেলের গুদাম হয়নি।

রাত আটটার পরে উত্তরের দিকটা একটা মুক্তবায়ু খাবারখানা হয়ে যেতো। চেঁচামেচি করে গলা শুকিয়ে গিয়েছিলো, একটু গলা ভিজিয়ে তারা আবার ফিরে এলো, ধীরে ধীরে রাত অনেক হয়ে গেলো কিন্তু দুজনের মধ্যে হাজার চেষ্টা করেও ঝগড়া থামানো গেলো না, আমরা তাদের পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলুম। ততক্ষণে দর্শকদের ভিড় আবার বেশ বেড়ে গেছে। একটা অকর্মাগোছের ট্রাফিক-পুলিশ ভাঙা বাংলায় কয়েকবার 'ক্যায়া হোতা হ্যায়, রাত বারো বাজ গিয়া' ইত্যাদি জানান দিয়ে দিয়ে অবশেষে উল্টোদিকের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে রাস্তায় লাঠি ঠুকতে লাগলো। আমি আর মল্লিকমশায় রাত বারোটার ঝগড়া দেখবার জন্যে এত লোক কোথায় থেকে জড়ো হয় এই বিষয়ে আলোচনা করতে করতে বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম।

শুধু মজুমদার সাহেব-ই রয়ে গেলেন। কোনোদিন কোন কলহই তিনি অর্ধসমাপ্ত রেখে যাননি, আজো তার কোনো ব্যতিক্রম হলো না। আমরা যেতে যেতে পিছন ফিরে দেখলাম মজুমদার সাহেব চৌমাথার পাশের রেলিং-এর ওপর বসে নির্বিকার সিগারেট টানছেন, নিচে ভিড়ের মধ্যে মহিমা আর জয়কে দেখা গেলো না কিন্তু তাদের উচ্চ, অশ্রাব্য কণ্ঠস্বর বহুদূর পর্যন্ত আমাদের কর্ণগোচর হতে লাগলো।

পরদিন নরমহাতের কড়া-নাড়ায় ঘুম ভাঙলো সাড়ে পাঁচটায়। একটু বিরক্ত হয়েই দরজা খুলেছিলাম। চার ঘণ্টাও ভালো করে ঘুমাইনি। খুলে দেখি মজুমদার-গৃহিণী, অসম্বৃত অলকাদাম, নিশিজাগরণে লোহিতা-লোচনা, প্রায় বাড়ির পোশাকে বাইরে চলে এসেছেন, এই আমার বাড়ি পর্যন্ত। মজুমদার-গৃহিণী নিজের বাড়ি থেকে এগারো মাইল দূরের এক মেয়েকলেজের মর্নিং সেক্‌শনে পড়ান, প্রতিদিন শেষরাত্রিতে গৃহত্যাগ করেন। সুতরাং এই ভোর সাড়ে পাঁচটা যে আমার মধ্যরাত্রি এতটা তিনি বোধহয় পূর্বে অনুমান করতে পারেননি।

সমস্ত বিরক্তি ঢেকে, আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম, 'কি সৌভাগ্য, প্রভাতে উঠিয়া ও মুখ—আসুন' ততক্ষণে বুঝতে পেরেছি মজুমদার সাহেব কাল রাত্রে বাড়ি ফেরেননি।

কিঞ্চিৎ শঙ্কা, কিঞ্চিৎ লজ্জাও বোধহয় মৃদু হাসির সঙ্গে মিশিয়ে একটা মোটামুটি সুসেব্য মিকশ্চার তৈরি করলেন মজুমদার-গৃহিণী, 'আপনার বন্ধু কাল রাত্রে আপনার এখানে ছিলেন না?'

আমি আমতা আমতা করে উত্তর দিতে যাচ্ছি, এমন সময় প্রায় উদ্ভ্রান্তের মতো মজুমদার সাহেব ঘরে ঢুকলেন। ঢুকেই কাল রাত্রের গৃহে অনুপস্থিতির জন্যে বিন্দুমাত্র লজ্জিত না হয়ে উল্টো গৃহিণীকে ধরলেন, 'তুমি এই সাতসকালে বাড়িতে তালা দিয়ে বেরিয়ে পড়েছো, আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে।' আমার কয়েক মাস আগের এক শীতের রাত্রির কথা মনে পড়লো। মজুমদার সাহেব যেদিন বাড়ির চাবি পকেটে করে আমার ঘরে রাত্রে থেকে গিয়েছিলেন, সেদিন মজুমদার-গৃহিণী কী করেছিলেন?

কিন্তু আজ একটা দাম্পত্য-কলহ প্রায় আমার ঘরের মধ্যেই লেগে গেলো। আমি মধ্যে পড়ে মজুমদার-গৃহিণীকে বিরত করতে চেষ্টা করলুম, 'চাকরটা আবার

নিরুদ্দেশ, সকালবেলায় বাড়িতে অতিথি এসেছেন, একটু চা খান, কেটলি স্টোভ সবই তো কোথায় আছে জানেন, দয়া করে একটু করে নিন।'

এইসব মুহূর্তে মজুমদার সাহেবের পত্নীপ্রেম দেখবার মতো, 'আমার স্ত্রী কেন আপনার বাড়িতে চা করবে? ভদ্রতা করতে হয় নিজে চা করে খাওয়ান!'

আমি আজকাল আর এসব কথায় অপমানিত হই না। চুপ করে রইলাম।

মজুমদার-গৃহিণী উঠে পাশের ঘরে চা করতে গেলেন। আমি মজুমদার সাহেবকে গতরাত্রের ঘটনা জিজ্ঞাসা করলাম। কিছুক্ষণ ফোঁস ফোঁস করে, তারপরে তিনি মুখ খুললেন, বিস্তৃত বিবরণ দিলেন সমস্ত ঘটনার। মজুমদার সাহেবের কথা শুনতে শুনতে এতক্ষণে লক্ষ্য করে দেখলাম ওঁর শরীরের উপর দিয়ে গতকাল রাত্রে যেন দুর্দান্ত তাণ্ডব বয়ে গেছে। ধুতির কোঁচা শতচ্ছিন্ন, কানের নিচে রক্তবর্ণ আঘাতের চিহ্ন, বাঁহাতের দুটো আঙুলে রক্তমাখা ন্যাকড়ার ফালি জড়ানো।

রাত একটার পর জয় আর মহিমা দুজনেই যেন ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। তখন আর মুখে মুখে নয়, হাতে হাতে। বিটের জমাদারের মুখ-চেনা ছিলো মজুমদারের, তাই থানা পুলিশ হয়নি। দুবার যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করতে মজুমদার সাহেব আহত হয়েছেন। একবার মহিমা ধাক্কা দিয়ে পার্কের রেলিং-এ ফেলে, দেয়, পরের বার রাস্তার এক পাগলা ভিখিরীর গায়ে। সেই পাগলা ভিখিরীটাকে আমরা সবাই চিনি, নিরীহ ঠাণ্ডা মেজাজের। কিন্তু হঠাৎ আচমকা ঘুম ভেঙে যাওয়ায় সে লাফিয়ে উঠে রাস্তা থেকে একটা ভাঙা বাঁশের টুকরো কুড়িয়ে তিনজনকেই বেধড়ক আক্রমণ করে। এতেই অবশ্য গোলমালের ফয়সালা হয়ে যায়। সেটা রাত তিনটের সময়। তারপর এতরাত্রে আমাকে আর বিরক্ত করবেন না স্থির করে মজুমদার একা পায়ে হেঁটে আহত ক্লান্ত অবস্থায় বাড়ি পৌঁছে দেখেন দুয়ার বন্ধ।

'কই, চা হতে এত দেরি হচ্ছে কেন?' মদুমদার সাহেব চীৎকার করে স্ত্রীকে তাগাদা দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ির নিচে শোনা গেলো, 'দু কাপ বেশি।' যেন কিছুই হয়নি এইরকম হাসিমুখে কালরাতের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী ঘরে ঢুকলেন পরস্পরের কাঁধে হাত দিয়ে, যেন গলায় গলায় ভাব—জয়দেব আর মহিমাময় এলো। জয়ের পায়ের দিকে ধুতির প্রায় তিন-চতুর্থাংশ অন্তর্হিত, কাঁধে জামার কলার বলতেও প্রায় কিছুই নেই, কলারের নিচে পিঠের দিকে আধাআধিভাবে ছেঁড়া, একটা ফালি তেকোনা নিশানের মত উড়ছে। মহিমের তেমন মারাত্মক নয়, তার হাওয়াই শার্টের একটা হাতাই যা শুধু নেই আর খালি পা। তা ছাড়া দুজনেই ক্রমাগত চোখ পিটপিট করছে, দুজনেই চশমাধারী, কিন্তু আজ কারোর চোখেই চশমা নেই, উভয়েই উদ্ভ্রান্ত-দর্শন।

কাল রাত্রির ঘটনায় দুজনেই যথেষ্ট লজ্জিত। ব্যাপারটা একেবারেই যে ছেলেমানুষি হয়ে গেছে এটা প্রায় আমরা একমত হলুম, মজুমদারসাহেব বাদে। মজুমদারসাহেব ঐ ঘটনার মধ্যে শুভ্রচৈতন্য এবং মহৎ আত্মাভিমান বোধের আদর্শ আবিষ্কার করেছিলেন। সমস্ত বিষয়ে অনুধাবন করতে শ্রীমতী মজুমদারের বোধহয়

একটু সময় লাগলো। চা খেতে খেতে প্রথম কয়েক মিনিট তিনি স্থির হয়ে স্বীয় স্বামী এবং জয় ও মহিমাকে পর্যবেক্ষণ করলেন এবং তারপর উদাসদৃষ্টিতে জানলার বাইরে তাকিয়ে রইলেন, মুখে কোথায় একটা অনির্দিষ্ট বঙ্কিম হাসি।

'শেষে তোমাদের দুজনেরই চশমা হারালো?' আমি জিজ্ঞেসা করলাম।

জয় বা মহিমা কিছু উত্তর দেয়ার আগে মজুমদারসাহেব বললেন, 'কিন্তু জয়ের চোখে তো শেষ পর্যন্ত চশমা ছিলো, মহিমারটাই তো হাজরা পার্কে হারালো।'

জয় বললো, 'আমার তো ছিলো চোখে যতদূর মনে পড়ে, তবে যা ব্যাপার, ভোরবেলা উঠে দেখছি না, বোধহয় সেইসময় কোথাও পড়ে গেছে। হাতে একটা পয়সা নেই, এখন চশমা তৈরি করি কী দিয়ে?'

'কী আর করা যেতে পারে!', মহিমা উদাসীন ভাবে জানালো, 'ওকাকু নামে সেই জার্মানিসাহেব একটা ছবি নেবে বলেছিলো, তা সে তো দিল্লী থেকে ফিরছে না, ততদিন অন্ধ হয়েই থাকতে হবে।'

'চোখে না দেখতে পেলে কি আপনাদের ছবি আঁকার খুব অসুবিধে হয়?' হঠাৎ মজুমদারগৃহিণী প্রশ্ন করে বসলেন।

মজুমদারসাহেব ফোঁস করে উঠলেন, 'তুমি চুপ কর তো, এর মধ্যে তুমি আবার কথা বলছো কেন?'

একটু পরে জয় উঠলো। তার সঙ্গে মহিমাও উঠলো। মিনিট দশেক পরে ফিরে এলো একা মহিমা, এবার তার চোখে চশমা।

'এ চশমা তুমি কোথায় পেলে?' মজুমদারসাহেব লাফিয়ে উঠলেন।

মহিমা মৃদু হেসে বললেন, 'আমার পকেটে ছিলো, সিগারেট বের করতে গিয়ে দেখি রয়ে গেছে।'

'কিন্তু এ চশমা তো তোমার নয়।' মজুমদারসাহেব বললেন।

মহিমা কেমন আমতা আমতা করতে লাগলো, 'কিন্তু এটা তো আমারই বলে মনে হচ্ছে।'

'অসম্ভব।' মজুমদারসাহেবের সাফ্ জবাব, 'তোমার চশমা কালো মোটা লাইব্রেরি ফ্রেমের, আমার সঙ্গে গিয়ে কিনেছিলে। এটা জয়ের।'

'তোমাদের দুজনের কি একই পাওয়ার চশমার? কী করে তোমার চোখে জয়ের চশমা লাগছে?' আমি প্রশ্ন করি।

মহিম প্রথম প্রশ্ন এড়িয়ে গেলো, দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে যা বললো তার সারাংশ এইরকম। যখন চোখে চশমা থাকে তখন তো আর চশমা দেখতে পাই না, আর যখন থাকে না তখন তো চোখেই দেখতে পাই না। নিজের চশমা চেনা অসম্ভব।

এই যুক্তি অনস্বীকার্য, কিন্তু একই চশমা দুজনের হলো কী করে?

মজুমদারসাহেব গৃহিণীকে বললেন, 'তুমি বাড়ি যাও, আমি আসছি।' তারপর আমাকে বললেন, 'আপনি আসুন, মহিমাকে নিয়ে জয়ের ওখানে যাই,—দেখি জয়ের চশমার কী হোল?'

ব্যাপারটা একটু বেশি গোলমেলে, কিন্তু আমাকেও উঠতে হলো। জয়ের ওখানে গিয়ে দেখলুম সে খালিচোখেই পিটপিট করতে করতে ছবি আঁকছে।

'এই চশমাটা কার?' মহিমার চোখ থেকে চশমাটা খুলে জয়ের চোখের সামনে তুলে ধরলেন মজুমদারসাহেব।

'কী করে বলি?' যেন ঈশ্বর বিষয়ে কোনো প্রশ্ন করা হয়েছে এই রকম নির্লিপ্ত ভাবে ছবি আঁকতে আঁকতে জয় উত্তর দিল।

'আশ্চর্য!' মজুমদারসাহেব ভীষণ বিরক্তির সঙ্গে হাতের চশমাটা জানালা দিয়ে তিনতলার বাইরের আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিলেন।

'তোমার খালি চোখে কোনো অসুবিধাই হচ্ছে না, আর এর অন্যের চশমা চোখে দিয়েও কোনো অসুবিধাই হচ্ছে না! যত সব বুজরুকি! এর পরে যদি কারোর চোখে চশমা দেখি চোখে গেলে দেবো!' মজুমদারসাহেব আমাকে সঙ্গে নিয়ে গজ্‌গজ্‌ করতে করতে বেরিয়ে এলেন।

তারপর থেকে জয় আর মহিমা কারো চোখেই চশমা নেই। আর কি এক অজ্ঞাত কারণে দুজনেরই নতুন ছবিগুলি খুব সরল আর বোধ্য হয়ে উঠলো এবং শেষ পর্যন্ত এতই সরল হয়ে গেলো যে তারা ছবি আঁকা ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো।
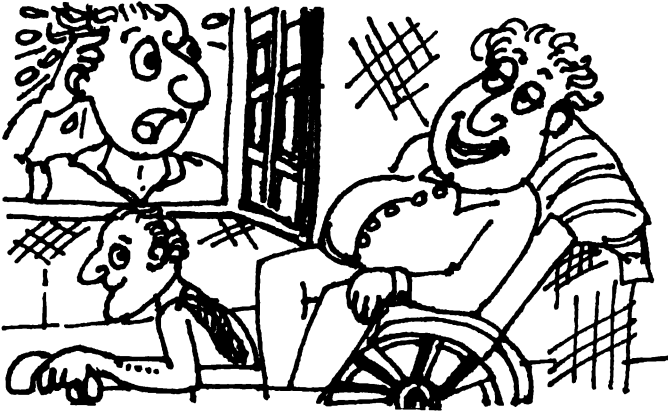
জয়দেবের জীবনযাত্রা

রাত পৌনে দশটার সময় এল জয়দেব। একটু আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, রাস্তায় হাল্কা জল জমেছে। দুদিন ভরা গুমোটের পর আজ একটু বৃষ্টি হল। তবে আরও বোধহয় হবে, আকাশে মেঘ থমথম করছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, বাতাসও বেশ জোরালো।

একপশলা বৃষ্টিতে রাস্তায় জল জমেছে, রাতে যদি আরও বৃষ্টি হয় কাল সকালে রাস্তায় অনেক জল থাকবে, দু'আনা, বাজার করা—কাল সকালের হাঙ্গামাগুলো ভাবতে লাগলেন মহিমাময়।

গুমোট কেটে গিয়ে জোলো বাতাসে একটা আরামের ভাব। সেইসঙ্গে কাল সকালের চিন্তা—জয়দেবের কথা প্রায় ভুলতেই বসেছিলেন মহিমাময়।

দুপুরে অফিসে এসেছিলেন জয়দেব। চোখ লাল, এলোমেলো চুল, হাত পা টলমল, ভরদুপুরেই নেশা করেছেন। এসে দাঁড়াননি, বিশেষ বিরক্তও করেননি, শুধু বলেছিলেন, 'কাজের কথা আছে। এখানে হবে না, সন্ধ্যাবেলায় বাসায় থাকিস, যাব।'

তা জয়দেব বলুন আর না বলুন, সন্ধ্যাবেলা মহিমাময় এমনিতেই কোথাও যান না। অফিস থেকে বেরিয়ে সোজা বাসায় চলে আসেন, বাসায়ই থাকেন।

আজও বাসায়ই ছিলেন মহিমাময়। জয়দেব আসবে বলেছে, সাধারণত নেশার মধ্যে কেউ কিছু বললে, যতক্ষণ নেশার ঘোর মাথার মধ্যে থাকে কথাটা তার মাথায় থাকে। সুরতাং জয়দেবেরও থাকতে পারে, এরকম একটা আশংকা সন্ধ্যা থেকেই মহিমাময় করছিলেন। কাজের কথা না কি বলবে জয়দেব, সেটা অবশ্য ধর্তব্যের মধ্যে নয়, তার পুরনো বন্ধু আসবে বলেছে, আসুক।

আলমারির পেছনে কয়েকটা আধ-খাওয়া মদের বোতল আছে। ধুলো ঝেড়ে সেগুলো বার করেছেন মহিমাময়, মদ পচে যায় না বরং যত পুরনো হয় ততই তার

স্বাদ বাড়ে, জোর বাড়ে।

আগে মহিমাময় মদ খেতেন প্রায় প্রত্যেক সন্ধ্যাবেলা বাসায় বসে একা একা। এখন আর খুব একটা খান না। সন্ধ্যাবেলা খুব খিদে পায়। অফিস থেকে ফিরে তাই তাড়াতাড়ি ভাত খেয়ে নেন। তারপর আর মদ খেতে ইচ্ছে করে না, আর তাছাড়া ভরপেট খেলেই মহিমাময়ের ঘুম পায়। তিনি শুয়ে পড়েন এবং ঘুমিয়ে পড়েন।

আজ জয়দেব আসবে বলে খুঁজে খুঁজে আলমারির পিছন থেকে তিনটে বোতল বেরিয়েছে। একটার মধ্যে অল্প একটু জিন আছে, সেটা রাতের বেলায় চলবে না। মদ ব্যাপারটা ফুলের ঠিক উলটো। কথাটা কোথায় যেন শুনেছিলেন মহিমাময়। সাদা ফুল ফোটে রাতের বেলায় আর দিনের বেলায় রঙিন ফুল। কিন্তু মদের বেলায় দিনে সাদা মদ, জিন, ভদকা ইত্যাদি, আর রাতে রঙিন মদ হুইস্কি, রাম, ব্র্যান্ডি। এটাই হলো নিয়ম। এ নিয়ম যে মানতেই হবে এমন কোন কথা নেই, কিন্তু মোটামুটি সবরকম মদ্যপই এই নিয়মটা মান্য করে। কেন করে কে জানে?

সে যা হোক, মহিমাময় জিনের বোতলটা আবার আলমারির পিছনে রেখে দিলেন। বাকি দুটো বোতলের একটায় সামান্য পরিমাণ রাম হয়েছে, প্রায় তলানিই বলা চলে, এক ঢোকের বেশি হবে না। তবে দ্বিতীয় বোতলটায় হুইস্কি বেশ কিছুটা আছে।

টেবিলের নিচে চেয়ারে পায়ের কাছে বোতল দুটো রেখে বাইরের ঘরে জয়দেবের জন্য অপেক্ষা করছিলেন মহিমাময়। জয়দেবের অবশ্য আসার কোন ঠিকঠিকানা নেই, রাত দেড়টা এমন কি ভোর চারটেতেও আসতে পারে। সন্ধ্যা থেকে প্রতীক্ষা করতে করতে ধৈর্য হারিয়ে ফেললেন মহিমাময়। সাড়ে আটটা নাগাদ প্রতিদিনের মত খিদেটা যখন জোর পেয়ে বসল তখন তিনি খিদের বদলে তৃষ্ণা নিবারণের দিকে জোর নিলেন। প্রথমে এক ঢেকে রামের তলানিটুকু নিট গিলে ফেললেন। অনেকদিন খান নি, একটা বড় হেঁচকি উঠল, তারপর কিছুটা বাদে ক্রমাগত হেঁচকির পর হেঁচকি, বিলম্বিত লয়ে হেঁচকি শুরু হল।

প্রথমে দু-চার গেলাস জল খেয়ে হেঁচকি, কাটানোর ব্যর্থ চেষ্টা করার পর হুইস্কির বোতলটা খুললেন মহিমাময়। ইচ্ছে ছিল না খেতে, জয়দেব আসবে, তাকে কি শুকনো মুখে বসিয়ে রাখবেন? খাওয়া আরম্ভ করলে মহিমাময় খুব তাড়াতাড়ি খান, এখনই ফুরিয়ে যাবে সামান্য পানীয়টুকু।

তাই ফুরলো, ন'টা পঁচিশ নাগাদ শেষ বিন্দুটুকু গলাধঃকরণ করে যখম হেঁচকির টানটা সবে ছেড়েছে আর একটা গুমভাব এসেছে মনের মধ্যে সেই সময় জয়দেব এলেন। জয়দেবের সঙ্গে সঙ্গে এল জোর বৃষ্টি। মহিমাময়ের বাড়িটা রাস্তার উপরে, একতলায় তিন কোনাচে বাইরের ঘরটা। নেশা করলে জয়দেব রিকশায় যাতায়াত করেন। একলাফে বৃষ্টি বাঁচিয়ে জয়দেব রিকশা থেকে সরাসরি বাইরের ঘরে ঢুকলেন।

নেশা আরম্ভ করার প্রথম দিকে যেটুকু মাথা ঘোরে কিংবা বা টলে জয়দেবের, তারপর তিনি যত খান বেহুঁশ না হওয়া পর্যন্ত স্টেডি থাকেন। সেই স্টেডি ভাবটা এখন জয়দেবের মধ্যে এসেছে। জয়দেবকে লাফ দিতে দেখে মহিমাময়ের ভয় হয়েছিল

ছিটকিয়ে পড়ে-টড়ে গিয়ে জখম না হয়। এ রকম জখম হওয়া জয়দেবের পুরনো অভ্যেস। কিন্তু এখন জয়দেব সত্যিই স্টেডি।

ঘরে ঢুকে টেবিলের সামনের চেয়ারে বন্ধুর মুখোমুখি বসলেন জয়দেব। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিরে, নেই কিছু?'

মহিমাময় এ প্রশ্নে একটু অস্বস্তি বোধ করলেন। বললেন, 'তুই এত দেরি করলি! সামান্য একটু ছিল, তোর জন্যে অপেক্ষা করতে করতে শেষে আমি নিজেই খেয়ে ফেললাম।' তারপর একটু থেমে বললেন, 'একটু জিন আছে, খাবি?'

জয়দেব ভুরু কুঁচকিয়ে বললেন, 'জিন? জিন আবার ভদ্রলোকে খায় নাকি? তোর পাল্লায় যখন পড়েছি, সন্ধ্যাবেলা বাসায় আসতে বললি অথচ কিছু বন্দোবস্ত রাখিস নি!'

মহিমাময় বলতে যাচ্ছিলেন, আমি তো তোকে আসতে বলিনি। তুইই আসতে চেয়েছিস। তা না বলে চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে আলমারির পিছন থেকে জিনের বোতলটা বার করে নিয়ে এলেন।

বোতলটার মধ্যে পানীয়ের পরিমাণ স্বল্প। বড়জোর চারভাগের এক ভাগ হবে। তবে একজনের পক্ষে সেটা কম নয়। একে জিন, তারপরে সিকি বোতল— মহিমাময়ের এ রকম ব্যবহারে জয়দেব উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'এসব চলবে না। পঞ্চাশটা টাকা বার কর, রিকশাওয়ালাকে দিয়ে একটা ছোট হুইস্কি আনাই।'

মহিমাময় এরকম অবস্থার জন্য মোটামুটি প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু এই বৃষ্টির মধ্যে রিকশাওয়ালা কোথায় যাবে, এত রাতে সব দোকান বন্ধ হয়ে গেছে, কোথায় পাবে মদ, ছাড়ার পঞ্চাশ টাকাও কম কথা নয়!

মহিমাময় জয়দেবকে বললেন, 'পঞ্চাশটা টাকা যে দেব, তোর রিকশাওয়ালাকে বিশ্বাস কী?'

মহিমাময়ের অবিশ্বাসী প্রশ্নে জয়দেবের আঁতে ঘা লাগল। জয়দেব চেঁচিয়ে উঠলেন, 'দ্যাখ্ মহিমা, তুই বড় নীচ। রিকশা চালায় বলে, গরিব বলে চুরি করবে? মদের টাকা মেরে দেবে?'

মহিমাময় গম্ভীর হলেন। বললেন, 'এই রিকশার লোকটাকে চিনিস? নাম জানিস?'

সঙ্গে সঙ্গে জয়দেব উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, রিকশাওয়ালার প্রসঙ্গ তাঁর বোধহয় সহ্য হল না। মহিমাময়ও স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। যাক খুব সহজে আপদ গেছে।

কিন্তু আপদ এত সহজে যাওয়ার ন, দু-মিনিটের মধ্যে জয়দেব ফিরলেন সঙ্গে রিকশাওয়ালা। তাকে একেবারে ঘরের মধ্যে নিয়ে এসেছেন। রিকশাওয়ালাকে মহিমাময়ের টেবিলের সামনে দাঁড় করিয়ে জয়দেব বললেন, 'মহিমা, ভালো করে দ্যাখ লোকটাকে। বিকেল থেকে আমার সঙ্গে আছে। এর চেহারার মধ্যে একটা অনেস্টি রয়েছে। তোর মতো চোর-চোর চেহারা নয়। আমি একবার দেখেই লোক চিনতে পারি। পঞ্চাশ, শুধু পঞ্চাশ কেন, পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়েও এরকম লোককে

বিশ্বাস করা যায়।'

হাঁটুর ওপরে তোলা খাটো ময়লা ধুতি, খালি গা, কোমরে ঘন্টি, দেহাতি লোকটিও বোধহয় জয়দেবের সঙ্গে তাল দিয়ে দিয়ে বেশ নেশা করেছে, সে হাসিহাসি মুখে মহিমাময়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

মহিমাময় লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার নাম কী?'

'সুখের বিষয় লোকটি বাংলা বোঝে, বোধহয় অনেকদিন কলকাতায় আছে, সে বলল,' 'হুজুর মেরা নাম ঠকাই, ঠকাই সিং।'

নাম শুনে মহিমাময় আতংকিত বোধ করলেন, লোকটিকে বললেন, 'তুমি বাইরে দাঁড়াও।' লোকটি বেরিয়ে যেতে জয়দেবকে বললেন, 'দ্যাখ, জয়, আমি আর যাই করি এই এত রাতে ঠাকাই নামে এরকম একটা লোককে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে বিশ্বাস করতে পারি না।'

এবার জয়দেব খেপে গেলেন, উত্তেজিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে পড়ে চেয়ারের ওপর বাঁ পাটা তুলে দিলেন, তারপর ধীরে ধীরে প্যান্টের ঝুলটা হাঁটু পর্যন্ত টেনে তুললেন। চাপা প্যান্ট নয়, আধুনিক ফ্যাশনের ঢোলা প্যান্ট, তাই বিশেষ অসুবিধা হল না। প্যান্ট তুলতে দেখা গেল হাঁটুর কিছু নিচে পায়ের সঙ্গে মোটা রবারের গার্ডার দিয়ে একটা একশো টাকার আর একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বাঁধা।

একশো টাকার নোট যথাস্থানে রেখে, পঞ্চাশ টাকার নোটটা গার্ডার থেকে খুলে বার করে প্যান্টটা আবার নামিয়ে দিলেন জয়দেব, মুখে গজগজ করতে লাগলেন, 'দিনরাত মাতালদের সঙ্গে ওঠাবসা, ভদ্রলোকের মতো পকেটে টাকা রাখার জো আছে!' গজ্‌গজ করতে করতে কটমট করে তাকাতে লাগলেন মহিমাময়ের দিকে।

এদিকে মহিমাময়ের ঠকাই সম্পর্কে আশংকা কিন্তু ঠিক মিলল না। দশ টাকা বখশিশের প্রলোভন দেখানো সত্ত্বেও ঠকাই এত রাতে এত বৃষ্টিতে মদ আনতে যেতে রাজি হল না। তাছাড়া সে বলল, এসব খারাপ জিনিস কোথায় পাওয়া যায়, সে সব সে কিছু জানে না। আজ এই বড়বাবুর পাল্লায় পড়ে জীবনে প্রথম নেশা করেছে। সে অত্যন্ত সাধু লোক, দৈনিক হনুমান পুজো করে, খৈনি-বিড়ি পর্যন্ত খায় না।

অতঃপর বাধ্য হয়ে জয়দেব নিজেই বেরোতে গেলেন, কিন্তু বৃষ্টি ক্রমশ বাড়ছে, বেরনোর সাহস করলেন না। একটু নরম হয়ে মহিমাময়কে বললেন, 'তা হলে দে—জিনটুকু দে, ওটাই খেয়ে নিই।'

মহিমাময় বন্ধুকে একটু বেশি করে এবং নিজে একটু কম করে জিন নিয়ে দুটো গেলাসে জল ঢেলে নিলেন। আস্তে আস্তে জয়দেবের মন খুশি হতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর বৃষ্টি ধরে এসেছে, জিনও শেষ। চুপচাপ দুজনে পান শেষ করেছেন। এবার জয়দেব উঠলেন, বললেন, 'অনেক রাত হয়েছে, এগারটা বাজে। বৃষ্টিটা থেমেছে, এই ফাঁকে যাই।'

বেরনোর মুখে জয়দেবকে মহিমাময় প্রশ্ন করলেন, 'কী একটা কাজের কথা আছে বলেছিলি?'

ঘুরে দাঁড়িয়ে জয়দেব বললেন, 'ভাল কথা, মনে করেছিস। আসল কাজটাই ভুলে গিয়েছিলাম। কাল তো আমাদের বিবাহবার্ষিকী। তোরা রাতে আমাদের ওখানে খাবি।'

মহিমাময়ের স্ত্রী ভিতরের ঘরে আনাগোনা করছিলেন। জয়দেবের নিমন্ত্রণ শুনে বাইরের ঘরে এসে বললেন, 'গতবারের মতো হবে না তো?'

গতবারের ব্যাপারটা একটু গোলমেলে। বেশি বর্ণনা না করে সংক্ষেপে বলা যায় গতবার নিমন্ত্রণ করে নিমন্ত্রণকর্তা জয়দেব নিজেই নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন। সে এক অস্বস্তিকর অবস্থা, রাত বারোটা পর্যন্ত জয়দেবের জন্যে অপেক্ষা করে সকলে ফিরে আসে।

মহিমাময়ের স্ত্রীর প্রশ্নে জয়দেব বললেন, 'আরে না না। লজ্জা দেবেন না। আপনাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এখন সোজা বাড়ি যাব। কাল আর বাড়ি থেকে বেরবো না।'

মহিমাময় বললেন, 'বাড়ি থেকে বেরবি না? তবে খাওয়াবি যে বাজার করবি না?'

জয়দেব বললেন, 'হবে তো খিচুড়ি-মাংস আর আনারসের চাটনি। মাংস পাড়াতেই পাওয়া যাবে। আর আনারসটা বৌ একসময়ে নিউমার্কেটে গিয়ে নিয়ে আসবে।'

মহিমাময় মৃদু আপত্তি করলেন। 'ঐ মাংস-খিচুড়িই যথেষ্ট। আমি এক বোতল হুইস্কি নিয়ে যাব। বৌদিকে নিউ মার্কেটে গিয়ে আনারস কিনতে হবে না। আর এখন আনারসের খুব দাম, বাজারে ভালো করে ওঠেই নি।'

'খুব দাম' কথা দুটো জয়দেবের কানে খট করে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রতিক্রিয়া হলো, তিনি ঘরের মধ্যে দু পা এগিয়ে এসে অভিযোগের ভঙ্গিতে বললেন, 'খুব দাম? আমি মদ খেয়ে পয়সা নষ্ট করি বলে তোরা ভাবিস আমার আনারস কেনারও ক্ষমতা নেই?'

মহিমাময় জয়দেবকে অনন্তকাল ধরে জানেন, এখন জয়দেবের সঙ্গে তর্কে প্রবেশ করা বোকামি। তাই সঙ্গে সঙ্গে কথার মোড় ঘুরিয়ে বললেন, 'না না, আনারসের চাটনি তাহলে করবি। এতে আপত্তির কিছু নেই। ভালোই হবে।'

জবাব শুনে জয়দেব বেরিয়ে গেলেন, ঠকাইয়ের রিকশায় উঠে হাত তুলে 'গুডনাইট' বলে চলে গেলেন। ধীরে ধীরে রিকশার টুং টুং শব্দ গলির মোড়ে মিলিয়ে গেল।

আধ-ঘণ্টা খানেক বাদে সবে খাওয়া দাওয়া সেরে মহিমাময় শুতে যাবেন এমন সময় গলির মোড় থেকে একটা রিকশার টুং টুং শব্দ এগিয়ে এসে মহিমাময়ের সদর দরজার সামনে থামল। কড়া নাড়তে দরজা খুলে মহিমাময় দেখলেন জয়দেব।

মহিমাময়কে দেখে জয়দেব বললেন, 'প্রায় বাড়ি পর্যন্ত গিয়ে ফিরে এলাম। ঠিক করে বল তো আনারসের চাটনি করব কি করব না!'

মহিমাময় বললেন, 'সে তো আগেই বলে দিলাম। অসুবিধা যদি না হয় আনারসের চাটনি হলে তো ভালোই।'

জয়দেব আহত হলেন, সুবিধা-অসুবিধার কথা আসছে কোথায়? ঠিক করে বল

আনারসের চাটনি করব কি করব না।

কথা না বাড়িয়ে মহিমাময় বললেন, আনারসের চাটনি করবি।

জয়দেব আবার সেই ঠকাইয়ের রিকশায় উঠে চলে গেলেন। এবার দরজা বন্ধ করে মহিমাময় শুতে গেলেন। একতলাতেই পাশের ঘরে শোবার ঘর। রাস্তার ধারে মাথার কাছে জানালা। রাতে সে জানালাটা বন্ধ করে শোন মহিমাময়।

তখন আবছা তন্দ্রামতো ঘুম এসেছে মহিমাময়ের। পাশে স্ত্রী গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন, হঠাৎ রিকশার টুং টুং এবং জানলায় ঠুকঠুক শুনে মহিমাময় জানালাটা একটু ফাঁক করলেন, আবার জয়দেব এসেছেন। জানলার নিচে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, বোধহয় কাছেপিছে কোথাও একটা চোলাইয়ের আড্ডা পেয়েছেন, সেখান থেকেই ঘুরে ফিরে আসছেন।

জানলার ওপাশে অন্ধকারে মহিমাময়ের আবছা মুখটা দেখে জয়দেব জানতে চাইলেন, তাহলে শেষ পর্যন্ত কথাটা কি ঠিক হল? আনারসের চাটনি হবে কি হবে না?

ঘুম-চোখে মহিমাময় বললেন, 'আর জ্বালাস নে জয়দেব। আনারসের চাটনি হবে, হবে, হবে।' আবার রিকশায় উঠে জয়দেব বিদায় নিলেন। কিন্তু পুরোপুরি বিদায় নয়। তিরিশ-চল্লিশ মিনিট পরপর ঐ ঠকাইয়ের রিকশায় চড়ে ঘুরে ঘুরে আসতে লাগলেন, সঙ্গে ঐ একই জিজ্ঞাসা, আনারসের চাটনি হবে কি হবে না?

রাত দুটো-আড়াইটা নাগাদ ব্যাপারটার একটা প্যাটার্নে দাঁড়িয়ে গেল। মহিমাময় আর জানালা বন্ধ করছেন না, জয়দেবও আর রিকশা থেকে নামছেন না। জানলার কাছে এসে ঠকাই ঘণ্টা টুং টুং করছে, রিকশা না নামিয়ে উঁচু করে ধরে রেখেছে সে, সেখানে হেলান দিয়ে বসে আছেন জয়দেব। টুং টুং শব্দ শুনে দু পাশ থেকে দুই বন্ধুতে প্রশ্নোত্তর হচ্ছে। ক্রমশ প্রশ্ন এবং উত্তর দুটোই সংক্ষিপ্ত হয়ে এসেছে। জয়দেব প্রশ্ন করছেন, 'আনারস...?' মহিমাময় উত্তর দিচ্ছেন, 'হবে।'

সকাল সাড়ে চারটে নাগাদ সামান্য পটপরিবর্তন হলো। রিকশায় টুং টুং শব্দ শুনে যথারীতি বিছানায় উঠে বসে মহিমাময় অবাক দেখলেন, রিকশার সিটে ঠকাই বসে রয়েছে আর রিকশাটা চালাচ্ছেন জয়দেব। এখন অবশ্য চালাচ্ছেন না, দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তবে হাতের ঘণ্টিটা খুব টুং টুং করে যাচ্ছেন।

মহিমাময়কে বিছানার ওপরে উঠে বসতে দেখে ঠকাই দাঁত বার করে হাসল, তারপর দেহাতি হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করল, 'আনারসকা চাটনি হোগা কি নেহি হোগা?'

হতভম্ব মহিমাময় কি জবাব দেবেন বুঝতে পারছিলেন না। এর মধ্যে একটা অন্য রকম কাণ্ড ঘটল। ক্লান্তির জন্যেই হোক অথবা অনভ্যাসের জন্যেই হোক রিকশার হাতলটা হঠাৎ ছেড়ে দিলেন জয়দেব। রিকশাটা উলটে দূরে ছিটকে গিয়ে পড়ল ঠকাই। তার বিশেষ কিছু হয় নি। সে তাড়াতাড়ি ধুলো ঝেড়ে নিয়ে রিকশাটা সোজা করে নিয়ে জয়দেবকে ফেলেই দৌড়ে রওনা হল। জয়দেব পিছু পিছু চেঁচাতে লাগলেন, 'এই ঠকাই। দাঁড়া, দাঁড়া, তোর ভাড়া নিয়ে যা।'

ঠকাই আর দাঁড়ায়! সে তখন রীতিমত ছুট লাগিয়েছে। তার পেছনে ছুট লাগাতে লাগাতে জয়দেব একটু ঘুরে দাঁড়িয়ে জানালার ও প্রান্তে বিছানার উপর বসে থাকা বিস্ময়বিমূঢ় মহিমাময়কে বললেন, 'এখনো শেষবারের মত অন্তত বলে দে মহিমা, আনারসের চাটনি হবে কি হবে না?' তারপর উত্তরের অপেক্ষা না করে ঠকাইয়ের রিকশার পেছনে প্রাণপণ দৌড় দিলেন জয়দেব।

মহিমাময় বিছানায় বসে বসে ভাবতে লাগলেন, তাহলে আনারসের চাটনি হবে কি হবে না?
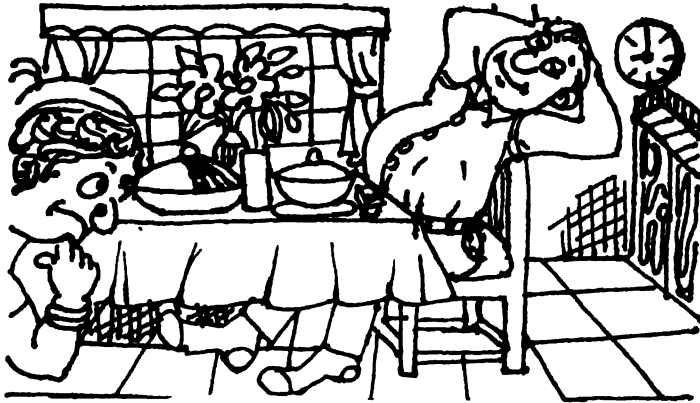
মহামহিম

জয়দেব পাল এবং মহিমাময় রায়চৌধুরীর কথা বার বার লেখার কোনও মানে হয় না। তাছাড়া এদের এখন বয়েস হয়েছে, দুজনেই বেশ কিছুদিন হল পঞ্চাশ পার হয়েছেন। বিভিন্ন ধরনের কীর্তিকলাপ করার ক্ষমতা এদের এখন খুবই কমে গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এরা এখানে মাঝে মধ্যে এমন কিছু অঘটন ঘটিয়ে বসেন যার তুলনা শুধু খোজা নাসিরুদ্দিনের গল্পে অথবা আরব্য উপন্যাসে ক্বচিৎ মিলতে পারে।

জয়দেবের কুখ্যাতি বহুপ্রচারিত এবং সর্বজনবিদিত। আমি নিজেই কতবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেসব উপাখ্যান লিখেছি। কিন্তু মহিমাময় মিটমিটে শয়তান। আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, এমন কি বন্ধুবান্ধব সহকর্মীরা তাকে কখনো সন্দেহ করেনি। কে চিরদিন ডুবে ডুবে কিংবা তলে তলে জল খেয়েছে এবং শুধু জল নয়, জলের সঙ্গে প্রায় সমান পরিমাণ হুইস্কি, রাম কিংবা ডবল পরিমাণ মামলা মদ।

মহিমাময়ের ওজন যে গত তিন বছরে ষাট কেজি থেকে আশি কেজিতে পৌঁছেছে, সে ঐ রামটাম অথবা বাংলার কল্যাণে।

পাড়া-প্রতিবেশী, শুভানুধ্যায়ী, আত্মীয়স্বজন মহিমাময়কে ফুলকো লুচির মত ফুলে যেতে দেখে নানা রকম ভয় দেখায়। শুভানুধ্যায়ীরা বলে, 'সাবধান, এ বয়েসে এত

মোটা হওয়া উচিত নয়। ব্লাডপ্রেসার বাড়ে, ডায়াবেটিস হয়, হার্টের ওপর চাপ পড়ে। সেরিব্রাল বা করোনারি হতে পারে, পক্ষাঘাত এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।'

এসব শুনে মহিমাময় খুবই ভয় পায়। তবে সে রসিক ব্যক্তি, ঐ করোনারি অ্যাটাক কথাটা শুনে তার অনেকদিন আগের একটা কথা মনে পড়ে যায়। শিবরাম চক্রবর্তীর বিখ্যাত ও জনপ্রিয় অল্পবিস্তরের কলমে এক শোকাহত ভাগিনেয় তার মামার মৃত্যুসংবাদ জানিয়েছিল, লিখেছিল যে তার মামা কিছুদিন আগে করোনারিতে মারা গিয়েছে। শিবরাম তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অতুলনীয় কৌতুকী ভঙ্গিতে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, 'কি আর বলবো ভাই, সকলের মামাই এরকম ভাবেই মারা যায়—করোনারি রোগে অথবা পরনারী রোগে।'

সে যা হোক, ব্যাপারটা হাসি-ঠাট্টা বা রঙ্গ রসিকতার পর্যায়ে আর নেই। কুড়ি কেজি ওজন বেড়ে যাওয়া সামান্য ব্যাপার নয়। মহিমাময় মাঝে মাঝেই নিজের মনে দুশ্চিন্তা করে।

অসুবিধাও নানা রকম দেখা দিয়েছে। সব সময়ে কেমন হাঁসফাঁস লাগে। দমবন্ধ ভাব। একটু হাঁটলেই দাঁড়িয়ে পড়তে হয়, জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ে, ঘাম হয়। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে গেলে তো কথাই নেই, দু-চার ধাপ উঠেই মহিমাময় হাঁপাতে থাকে।

এ ছাড়া আরও অনেক ধরনের অসুবিধা দেখা দিয়েছে। পুরনো প্যান্ট-শার্টগুলো আর ফিট করে না। দামী, দামী প্যান্ট ছিল মহিমাময়ের। বছর চারেক আগে কাঠমাণ্ডু বেড়াতে গিয়ে বেশ কয়েকটা ভাল বিলিতি কাপড়ের প্যান্ট বানিয়েছিল মহিমাময় আর সেই সঙ্গে দু-জোড়া সাফারি স্যুট।

মহিমাময়ের প্রাণের বন্ধু জয়দেব অবশ্য সাফারি স্যুটের ঘোরতর শত্রু। একদিন জয়দেবের সঙ্গে সন্ধ্যাবেলা একটা বারে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল মহিমাময়ের। বেশ কিছুদিন আগের কথা, তখনো মহিমাময় এত গোলাকার ধারণ করেনি। সেই নেপালী সাফারিস্যুটে বিভূষিত হয়ে মহিমাময় বারে পৌঁছনোর পরে তাকে দেখে জয়দেবের কী ক্রোধ, কী রাগারাগি, কী গঞ্জনা!

মহিমাময় বারে ঢুকে যেই জয়দেবের টেবিলে বসতে যাচ্ছেন, জয়দেব তাকে বলল, 'তুই কি কোনও কোম্পানিতে ড্রাইভারের চাকরি নিয়েছিস, নাকি দারোয়ানের?'

মহিমাময় অবাক হয়ে বলল, 'মানে?'

জয়দেব বলল, 'তা না হলে এই দারোয়ানের ইউনিফর্ম কোথায় পেলি?'

কথাটা মহিমাময়ের মনে ধরেছিল। সত্যিই বুঝি সাফারিস্যুটের মধ্যে কোথায় একটা অন্ত্যজ অনভিজাত ব্যাপার আছে, কেমন যেন দারোয়ানি-দারোয়ানি গন্ধ।

সেদিন অবশ্য গোলমালটা সঙ্গে সঙ্গে চুকে গিয়েছিল। এবং গভীর, গভীরতর রাতে প্রচুর, প্রচুরতর মদ্যপানের পর ফুটপাত বদল হওয়ার আগের মুহূর্তে জামা বদল করেছিল জয়দেব আর মহিমাময়।

মহিমাময়ের বহু আহ্লাদের সাফারিস্যুটের ঊর্ধ্বাংশ এবং জয়দেবের অতিপ্রিয় নীল

স্পোর্টস গেঞ্জি, যার বুকে ও পিঠে অকথ্য ইঙ্গিতপূর্ণ একটি ইয়াংকি স্লোগান লেখা আছে, বিনিময় হয়েছিল সেই মধ্যরাতে।

ফলে একটা সাফারিস্যুট সেদিনই খণ্ডিত হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয়টাও আর বিশেষ পরেনি মহিমাময়। পরার সুযোগও ছিল না।

শুধু সাফারিস্যুট কেন, প্রত্যেকটি প্যান্ট-শার্ট, গেঞ্জি ইত্যাদি পুরনো কিছুই আর মহিমাময় এখন তার শরীরে চড়াতে পারে না। প্যান্টগুলো, বিশেষ মায়াবশত, কোনও রকমে বেল্ট বেঁধে বোতাম না লাগিয়ে পরা যেত কিন্তু এখন তাও সম্ভব নয়। আর শার্ট? পুরনো শার্টগুলোর বুকের বোতাম লাগানো দূরের কথা, তার মধ্যে হাত গলানো পর্যন্ত অসম্ভব এখন।

তাই ধুতি আর ঢোলা পাঞ্জাবি পরা শুরু করেছে মহিমাময়। যতটা মোটা হোক, ধুতি ছোট হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। লম্বা হলে হয়তো বেশি ঝুলের ধুতি লাগে, কিন্তু পাশে বেড়ে গেলে সে সমস্যা নেই, কোঁচার কাপড় কিছু কম পড়তে পারে, তা পড়ুক, তাতে কিছু আসে যায় না। আর চওড়া হাতা ঢোলা পাঞ্জাবিও সর্বংসহা। তার ভিতরে দু-চার-দশ কেজি মেদবৃদ্ধি অনায়াসেই চাপা দেয়া যায়।

কিন্তু সে তো সাময়িক ব্যাপার। বাসায় সব সময় তো ঢোলা পাঞ্জাবি পরে থাকা যায় না। বাসায় খালিগায়ে হলে নিজের স্ফীতোদরের দিকে তাকিয়ে লজ্জায় মাথা নিচু হয়ে যায় মহিমাময়ের। স্নান সেরে উঠে দেয়াল-আয়নার সামনে খালিগায়ে দাঁড়িয়ে নিজের মেদ ও চর্বি প্লাবিত বৃষস্কন্ধের দিকে দৃষ্টিপাত করে মহিমাময় শিউরে ওঠে।

এর কি কোন প্রতিকার নেই? ডাক্তার সমেত যাকেই জিজ্ঞাসা করা হয়, সে ভোজন কমাতে বলে। মহিমাময়ের নিয়মিত গোপন মদ্যপানের সংবাদ অনেকেই রাখে না। যে দুয়েকজন রাখে, তারা বলে, 'পান-ভোজন কমাও।' কিন্তু ভোজন একটু আধটু কমাতে পারলেও মহিমাময় পান কমাতে পারছে না। পানীয়ের চেয়েও বিপজ্জনক পানীয়ের সঙ্গে চাট। মহিমাময় আগে লুচি খেতো। অন্তত আট-দশটা লুচি ছুটির দিনের সকালবেলায় জলখাবার, সেই সঙ্গে আলুর দম বা পরিমাণগত আলুপেঁয়াজ ভাজা। আর দুটো মিষ্টি। স্থূল ব্যক্তির পক্ষে এসব নাকি বিষ। এরকম নিয়মিত খেলে মাসে এক কেজি ওজন বেড়ে যাবে।

এসব জানার পর থেকে মহিমাময় ছুটির দিনে সকালে জলখাবার খায় স্রেফ তিনখানি রুটি আর একটু ডাল কিংবা বেগুনভাজা।

অন্যান্য খাবার ব্যাপারেও যথেষ্ট ধরাবাঁধার মধ্যে এসেছে সে। সকালের চায়ের চিনির বদলে স্যাকারিন খায়। সঙ্গে আগে চারটা বিস্কুট খেত এখন একটা তাও সেটা থেকে এক টুকরো ভেঙে বাড়ির পোষা কুকুরটাকে দেয়। কুকুরটা মহিমাময়ের ছেলের আগে কখনো মহিমাময়কে দেখে জীবনে একবারও লেজ নাড়েনি। এখন বিস্কুটের সামান্য ভাগ পেয়ে অল্প অল্প লেজ নাড়ে।

দুপুরেও মহিমাময় ভাত দুমুঠো কম খায়। ভাত খেতে বসার আগে পর পর

দুগেলাস জল খেয়ে নেয় যাতে পেটে বেশি জায়গা না থাকে। ভাতের সঙ্গে ঘি, ভাজা-টাজা, ডিম-মাংস এ সব বন্ধ করেছে, ডাল, তরকারি আর ছোটমাছ। দুপুর অফিসে টিফিন নিয়ে যায় সে। আগে চার-পাঁচখানা রুটি নিত, এখন ঠিক দুটো রুটি, সঙ্গে সামান্য তরকারি। বাড়ির বাইরে চা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। যদি খেতেই হয়, বড়জোর চিনি ছাড়া চা।

খাদ্যে ক্যালোরির পরিমাণ এবং সেই সঙ্গে মেদবৃদ্ধি সংক্রান্ত বাজার চলতি বেশ কয়েকটি বই আগাগোড়া মন দিয়ে পাঠ করেছে মহিমাময়। বলতে গেলে এ বিষয়ে সে এখন একজন অথরিটি। ক্যালোরি ব্যয়ের হিসাবের খুঁটিনাটিও এখন তার মুখাগ্রে। সিঁড়ি দিয়ে নামলে কত ক্যালোরি ব্যয় হয়, সিঁড়ি দিয়ে উঠলে কত, হাঁটলে কত, ছুটলে কত, বসে থাকলে কত, শুয়ে থাকলে কত সব মহিমায় জেনে গেছে।

সে জেনে গেছে দৈনিক সকালে একঘণ্টা হাঁটলে এক বোতল বিয়ার বা দু-পেগ রামের ক্ষতিপূরণ হয়। তিন কাপ চায়ে সাড়ে চার চামচে চিনি খাওয়া হয়, সেটা এক গেলাস বাংলা খাওয়ার সমান।

সব জেনে গেছে মহিমাময়। সকালে বহু সাধের সুখনিদ্রা ফেলে সে মাঠে গিয়ে তরতর করে ছোটে। তারপর সারাদিন সবরকম লোভ দমন করে যথাসাধ্য কম খেয়ে সে দিনযাপন করে। সে রাবড়ি খেতে ভালবাসত। মোগলাই পরটা খেতে ভালবাসত। তেলেভাজা বেগুনি ফুলুরি খেতে ভালবাসত—মোটা হওয়া কমানোর জন্যে সে সব ছেড়ে দিয়েছে।

কিন্তু তাতে লাভ কী? সারাদিন মহিমাময় কত কষ্ট করে লোভ দমন করে থাকে। রাস্তায় তার প্রিয় চিকেনরোল ভাজা হচ্ছে, আলুর চপের গন্ধে বাতাস ভুরভুর করছে, দলে দলে লোক সে সব কিনে খায়, কিন্তু মহিমাময় কখনো এসব লোভ করে না, অন্তত সূর্যাস্ত পর্যন্ত।

সূর্যাস্তের পর ধীরে ধীরে, অতি ধীরে ধীরে, মহিমাময়ের প্রতিরোধ ক্ষমতা করতে থাকে। সাড়ে সাতটা নাগাদ সে বরফ-সোডা আর সামান্য একটা পানীয় নিয়ে বসে। তখনই সর্বনাশের শুরু হয়। একটু পান করার পরে সে গায়ে পাঞ্জাবি পায়ে চটি গলিয়ে রাস্তায় গিয়ে এক টাকার খোসা ছাড়ানো চিনেবাদাম আর দেড় টাকার চানাচুর নিয়ে আসে। পানীয় কম থাকলে মোড়ের মাথায় দত্তের দোকানে গিয়ে একটা বোতল কেনে। তারপর সারাদিনের ত্যাগ ও পরিশ্রম জলে ভেসে যায়। আধ বোতল পানীয়, সঙ্গে চানাচুর-বাদাম, তারপরে নৈশ আহারে বসে মহিমাময়ের খাওয়ার রোখ চেপে যায়। আরও ভাত, তরকারি চেয়ে চেয়ে খায়, ঝোল থেকে বেছে বেছে চামচে দিয়ে আলু তুলে নেয়। মহিমাময়ের স্ত্রী মহিমায়ের মোটা হাওয়া নিয়ে মোটেই মাথা ঘামায় না। সুতরাং কোন দিক থেকে কোন বাধা নেই। সারাদিন যা খেয়েছে, শুধু এক সন্ধ্যায় সে তার চারগুণ খেয়ে ফেলে। চানাচুর-বাদাম, আধবোতল মদ চোখে দেখে বোঝা না গেলেও ডাক্তারি মতে মোটা হওয়ার ব্যাপারে বিয়েবাড়ির বিরিয়ানি-মাংস-ফিসফ্রাই-দই-মিষ্টি-খেজুরের চাটনির লম্বা ভোজের সমান।

সুতরাং মহিমাময়ের আরও, আরও মোটা হওয়া, ক্রমাগত স্থূল থেকে স্থূলতর হয়ে যাওয়া জগৎসংসারে কেউ ঠেকাতে পারবে না।

শরীরের চর্বি তাড়াতাড়ি পোড়ানোর কি এক বিলিতি ট্যাবলেট বেরিয়েছে বাজারে, খুব দাম, স্থূলাঙ্গিনী বণিকবধূরা দুবেলা মুঠো মুঠো খাচ্ছে। মহিমাময়ের এক বন্ধু তাকে ঐ ট্যাবলেট খেতে বলল। ট্যাবলেট কিনতে গিয়ে মহিমাময় ফিরে এল। এক শিশি একশ আশি টাকা। এর ডবল পরিমাণ পানীয়ের পাঁইটের দাম বড়জোর চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ টাকা। এ ঔষুধ খেতে গেলে এমনিই রোগা হয়ে যাবে, কারণ তাহলে মদ বা খাবারের পয়সা আর জুটবে না। এ ব্যবস্থা মহিমাময়ের পছন্দ হল না।

আর তাছাড়া মহিমাময় মনে মনে জানে যে ওষুধ-ফষুধে কিছু হবে না। পান-ভোজন না কমালে কোন গতি নেই।

জয়দেবের সঙ্গে একদিন এ নিয়ে আলোচনা করছিল সে। জয়দেবের ওপরে ঈশ্বরের আশীর্বাদ আছে, যতই খাক সে তার গায়ে গত্তি লাগে না। এই চুয়ান্ন বছর বয়েসেও সে বাইশ বছরের ছিপছিপে চেহারা রাখতে পেরেছে। অথচ সে মহিমাময়ের চেয়ে পানভোজন কম তো করেই না, বরং যথেষ্টই বেশি করে।

জয়দেবই পান করতে করতে মহিমাময়কে পরামর্শটা দিল। সে বলল, 'দ্যাখ মহিমা, আমার শরীরের মধ্যে বিদ্যুতের আগুন আছে। ভালমন্দ যা খাই জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাইভস্ম করে দেয়। তোর তো আর সে ক্ষমতা নেই। তোকে খাওয়া বন্ধ করতে হবে আর এ জিনিসটাও।' বলে নিজের গেলাসটা আদর করে আলতো করে ছুঁলো।

মহিমাময় করুণ মুখে বলল, 'কিন্তু কি করে বন্ধ করব? অনেক চেষ্টা করলাম কিন্তু কিছুতেই ছাড়তে পারলাম না।'

জয়দেবের বেশ নেশা হয়েছিল, এক চোখ টিপে চালাকের মত মুখ করে বলল, 'আমার কাছে বুদ্ধি আছে, খুব ভাল বুদ্ধি।'

মহিমাময়েরও যথেষ্ট নেশা হয়েছিল। আজ শনিবার। পার্কস্ট্রিটের শেষপ্রান্তের এই বারটায়, প্রত্যেক শনিবার সন্ধ্যায়, ঝড় হোক, বৃষ্টি হোক, ভূমিকম্প হোক, দাঙ্গা বা গোলমাল যাই হোক জয়দেব আর মহিমাময় দুজনেই চেষ্টা করে আসতে, বহুদিনের অভ্যেস। অবশ্য মহিমাময় কখনো কখনো জয়দেবকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলে, নানা কারণ, তখন যোগাযোগটা বাদ পড়ে।

সে সব পুরনো কথা। আজ জয়দেবের কথা শুনে মহিমাময় ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল, জয়দেবের কাছে কি বুদ্ধি আছে কে জানে। কুড়ি বছর আগে জয়দেবের পরামর্শে এবং উস্কানিতে মহিমাময় এক পুলিসের জমাদারকে পেছন থেকে ল্যাং মেরে ফেলে দিয়েছিল, তার বিষময় পরিণাম এখনও তার মনে আছে।

তারও আগে আরেকবার জয়দেব তাকে হোমিওপ্যাথিক গুলি সাইজের কালো মতন বড়ি কাজে মুড়ে এনে একদিন দেয়, বলে, 'খেয়ে দ্যাখ। বুদ্ধি তাজা হবে।' সরল বিশ্বাসে মহিমাময় সেই বড়ি একবার খেল। তখন জয়দেব বলল, 'আরেকটু খা।'

মহিমাময় আরও একটু খেয়ে বলল, 'কেমন, মরা ডেঁয়ো পিঁপড়ের মত মনে হচ্ছে।'

জয়দেব টেবিল চাপরিয়ে বলেছিল, 'এই তো, বেশ বুঝতে পারছিস। বুদ্ধি খুলছে। ঠিক ধরতে পেরেছিস। মরা ডেঁয়ো পিঁপড়েই এগুলো।

মহিমাময়ের মুখের দিকে তাকিয়ে জয়দেব সব অনুমান করতে পারল, বলল, 'এত ভয় খাচ্ছিস কেন! এবার খুব সোজা বুদ্ধি দেব—জলের মত সোজা।'

মহিমাময় বলল, 'কী বুদ্ধি?'

জয়দেব গম্ভীর মুখে বলল, 'সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে অল্প একটু জলখাবার খেয়ে তারপর দুটো ঘুমের ওষুধ খেয়ে শুয়ে পড়বি। ঘুম ভাঙবে সেই রাত কাবার হয়ে। রাতের বেলা পানভোজন আর কিছু দরকার হবে না।'

জয়দেবের উপদেশ তখনকার মত হেসে উড়িয়ে দিলেও, পরের দিন সকালবেলা ঠাণ্ডা মাথায় পার্কে হাঁটতে হাঁটতে ব্যাপারটা খুব ভাল করে ভেবে দেখল মহিমাময়। মাতালের পরামর্শ বটে কিন্তু ঠিক ফেলে দেওয়া যাচ্ছে না।

সত্যিই তো, মেদবৃদ্ধির পথে সবচেয়ে গোলমেলে ঐ সন্ধ্যাবেলার কয়েক ঘণ্টা। সারাদিন কষ্ট করে তারপর তখনই ধুম পড়ে খাওয়া-দাওয়ার। খাওয়া আর দাওয়া দুইয়ে দিলে ডুবিয়ে আপ্রভাত ত্যাগ ও পরিশ্রম।

তবে ঘুমের ওষুধ কেনা সোজা কাজ নয়। প্রেসক্রিপশন লাগবে। ডাক্তারখানা অনেকের কাছে প্রেসক্রিপশন ছাড়াই ঘুমের বড়ি বেচে, কিন্তু মহিমায়ের চেহারা বা হাবভাবে বোধহয় সম্ভাবনাপূর্ণ আত্মহত্যাকারীর আদল আছে। সে দোকানে গিয়ে ঘুমের ওষুধ চাইলেই দোকানকর্মচারীরা গলা নামিয়ে নিজেদের মধ্যে ফিসফাস কি সব আলোচনা করে, তার দিকে টেরিয়ে টেরিয়ে দেখে, তারপর বলে, 'এখন হবে না। স্টক নেই।'

অবশেষে পাড়ার ডাক্তারের কাছে গেল মহিমাময়। আসল কথা না বলে তাঁকে বলল, 'ডাক্তারবাবু, রাত্রে ভাল ঘুম হচ্ছে না। আমাকে একটু ঘুমের ওষুধ দিন।'

সদাশয় ডাক্তারবাবু মহিমাময়কে ঘুমের ওষুধ খাওয়ার অপকারিতা এবং অপ্রয়োজনীয়তা বিষয়ে দীর্ঘ এক বক্তৃতা দিলেন, তারপর হজমের ওষুধের একটা প্রেসক্রিপশন দিয়ে বললেন, 'এটা খান। হজম ভাল হলেই ঘুম ভাল হবে। সাবধান, ঘুমের ওষুধ খাবেন না।'

দশটাকা ভিজিটটা জলে গেল। ডাক্তারের ঘর থেকে রাস্তায় বেরিয়ে প্রেসক্রিপশনটা কুচি কুচি করে হাওয়ায় উড়িয়ে দিল মহিমাময়। হজমের ওষুধ না খেয়েই এই স্বাস্থ্য, হজমের ওষুধ খেলে তো শরীরের মেদসমুদ্র আরো উথাল-পাতাল হয়ে উঠবে। এখন তবুও ঘাড়ে মাথা আছে, তখন ঘাড়ে-গর্দানে এক হয়ে যাবে।

সেই সপ্তাহের শনিবার সন্ধ্যায় জয়দেবকে তার সমস্যার কথা বলল মহিমাময়। প্রথমে জয়দেবের মোটেই মনে ছিল না, সে প্রশ্ন করল, 'ঘুমের ওষুধ লাগবে না। বিছানায় শুতে না শুতে ঘুমিয়ে পড়বি।'

এবার মহিমায় আগের সপ্তাহের কথাবার্তা মনে করিয়ে দিতে জয়দেবের মনে পড়ল। সে বলল, 'কি বলছিস, ডাক্তার ঘুমের ওষুধ দিলে না?' তারপর টেবিল থেকে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে পাশের ফার্মেসি থেকে দশটা ঘুমের বড়ি এনে মহিমাময়কে দিয়ে বলল, 'যে কোন দোকানে গিয়ে চাইলেই পেতিস, ডাক্তারের কাছে গেলি কেন?'

মহিমাময় জয়দেবকে এ কথা আর বলল না যে দোকানে তাকে ঘুমের ওষুধ দিতে চায়নি। জয়দেব একটু পরে বলল, 'নেশা করে কখনো ঘুমের ওষুধ খাবি না। হঠাৎ বিপদ হতে পারে।'

ওষুধটা বুকপকেটে রাখতে রাখতে মহিমাময় ভাবল, নেশা করে ঘুমের ওষুধ খেতে যাব কেন, নেশা না করার জন্যেই ঘুমের ওষুধ খাব।

পরের দিনই মহিমাময় ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখল। সন্ধে সাড়ে সাতটায় যখন কারণবারির জন্যে জিব শুকিয়ে এসেছে মহিমাময় দুটো ঘুমের টাবলেট এক গেলাস জল দিয়ে খেয়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। বৌকে বলে গেল, 'আজ থেকে রাতে খাব না, ঘুম থেকে ডেকে তুলো না।'

এবং সত্যিসত্যিই রাত আটটার মধ্যে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেল সে।

ঘুম ভাঙল সেই রাত তিনটেয়। খিদেয় পেট চোঁ-চোঁ করছে, গলা শুকিয়ে কাঠ, দুচোখে তখন কেমন একটা ভারি-ভারি, ঘুম-ঘুম ভাব, সারা শরীরে জড়তা। কোনোরকমে ঘুম থেকে উঠে বাথরুম হয়ে খাওয়ার ঘরে গেল সে। গিয়ে দেখল সতীসাধ্বী সহধর্মিনী রাতে খেতে ডাকেনি বটে, কিন্তু রাতের খাবার টেবিলে একটা বড় থালা দিয়ে ঢেকে রেখেছে।

খাবার দেখে মহিমাময় প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর, যা কিছু ছিল সব গ্রোগ্রাসে খেয়ে নিল। তারপর দু গেলাস জল ঢক ঢক করে খেল। তবুও কেমন খালি-খালি একটা অপূর্ণ ভাব, তার মনের মধ্যে কিসের জন্যে কেমন একটা আকুলি-বিকুলি।

রাত্রির তৃতীয় প্রহর সদ্য অতিক্রান্ত হয়েছে। এখন অন্ধকার সবচেয়ে গাঢ়। খাওয়ার ঘরের জানালা দিয়ে বাইরে আকাশের দিকে তাকাল মহিমাময়, দু-এক টুকরো ছেঁড়া মেঘ তারই ফাঁকে ফাঁকে তারাগুলো জ্বল জ্বলে। কিছুক্ষণ আগে বোধহয় বৃষ্টি হয়েছে। এখনো জলের ফোঁটার ক্ষীণ শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। বাতাসে জোলো গন্ধ। মোড়ের মাথায় পুরনো শিমুলগাছটায় কি একটা খুব কর্কশ চেঁচাচ্ছে।

ঢং ঢং করে রাস্তা দিয়ে একটা রিকশ চলে গেল। নিশ্চয়ই কোন লেট মাতাল বাড়ি ফিরছে।

মহিমাময়ের মনের মধ্যে কেমন যেন আরও বেড়ে গেল আকুলি-বিকুলি। সে ধীরপায়ে উঠে সন্তর্পণে বৌকে না জাগিয়ে শোয়ার ঘরের আলমারির পিছন থেকে পানীয়ের বোতলটা বের করে আনল, প্রায় আধ বোতল আছে। ফ্রিজ থেকে খাওয়ার জল বের করে খাওয়ার টেবিলে বসল। তারপর একটু ভাবল, মদ খেয়ে ঘুমের ওষুধ খাওয়া নিষেধ, কিন্তু ঘুমের ওষুধ খেয়েও কি মদ খাওয়া নিষেধ!

তারপর আর ভাবল না।

সকালবেলা মহিমাময়ের বৌ ঘুম থেকে উঠে দেখল স্বামী খাওয়ার টেবিলে হাত মাথায় দিয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। পাশে শূন্য বোতল, শূন্য গেলাস।

অন্য এক মাতালের গল্প

প্রত্যেক শুক্রবার কিশোর তারকেশ্বরে যায়।

না, কোনও ধর্মকর্ম করতে সে যায় না। ভোলাবাবার ওপর তার অগাধ বিশ্বাস, যত কাজই থাক তারকেশ্বরে গেলে অন্তত একবার সে মন্দিরের দেওয়ালে মাথা ছুঁইয়ে আসে। কিন্তু সে শুক্রবার-শুক্রবার তারকেশ্বরে যায় ব্যবসার খাতিরে। তারকেশ্বরের কাছেই ময়নাপাড়ায় তার কোল্ড স্টোরেজ, পাশাপাশি দুটো। একটা বাবা তারকেশ্বরের নামে—'দি নিউ ভোলাবাবা কোল্ড স্টোরেজ'।

প্রথমে অবশ্য এটার 'ভোলাবাবা কোল্ড স্টোরেজ' নামই দিয়েছিল কিশোর, কিন্তু পরে জানতে পারে যে আশেপাশে আরও তিনটি 'ভোলাবাবা কোল্ড স্টোরেজ' 'ভোলেবাবা কোল্ড স্টোরেজ' এবং 'নিউ ভোলেবাবা কোল্ড স্টোরেজ' রয়েছে। তখন সে বাধ্য হয়ে নাম পালটিয়ে 'দি নিউ ভোলাবাবা কোল্ড স্টোরেজ' নামকরণ করে।

দ্বিতীয়টির নাম নিয়ে কিশোরের অবশ্য কোনও অসুবিধেই হয়নি।

অসুবিধে হওয়ার কথাও নয়। কিশোরের প্রাণাধিকা পত্নী শ্যামা শতকরা একশভাগ লক্ষ্মী। শ্যামার সঙ্গে পরিণয়ের পর থেকেই কিশোরের রমরমা।

তার একটা কারণ অবশ্য শ্যামার কৈশোর এবং যৌবন ইতিহাস খুব প্রাঞ্জল ছিল না, কিন্তু শ্যামার বাবার টাকা ছিল। কিশোর এসব কিছু না ভেবেচিন্তে শুধু শ্যামার রূপসুধা পান করে এবং শ্যামার পিতৃদেবের দশ লক্ষ নিরভিমান পণ গ্রহণ করে শ্যামার পাণিগ্রহণ করেছিল।

তারপর থেকে পরম আনন্দে কেটেছে তার দিন।

শুধু দিন নয়, কিশোরের রাতও পরম আনন্দে কেটেছে। রঙিন দেশলাই কাঠির মত একেক সন্ধ্যায় কখনও সবুজ, কখনও লাল—একেক সায়াহ্নে গাঢ় নীল অথবা ঝকঝকে সাদা আলোর রেশনাই। শ্যামা তাকে অনেক দিয়েছে।

সুতরাং দ্বিতীয় কোল্ড স্টোরেজটির নামকরণ যখন কিশোর করল 'শ্যামা কোল্ড স্টোরেজ' তার মন ও হৃদয় আত্মতৃপ্তিতে ভরে উঠল।

শুধু একটা অসুবিধে হয়েছিল, স্বয়ং শ্যামা সজোর প্রতিবাদ জানিয়েছিল, 'আমার বন্ধুরা আমাকে বলত গরম হাওয়া, আর তুমি আমাকে কোল্ড স্টোরেজ করে দিলে?'

কিশোর সরল প্রকৃতির মানুষ। এতশত কথার কায়দা বোঝে না। দুটো আলুর কোল্ড স্টোরেজে মাসে পাঁচ-পাঁচ দশ হাজার টাকা, সন্ধ্যাবেলা আধ থেকে এক বোতল রঙিন রাম, তারপরে গৃহে শয়নে-স্বপনে শ্যামাসুন্দরী—এই তার জীবনের পরমার্থ।

আজ শুক্রবার। তারকেশ্বর যাচ্ছিল কিশোর। আজকাল লোকজনদের মোটেই বিশ্বাস করা যায় না, তাই সপ্তাহের শেষ দিকটা নিজেই তারকেশ্বরে এসে হিসেবনিকেশ করে, টাকা আদায় করে, দেনাপাওনা মেটায়।

কোল্ড স্টোরেজের লাগোয়া তার একটা সুন্দর বাংলোমতন ঘর আছে, সেখানে রাত্রিযাপন করে। কলকাতা থেকে আসার সময় দু-চার বোতল রাম সঙ্গে নিয়ে আসে। ব্যবসা চালাতে গেলে স্থানীয় মাস্তানদের, থানার বাবুদের একটু খুশি রাখতে হয়।

শনি-রবিবার কোল্ড স্টোরেজের আলুভাজা আর রাম। বিশ্রাম-ফুর্তিও হয় আবার পাবলিক রিলেশনও হয়।

কিন্তু আজ কিশোরের তারকেশ্বর যাওয়া হল না। দক্ষিণ আফ্রিকায় গণধর্ষণের প্রতিবাদে কোন্নগরের 'সুহৃদ বান্ধব সঙ্ঘের' সদস্যরা বোমা, লাঠি নিয়ে রেললাইনের ওপরে বসে পড়েছে। শ্রীরামপুর থেকে এস ডি ও সাহেব পুলিস সাহেব এসে অনেক বুঝিয়েছেন, তাঁরা কথা দিয়েছেন যে ভবিষ্যতে যাতে এরকম আর কখনও না হয় তা তাঁরা দেখবেন এবং নিশ্চয়ই এর প্রতিকারের ব্যবস্থা করবেন।

কিন্তু সুহৃদ বান্ধব সঙ্ঘের সদস্যরা অদম্য। বিকেল চারটে পাঁচ মিনিট থেকে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের খেলা, তারা ঠিক চারটে বাজতে পাঁচ মিনিটে 'সুহৃদ বান্ধব সঙ্ঘ জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিতে দিতে রেললাইন পরিত্যাগ করল।

এর পরেও তারকেশ্বরে যে যাওয়া যেত না তা নয়। ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যেই রেল চলাচল প্রায় স্বাভাবিক হল। কিন্তু বহুক্ষণ রেলকামরার গুমোটে আটকে থেকে তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল। সে রেলগাড়ি থেকে লাইন বরাবর কিছুটা হেঁটে তারপর একটা রিকশ নিয়ে জি টি রোডে এসে একটা প্রাইভেট ট্যাক্সি ধরল।

কিশোরের নিজের একটা নতুন লাল মারুতি ভ্যান আর পুরনো ফিয়াট আছে। কিন্তু গাড়িটাড়ি নিয়ে সে কলকাতার বাইরে বেরোতে চায় না, তার অনেক ঝামেলা। জি টি রোডে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ট্রাফিক জ্যাম, মোড়ে মোড়ে চাঁদার খাতা।

আজকের ট্রেন ঝঞ্ঝাটটা একটু অস্বাভাবিক, এমন সাধারণত হয় না। যা হোক,

প্রাইভেট ট্রাক্সিতে উঠে সে প্রথমে তারকেশ্বরেই যাওয়ার কথা বলল, কিন্তু ট্যাক্সিওয়ালা বলল যে এ গাড়ি কলকাতার, সে কলকাতায় ফিরছে, তারকেশ্বর যেতে পারবে না। একটু দোনামনা করে অবশেষে বাধ্য হয়েই কিশোর কলকাতা ফিরে যাওয়া সিদ্ধান্ত করল।

সন্ধ্যাবেলার জি টি রোডের ভিড়ে ভর্তির রাস্তায় ধুঁকতে ধুঁকতে মন্থরগতিতে ট্যাক্সি কলকাতার দিকে রওনা হল।

কিশোরের হাতে একটা শান্তিনিকেতনী চামড়ার ব্যাগে সপ্তাহ শেষের খোরাক দু-বোতল রাম, একটা তোয়ালে আর একটা টুথব্রাশ রয়েছে।

হাওড়া শহরের মুখে জি টি রোডের একটা বাঁক যেখানে দীর্ঘ উকারের (ৃ) জটিলতা নিয়েছে, অথচ বান মাছের লেজের মত সূক্ষ্ম হয়ে গেছে, সেখানে ট্যাক্সিটা রীতিমত আটকে গেল গাড়ির জটলায়। কিশোর চারদিক পর্যবেক্ষণ করে বুঝল ঘণ্টাখানেকের আগে এ জট খোলার কোনও সম্ভাবনা নেই। তবে সান্ত্বনার কথা এই যে হাতের ব্যাগে দু-বোতল পানীয় রয়েছে।

লোডশেডিং চলছে। সন্ধ্যা বেশ জমাট হয়ে এসেছে। ধুলো, ধোঁয়া, গরম, অন্ধকার। কিশোর ধীরে ধীরে ব্যাগ খুলে একটা বোতলের ছিপি খুলে অল্প অল্প করে গলায় ঢালতে লাগল। একবার ড্রাইভার পিছন ফিরে তাকাতে দ্বিতীয় বোতলটা তার হাতে ধরিয়ে দিল। কিছুক্ষণের মধ্যে গরম, গাড়িতে ঘামতে ঘামতে বসে থাকা, ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করা-কোনও বোধই আর রইল না। ড্রাইভারের অবস্থাও তদ্রূপ। দুজনে ধীরে ধীরে চুক চুক রাম খেয়ে চলল।

এরপর রাত তখন প্রায় একটা। কখন যে ট্রাফিকের জট খুলেছে, ড্রাইভার গাড়ি চালিয়ে কলকাতার ভিতর চলে এসেছে, কিছুই হুঁশ হয়নি কিশোরের।

এখন একটু জ্ঞান হতে সে উঠে বসল। গাড়ির পিছনের সিটে সে, আর সামনের সিটে ড্রাইভার। ড্রাইভার এখনও বেহুঁশ।

জানলার বাইরে মেঘলা আকাশে ভাঙা চাঁদ উঠেছে। জায়গাটা বোধহয় লেকের কাছাকাছি কোথাও হবে। একটু চোখ কচলিয়ে নিয়ে দরজা খুলে গাড়ির বাইরে এসে দাঁড়ালো কিশোর। সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে। আশেপাশে একটু তাকিয়ে কিশোর ধরতে পারল, জায়াগাটা শরৎ বসু রোড আর সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের মোড়ে লেকের মুখোমুখি।

গাড়িতে ওঠার পরে কিশোর ড্রাইভারকে বলেছিল শরৎ বসু রোডে তার বাড়ি। ড্রাইভার যে এত মদ খাওয়ার পরেও কোনও দুর্ঘটনা না করে এতদূরে আসতে পেরেছে সেটা ভাগ্যের কথা। তবে শরৎ বসু রোডের ঐ মাথায় পদ্মপুকুরের পাশে একটা দোতলা বাড়িতে থাকে কিশোর, সে জায়গাটা এখান থেকে খুব কাছে নয়।

সামনের সিটে ড্রাইভারকে দুবার ধাক্কা দিয়ে তোলার চেষ্টা করল কিশোর। লোকটা দুবার হুঁ হুঁ করে, তারপর সিটের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে গাঢ় নিমগ্ন হল। চাঁদের আলোয় কিশোর দেখতে পেল ওর পায়ের কাছে রামের বোতলটা পড়ে

রয়েছে, তাতে এক-তৃতীয়াংশ পানীয় এখনও বর্তমান। কিশোরের নিজের বোতলটাও পিছনের সিটে রয়েছে কিন্তু সেটা খালি, তাতে আর কিছু অবশিষ্ট নেই।

ড্রাইভারের পায়ের কাছ থেকে হাত বাড়িয়ে বোতলটা তুলে নিল কিশোর। ড্রাইভার বোধহয় কিছু টের পেয়েছিল, ঐ আচ্ছন্ন অবস্থাতেই মৃদু বাধাদানের চেষ্টা করল। কিশোর তার হাত ছাড়িয়ে বোতলটা বগলে নিয়ে টালমাটাল চরণে বাড়ির দিকে রওনা হল।

এখান থেকে নাক-বরাবর মাইল দুয়েক রাস্তা যেতে হবে। এটুকু রাস্তা মাতালের পক্ষে কিছুই নয়, বিশেষ করে হাতের বোতলে এখনও যখন একটু পানীয় আছে। একটাই ভয় হঠাৎ পা জড়িয়ে পড়ে না যায়। কিন্তু গাড়িতে ঘুমিয়ে নেশাটা এখন একটু ধাতস্থ হয়েছে। সুতরাং বোতল থেকে অল্প অল্প পানীয় গলায় ঢালতে ঢালতে বাড়ির পথে ভালই এগোল কিশোর।

এক সময়ে কিশোরের খেয়াল হল যে তার হাতের বোতল শূন্য হয়ে গেছে এবং সে নিজের বাড়ির সামনে এসে গেছে।

কিশোরের কাছে বাড়ির সদর দরজার একটা ডুপ্লিকেট চাবি থাকে। এই মাতাল অবস্থাতেই সেটুকু খেয়াল আছে তাব। পকেট হাতড়িয়ে চাবিটা বার করল কিশোর, ভাগ্যিস গাড়ির মধ্যে পড়ে যায়নি, শান্তিনিকেতনী ব্যাগটা তো গাড়িতেই রয়ে গেল।

কিশোরের মাথাটা ঝিমঝিম করছে। পরের বারের মদটা না খেলেই ভাল হত। তার হাত পা টলছে, কিছুতেই চাবি দিয়ে বাড়ির দরজাটা খুলতে পারছিল না কিশোর। বার বার চাবির মুখটা পিছলে পিছলে যাচ্ছিল।

হঠাৎ পিছন থেকে একটা পুলিসের কালো গাড়ি এসে দাঁড়ালো। গাড়ির পিছনের দরজা দিয়ে নেমে এল লম্বাচওড়া হৃষ্টপুষ্ট গুম্ফমান এক হিন্দুস্থানী জমাদার। জমাদারজীর গায়ে লংক্লথের ঢোলাহাতা পাঞ্জাবির সঙ্গে মালকোঁচা দিয়ে ধুতি পরা পায়ে কালো পামশু।

জমাদার সাহেব নেমেই প্রথমে কিশোরের হাত থেকে বোতলটা ছিনিয়ে নিলেন এবং সেটা শূন্য দেখে একটু রেগে সেটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, তারপরে ঘাড়ের পেছন থেকে কিশোরের জামার কলারটা ধরে হুমকি দিলেন, 'এই মাতাল, এত রাতে হচ্ছেটা কী? চল্, থানায় চল্।'

পুলিস বুঝতে পেরে কিশোর একটু থমকিয়ে গেল, তারপর হেঁচকি তুলে বলল, 'জমাদারসাহেব, বাড়িতে ঢুকব, তাই দরজাটা চাবি দিয়ে খুলছি...' বলে হাতের চাবিটা তুলে দেখালো।

জমাদারসাহেব অবাক হলেন, 'বাড়ি? দরজা? কেয়া বোলতা তুম?'

কিশোর করজোড়ে বলল, 'হুজুর, এই আমার বাড়ির সদর দরজা আর দোতলায় ঐ যে দেখছেন আলো জ্বলছে, ওটা আমার শোয়ার ঘর।'

একটা খারাপ গালাগাল দিয়ে কিশোরের কলার ধারে শক্ত হাতের মুঠোয় একটা জোরে ঝাঁকানি দিলেন জমাদার সাহেব।

ঝাঁকুনি খেয়ে কিশোরের মাথা থেকে কিছুটা অ্যালকোহল নেমে গেল। সে দেখতে পেল যে সে এতক্ষণ ধরে বাড়ির সামনের ল্যাম্পপোস্টটায় চাবি লাগানোর চেষ্টা করছিল এবং পোস্টের ওপরের বালবটাকে ভাবছিল তার দোতলার শোয়ার ঘরের আলো, যেটা জানলা দিয়ে রাস্তা থেকে দেখা যায়।

একটু সম্বিৎ ফিরে এসেছে কিশোরের। কিন্তু এখন জমাদারসাহেব তাকে ঘাড়ে ধরে পুলিসভ্যানের দিকে ঠেলা শুরু করেছে। সে কাকুতিমিনতি করতে লাগলো, 'জমাদার সাহেব, ছেড়ে দিন। এই দেখুন, সত্যি এই সামনের দোতলা বাড়িটা আমার।

কিশোরের কথা শুনে জমাদারসাহেবের মনে হল, হয়ত লোকটা মিথ্যে কথা বলছে না। তাছাড়া এত রাতে থানায় মাতাল নিয়ে যাওয়া সেও এক হাঙ্গামা। সুতরাং দেখা যাক সত্যিই এই সামনের বাড়িটা এই মাতালটার কিনা। তাহলে এটাকে ছেড়ে দিয়ে থানায় গিয়ে ঘুমনো যায়, রাতেও অনেক হয়েছে।

জমাদারসাহেবের বজ্রমুষ্ঠি কিঞ্চিৎ শিথিল হতে কিশোর নিজের সদর দরজার দিকে এগোল। কর্তব্যপরায়ণ জমাদার সাহেব কিন্তু পিছু ছাড়লেন না।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পিতলের যুগ্ম নেমপ্লেটের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করল কিশোর, তারপর নিজের বুকে হাত রেখে বলল, 'ঐ যে প্রথম লাইনে লেখা দেখেছেন মিঃ কে কে পাল, ঐ কে কে পাল কিশোরকুমার পাল হলাম আমি। আর নিচের লাইনে মিসেস এস পাল মানে মিসেস শ্যামা পাল হলেন আমার পত্নী।'

আত্মপরিচয় শেষ করে দরজায় চাবি লাগিয়ে ঘোরালো কিশোর, দরজাটা খুলে গেল। ভেতরে ঢুকে সিঁড়ির নিচের বাতিটা সুইচ টিপে জ্বালালো কিশোর। জমাদারসাহেব ইতস্তত করছিলেন, কিশোর তাঁকে অনুরোধ করল, 'আসুন, ভেতরে আসুন স্যার।'

জমাদারসাহেব ভেতরে আসতে সামনের দেওয়ালে একটা বড় ফটো দেখিয়ে কিশোর বলল, 'এটা হলো আমার শ্বশুরমশায়ের ছবি, মিস্টার পরেশচন্দ্র দাশ, আয়রন মার্চেন্ট। লোহাপট্টিতে নিজের গদি আছে।'

আর সরজমিন করার ইচ্ছা নেই জমাদারসাহেবের কিন্তু কিশোর তাঁকে জোরজার করে দোতলায় তুলল। দোতলায় উঠে ছোট বারান্দা পেরিয়ে শোবার ঘর।

এবার একটা ছোট নাটক হল।

কিশোরের বউ শ্যামাসুন্দরীর চরিত্র বিয়ের আগে যেমন ছিল, বিয়ের পরেও তাই রয়েছে। মোটেই বদলায়নি। কিন্তু সে তার চরিত্রদোষের কথা ঘুণাক্ষরেও কিশোরকে টের পেতে দেয় না। তবু অত্যন্ত সেয়ানা হওয়া সত্ত্বেও আজ সে একেবারেই আঁচ করতে পারেনি যে, তার স্বামী যার সোমবার সকালে ফেরার কথা সে শুক্রবার রাত কাবার হওয়ার আগেই ফিরে আসবে।

শোয়ার ঘরে আলো জ্বলছিল, বড় ডাবল বেডের খাটে শ্যামা শুয়েছিল। সহসা ঘরের মধ্যে কিশোর ও জমাদারসাহেবের প্রবেশ। শ্যামা এবং শ্যামার সঙ্গী দুজনেই পরস্পরের কণ্ঠলগ্ন হয়ে ঘুমে অচেতন, কেউ কিছু টের পেল না।

শয়নঘরের ঘনিষ্ঠ দৃশ্য দেখে জমাদারসাহেব বেরিয়ে আসছিলেন, তাঁকে হাতে ধরে দাঁড় করালো কিশোর, তারপরে বিছানার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, 'ঐ যে দেখুন, বালিশের ওপর খোলা চুল, নীল শাড়ি পড়া ঐ হল শ্যামাসুন্দরী আমার ওয়াইফ, আর ওর পাশে ওর গলা জড়িয়ে শুয়ে ঐ হলাম আমি, কিশোরকুমার পাল', এই বলে কিশোর নিজেকে নির্দেশ করল।

অবস্থা কিছুতে বুঝতে না পেরে কিশোরের হাত ছাড়িয়ে জমাদারসাহেব 'তোবা তোবা' করতে করতে এক দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে রাস্তায় কালো গাড়িতে উঠে বসলেন। হুশ করে ধোঁয়া ছেড়ে ভ্যানটা চলে গেল।

জমাদারসাহেবকে আরও কিছু বোঝানোর জন্যে তাঁর পিছু পিছু কিশোর সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এসেছিল। কিন্তু জমাদারসাহেব রণে ভঙ্গ দেওয়ায় সে বিফলনোরথ হয়ে সিঁড়ির নিচের আলো নিবিয়ে সদর দরজা বন্ধ করে দোতলায় উঠে গেল। তারপর গুটিসুটি হয়ে শ্যামাসুন্দরীর পাশে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ আর ঘরের মধ্যে কথাবার্তা শুনে একটু আগেই শ্যামাসুন্দরীর ঘুম ভেঙেছিল। এমন বিপদে সে আর কখনও পড়েনি। সিঁড়ি দিয়ে কিশোর যখন নেমে গেল সে ভেবেছিল এখনকার মত কিশোর বিদায় হল, পরে যদি আজকের ব্যাপারে কোনও কথা তোলে, ঝেড়ে অস্বীকার করবে। বলবে, 'মাতাল অবস্থায় কি না কি দেখেছো, তার ঠিক নেই।'

কিন্তু এখন কিশোর এসে পাশে শুয়ে পাড়ায় শ্যামাসুন্দরী বিচলিত বোধ করতে লাগলো। তবু ভাল যে এ পাশে শুয়েছে, ও পাশের লোকটার ওপরে গিয়ে পড়েনি!

কিশোরের মাথার মধ্যে কি সব এলোমেলো চিন্তা ঘুরছিল। একটু আগে সে কি একটা দেখেছে যেটা মোটেই ঠিক নয়। সে শ্যামাকে একটা ধাক্কা দিল, শ্যামা জবাব দিল, 'উঁ'!

কিশোর শ্যামাকে বলল, 'ওগো আমাদের বিছানায় তোমার পাশে আর কেউ কি শুয়ে আছে?

এ প্রশ্ন শুনে শ্যামা ধমকিয়ে উঠল, 'কি-যা তা বলছো! মদ টেনে টেনে তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে!'

ধমক খেয়ে একটু চুপসিয়ে গেল কিশোর। কিন্তু তবুও তার মনের মধ্যে সন্দেহের কাঁটা খোঁচা দিতে লাগল। সে বালিশ থেকে একটু মাথা উঁচু করে নিচের পায়ের দিকে তাকিয়ে ভাল করে গুনলো, তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'ওগো, বিছানায় যদি আর কেউ না থাকবে তবে নিচের দিকে ছটা পা দেখা যাচ্ছে কী করে?'

এ কথায় চতুরা শ্যামাসুন্দরী কপাল চাপড়িয়ে কেঁদে উঠল, 'ছিঃ ছিঃ, আমার নামে এই অপবাদ! আমি দুশ্চরিত্রা? আমি মিথ্যাবাদী?'

বোকা বনে গিয়ে শ্যামাসুন্দরীর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে কিশোর স্বীকার করল যে সে অনেক মদ খেয়েছে সন্ধ্যা থেকে, প্রায় দেড় বোতল। সুতরাং তার ভুল হতেই পারে। মাতালে তো সব জিনিসই বেশি বেশি দেখে। হয়ত চারটে পা-কেই

সে ছ'টা দেখেছে, নেশার ঘোরে গুনতে ভুল করেছে।

শ্যামাসুন্দরী এখন ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে লাগলো আর বলতে লাগলো, 'তুমি কি করে আমাকে দুশ্চরিত্রা ভাবলে! এ সব মদ খেয়ে নেশার ঘোরে অনুমানের কথা নয়, তুমি একবার খাট থেকে নেমে আমাদের পা-গুলো গুনে এসো, তারপরে আমাকে বলো।'

কিশোরের তখন মাথা টলছে তবু স্ত্রীর আদেশে খাট থেকে নেমে পায়ের কাছে গিয়ে খুব সতর্ক হয়ে হয়ে বেশ কয়েকবার পায়ের সংখ্যা গুনলো। বলা বাহুল্য, প্রত্যেকবারই পায়ের সংখ্যা দাঁড়ালো চার। এক, দুই, তিন, চার—এইভাবে বার কয়েক গুনবার পরে কিশোর বলল, 'ওগো, আমাকে মাপ করো দাও। সত্যিই নেশার ঘোরে আমি পা গুনতে ভুল করেছিলাম। ঠিক দুজনার চারটে পা-ই রয়েছে বিছানায়।'

তারপর খাটের নিচে বসে অনুতপ্ত কিশোর সামনের পা-দুটো জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলো। সে পা-দুটো যে কার কে জানে!

বিষ

বাংলা গল্পের ইংরেজীতে নাম দেওয়া মোটেই উচিত নয়। তাই বাধ্য হয়ে এ গল্পের নাম দিতে হল 'বিষ'। না হলে গল্পটির প্রকৃত নাম হয় পয়জন (Poison), অবশ্য ইংরেজি শব্দটি বাংলা হরফে 'পয়জন' লিখলেও চলত। তবে শব্দটা গল্পের নাম হিসেবে চোখে ভাল লাগছে না। তাই অগত্যা 'বিষ', বিষই বা খারাপ কী?

গল্পের ভিতর যাতে কোনও অনাবশ্যক জটিলতার সৃষ্টি না হয় তাই পয়জনের ব্যাপারটা একটু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

'পয়জন' একটি জগৎবিখ্যাত সুরভির নাম। আগেকার দিনে যেমন সুগন্ধির নামকরণে প্রস্তুতকারকেরা প্রায়ই কিছুটা, কোথাও বা চূড়ান্ত রোমান্টিকতা দেখাতেন যেমন 'ইভনিং ইন প্যারিস' বা প্যারিসের সায়াহ্ন অথবা প্রগাঢ় 'ইনটিমেট'।

এখনকার প্রচলিত বিদেশি সুরভিগুলোর নাম আর তেমন মধুর রোমান্টিক নয় বরং উল্টো, তীব্র তীক্ষ্ণ সেই সব নাম। ব্ল্যাক উইডো, ব্রুট বা পয়জন এসব নাম দেখে অনুমান করাই কঠিন এগুলো প্রসাধন সামগ্রী, গন্ধদ্রব্য। কাউন্টারে আনকোরা ক্রেতারা এসব নাম দেখে কখনও কখনও যে ভড়কিয়ে যায় না তা নয়।

আপাতত এই ক্ষুদ্র গৌরচন্দ্রিকার পরে আমরা আসল কাহিনীতে সরাসরি প্রবেশ করছি।

স্মৃতিশেখর দত্ত উত্তর আমেরিকার মার্কিন যুক্তরাজ্যের একটি ভুবনবিদিত প্রতিষ্ঠানের উচ্চস্তরের গবেষক। তাঁর বিষয় হল ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান। পদার্থ, রসায়ন ও উদ্ভিদবিদ্যার সীমান্ত এলাকায় তাঁর কলাগাছের ফলের মধ্যে তাপ লেগে যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা ফল পাকে, সেই প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা যায় কি না এই নিয়ে স্মৃতিশেখর গত সাড়ে দশ বছর গবেষণা করছেন। এই গবেষণায় যদি তিনি সফল হতে পারেন তাহলে হয়ত অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীতে ফল উৎপাদন দ্বিগুণ, তিনগুণ হারে বেড়ে যাবে। এবং সেই সঙ্গে স্মৃতিশেখর নোবেল পুরস্কারও পেয়ে যেতে পারেন।

স্মৃতিশেখরের বয়স চুয়াল্লিশ। আজ প্রায় দীর্ঘ কুড়ি বছর তিনি মার্কিন দেশে আছেন। তিনি কলকাতারই ছেলে, কলকাতা থেকেই বিদেশে গিয়েছিলেন। কিন্তু এখন আর দু-চারজন পুরনো বন্ধুবান্ধব, দূর সম্পর্কের কিছু আত্মীয় ছাড়া কলকাতায় তাঁর আর কেউ নেই। মা-বাবা উভয়েই বেশ কিছুদিন হল বিগত হয়েছেন। থাকার মধ্যে এক দিদি আছেন, তাঁর জমজমাট সংসার বর্ধমানে।

স্মৃতিশেখর মুক্ত পুরুষ। বছর পনের আগে একবার কলকাতায় এসে বিয়ে করেছিলেন। তখন মা-বাবা বেঁচেছিলেন, কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে, পাত্রী যাচাই করে, গড়িয়াহাট রোডে বিশাল বাড়ি ভাড়া করে, দেশাচার কালাচার পালন করে, শাস্ত্রসম্মতভাবে স্মৃতিশেখরের বিয়ে হয়েছিলো। সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী, বিদূষী, সুলক্ষণা, সর্বগুণসম্পন্না, গৃহকর্মনিপুণা ইত্যাদি রবিবারের খবরের কাগজের বিজ্ঞাপিত পাত্রীর যা যা যোগ্যতা থাকে স্মৃতিশেখরের স্ত্রী প্রিয়ংবদার সে সবই ছিল।

তবে কিছুদিন সংসার করার পর স্মৃতিশেখর আবিষ্কার করেছিলেন যে তাঁর স্ত্রী আর যাই হোক না কেন প্রিয়ংবদা নন। প্রবাসে কঠোর পরিশ্রমের পর বাড়ি ফিরে সামান্য বিশ্রাম ও শান্তির সময়ে প্রায় অকারণে প্রিয়ংবদার কর্কশ ও নিষ্ঠুর বাক্যবাণ স্মৃতিশেখরের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল।

প্রিয়ংবদার রাগ হয়ত অকারণ ছিল না। মার্কিন শহরতলিতে নির্জন, বন্ধ বাড়িতে নিঃসঙ্গ জীবন তাঁকে খিটখিটে করে তুলেছিল। এমনিই আশৈশব তিনি অসহিষ্ণু ছিলেন। তাছাড়া মার্কিনীদের কথা বোঝার অপারগতা এবং সেইসঙ্গে ইংরেজিতে মৌখিক কথাবার্তা চালানোর অভ্যাস না থাকায় প্রিয়ংবদা বিদেশে একেবারে কোণঠাসা হয়ে গিয়েছিলেন।

প্রথম দু-চার মাস সাহেবি জীবনধারার চটক ও চমক দেখে এবং মধুচন্দ্রিমার আমেজে মোটামুটি ভালই ছিলেন প্রিয়ংবদা কিন্তু পরে অস্থির হয়ে পড়লেন। সেই অস্থিরতা প্রকাশিত হল স্মৃতিশেখরের প্রতি ব্যবহারে।

আরও একটা কারণ এখানে উল্লেখ করা রাখা উচিত। অনেকদিন ওদেশে থাকার ফলে নিজের প্রতিষ্ঠানে এবং বাইরে স্মৃতিশেখরের বেশ কিছু বন্ধুবান্ধবী হয়েছিল, সাহেবমেম, ভারতীয় সব রকমই।

প্রথম থেকেই এদের কাউকেই প্রিয়ংবদা মোটেই সহ্য করতে পারেননি। তাঁর কেমন সন্দেহ হয়েছিল এরা সবাই তাঁকে করুণার চোখে দেখে। এবং সন্দেহটা ঠিকই ছিল। সবাই ভাবত স্মৃতিশেখরের মত ব্রিলিয়ান্ট লোক কি করে এমন সঙের পুতুলের মত শাঁখা, সিঁদুর পরা মেয়ে সম্বন্ধ করে বিয়ে করে নিয়ে এল।

আবশেষে যা অনিবার্য তাই ঘটল। একটা সদ্য দেশ থেকে আসা বাঙলি ছেলে তারও প্রিয়ংবদার মত একঘরে অবস্থা। তবে তার একটা কাজ আছে এই যা তফাত। অচিরেই সেই ছেলেটি আর তার প্রিয়ংবদা বৌদি খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে গেল। সময়ে অসময়ে ছুটির দিনে সে যথাসাধ্য প্রিয়ংবদা বৌদিকে সঙ্গদান করতে লাগল।

একদিন অতিরিক্ত সঙ্গদান করার সময়ে স্মৃতিশেখর হঠাৎ একটু অসুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে আসেন। তখন স্মৃতিশেখরের মুখ দর্শন করার অবস্থা প্রিয়ংবদার ছিল না। তিনি দয়িতের সঙ্গে পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে একবস্ত্রে স্বামীগৃহ ত্যাগ করেন।

তারপরে প্রিয়ংবদার কোন খোঁজখবর স্মৃতিশেখর নেননি। দেশ থেকে প্রিয়ংবদার নামে কখনও দুয়েকটা চিঠিপত্র প্রথম দিকে এসেছে, সেগুলো 'প্রাপক অনুপস্থিত' লিখে পরের ডাকে প্রেরকের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছেন।

মুক্ত জীবন স্মৃতিশেখর মেনেই নিয়েছিলেন। এখানে বহুলোক এরকম জীবন যাপন করে। কিন্তু গত বছর দেশ থেকে দিদি এসেছিলেন তাঁর কাছে বেড়াতে। স্মৃতিশেখরই দিদিকে একটা রিটার্ন টিকিট পাঠিয়ে ছিলেন।

স্মৃতিশেখর এক মেমসাহেবের সঙ্গে তখন যুগ্ম জীবনযাপন করছিলেন। মাস দুয়েকের জন্যে সেই মেমসাহেবকে তিনি অন্যত্র রাখার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু দিদি আসার পরেও সেই মেমসাহেব মাঝেমধ্যেই আসত, রাতে থেকে যাওয়ার চেষ্টা করত।

বুদ্ধিমতী অগ্রজার দৃষ্টি এড়াতে পারল না এই ব্যাপারটা। দিদি স্মৃতিশেখরকে বললেন, 'ঐ ক্যারল না কি নাম ঐ মেয়েটার, ওর বয়েস কত?'

স্মৃতিশেখর ক্যারলের এ দিকটা কখনও ভেবে দেখেননি, আমরা আমতা করে অনুমানে বললেন, 'তা বোধহয় পঞ্চাশ, পঞ্চান্ন হবে।'

দিদি তাই শুনে বললেন, 'এ কি অলক্ষুণে কথা। তাহলে তো ওর বয়েস আমার চেয়ে বেশি।'

মূল মার্কিন ভূখণ্ডে এ জাতীয় কথা খুব বেশি হয় না। স্মৃতিশেখর কী আর বলবেন, চুপ করে রইলেন।

স্মৃতিশেখর কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর দিদি চেপে ধরলেন, 'এ ভাবে চলবে না। এ কি অনাচার। পশুর জীবন। তুই আবার বিয়ে কর।'

স্মৃতিশেখর সহজে রাজি হননি। অনেক দোনামনা করে আগের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা দিদিকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে অনেক কথা বললেন তিনি। তাছাড়া বয়েস বাড়ার ব্যাপারটা রয়েছে।

দিদি বললেন, 'তোর আর কি বয়েস হয়েছে। তুই এবার দেশে আয়। এবার আর ভুল হবে না। এবার তোর যোগ্য, উপযুক্ত মেয়ে দেখে রাখব।'

স্মৃতিশেখর বললেন, 'আমি বছরখানেকের মধ্যে এখানকার পাট গুটিয়ে দেশে ফিরে যাচ্ছি। গবেষণা ঢের হয়েছে, বয়েসও বেড়ে যাচ্ছে। তখন দেশে ফিরে গিয়ে আবার বিয়ে করার কথা ভাবা যাবে।'

স্মৃতিশেখর ভেবে দেখেছেন গত কয়েক বছর ধরে তাঁর গবেষণা প্রায়ই একই জায়গায় ঠেকে রয়েছে, হঠাৎ নতুন করে আর কিছু হওয়ার সম্ভাবনা কম। হাতে যে পরিমাণ ডলার জমেছে তা ছাড়া বাড়ি, গাড়ি বেচে যা পাওয়া যাবে ভারতীয় টাকায় তার পরিমাণ অকল্পনীয়। সে টাকায় কলকাতায় সবচেয়ে ভাল ফ্ল্যাট কিনে, ব্যাঙ্কে টাকা জমা রেখে তার সুদে একটা জীবন চমৎকার কেটে যাবে।

সেই চমৎকার জীবন কাটানোর জন্যে অবশেষে স্মৃতিশেখর দেশে ফিরে এসেছেন। আগেই দক্ষিণ কলকাতায় একটা ফ্ল্যাট বায়না করে রেখেছিলেন এক বন্ধুর মারফত। এখন ফিরে এসে টাকা-পয়সা মিটিয়ে, ফার্নিচার কিনে সাজিয়ে-গুছিয়ে সেই ফ্ল্যাটে উঠেছেন।

অতঃপর দিদির বুদ্ধিমত ও পছন্দমত একটি বয়স্কা পাত্রীও সংগ্রহ হয়েছে।

বছর চল্লিশ বয়েস হবে হিমানী নামে এই পাত্রীটির। বিবাহ ব্যাপারে হিমানীর অভিজ্ঞতা বিস্তর। বছর দুয়েক আগে ডিভোর্স হয়েছে স্বামীর সঙ্গে। তার আগে একবার বিধবা হয়েছিলেন। তবে প্রথম বিয়েটার কথা সবাই জানে না, স্মৃতিশেখরের দিদিও জানেন না। তিনি খবরের কাগজে 'উদার মতাবলম্বী, সংস্কারমুক্ত পাত্র চাই। পাত্র নিজেও যোগাযোগ করিতে পারেন' এই বিজ্ঞাপন দেখে যোগাযোগ করেছিলেন।

হিমানী গায়ে গতরে শক্ত-সমর্থা, আঁটোসাটো মেয়েমানুষ। একটি সওদাগরি দপ্তরে ব্যক্তিগত সচিবের কাজ করেন। বহুদর্শী রমণী এবং একটু দুশ্চরিত্রাও, সেটা অবশ্য হিমানী মনে করে তাঁর চাকরির অঙ্গ।

স্মৃতিশেখর-জাতীয় ব্যক্তি সম্পর্কে হিমানীর অল্পবিস্তর অভিজ্ঞতা আছে। তাঁর অফিসেও ওপরওয়ালাদের মধ্যে দুয়েকজন বিলেতফেরত গবেষক, তার মধ্যে একজন রীতিমত লম্পট। হিমানী তাঁকেও কখনও কখনও সাহচর্য দিয়েছেন।

এই হিমানীদেবীর সঙ্গে স্মৃতিশেখর দত্তের বিয়ে আজ দুপুরেই রেজিস্ট্রি হয়েছে, নিতান্ত সাদাসিধেভাবে আজ স্মৃতিশেখরের দক্ষিণ কলকাতার ফ্ল্যাটে বিবাহরজনী তথা ফুলশয্যা পালিত হচ্ছে।

স্মৃতিশেখরের দিদি-জামাইবাবু, ভাগ্নে-ভাগ্নিরা দিনের বেলায় এসেছিল, তারা সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় বর্ধমান ফিরে গেছে। হিমানীর অফিসের কেউ কেউ আর এক ছোটভাই এসেছিল, স্মৃতিশেখর নিজে থেকে কাউকে বলেননি। নবদম্পতিকে অভিনন্দন জানিয়ে হিমানীর লোকেরাও কিছু আগে বিদায় নিয়েছে।

শূন্য ফ্ল্যাটে এখন শুধু হিমানী আর স্মৃতিশেখর।

স্মৃতিশেখর বহুদিন মার্কিন দেশে থাকলেও সাধারণত মদ্যপান করেন না। বিমানবন্দরে সস্তায় কেনা এক বোতল কনিয়াক ছিল তাঁর কাছে, সম্পূর্ণ অটুট।

আজ এই মধুর সন্ধ্যায় তিনি সেই পানীয়ের বোতল খুলে বললেন। দেখা গেল, সুপানীয়ে হিমানীর অরুচি নেই।

শৌখিন জাফরিকাটা ফিকে নীল বিলিতি কাচের গেলাসে বরফকুচি দিয়ে সোনালী কনিয়াক খেতে খেতে খুবই অন্তরঙ্গ ও ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়লেন স্মৃতিশেখর ও হিমানী। অনেক গোপন অন্তরঙ্গ কথাবার্তা হল তাঁদের মধ্যে। দুজনেই কিঞ্চিৎ বেশি মদ্যপান করে ফেললেন।

স্মৃতিশেখর তাঁর দুঃখময় প্রাক্তন দাম্পত্যজীবনের কাহিনী করুণভাষায় ব্যক্ত করলেন। সে গল্প শুনে হিমানীর চোখে জল এল। বিশেষ করে মত্ত স্মৃতিশেখর যখন বললেন, 'এবারে যদি তাঁর দাম্পত্যজীবন সুখের না হয়, তিনি আত্মহত্যা করবেন।' এবং এই বলে সত্যিই যখন স্মৃতিশেখর হিমানীকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন, কিছুটা আবেগের আতিশয্যে কিছুটা কনিয়াকের প্রভাবে হিমানী কেমন গোলমাল হয়ে পড়লেন।

কথায় কথায় হিমানী তাঁর প্রাক্তন দুই পতিদেবতার গল্প এবং কখনও সখনও অল্পস্বল্প নৈতিক পদস্খলনের কাহিনী স্মৃতিশেখরকে শোনালেন। কিন্তু স্মৃতিশেখর তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, তাঁর এই গল্প শুনতে শুনতে কখন যে স্মৃতিশেখর ঘুমিয়ে পড়েছেন।

মধুযামিনীতে সহধর্মিণীকে উপহার দেওয়ার জন্য 'পয়জন' নাম মহার্ঘ সুরভি, সেও বিমানবন্দরে ডিউটি ফ্রি শপ থেকে কেনা, এক শিশি বালিশের নিচে রেখেছিলেন স্মৃতিশেখর।

স্মৃতিশেখরের মাথার চাপে সেই সুদৃশ্য মসৃণ শিশিটা বালিশের নিচ থেকে বেরিয়ে এসেছে। বাল্লিশের ওপর স্মৃতিশেখরের মাথাটা ঠিক করে দিতে গিয়ে হঠাৎ শিশিটা বিশেষ করে শিশিটার নামের দিকে হিমানীর চোখ পড়ল। এ নামের কোন সুরভি আছে হিমানী তা জানেন না।

মুহূর্তের মধ্যে মত্ত হিমানী ধরে নিলেন স্মৃতিশেখর আত্মহত্যার জন্য সদাই প্রস্তুত। মাতাল অবস্থাতেই তিনি ভাবতে লাগলেন আমার প্রাক্তন জীবনের সেইসঙ্গে চরিত্রের দোষের যে সব কথা বলে ফেললাম ঘুম থেকে উঠে সে সব মনে পড়লে স্মৃতিশেখর হয়ত তখনই ঐ পয়জন খেয়ে সুইসাইড করবে।

কনিয়াকের বোতলে তখনও কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট ছিল। দুশ্চিন্তা করতে করতে বোতল

থেকে সরাসরি ঢক্‌ঢক্‌ করে পান করতেলাগলেন হিমানী। অবশেষে তাঁর ভাবনাচিন্তা কেমন এলোমেলো হয়ে গেল।

টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়ে একবার বাথরুম থেকে ঘুরে এসে একটা ভয়াবহ সিদ্ধান্ত নিলেন হিমানী। মরতে যদি হয় আমিই মরব, আমার এই অপবিত্র নারীদেহ থাকা না থাকা সমান। স্মৃতিশেখরের মত ভাল লোকটাকে মরতে দেওয়া যায় না।

মাতালের যেমন চিন্তা তেমন কাজ। মুহূর্তের মধ্যে বালিশের পাশে হাত দিয়ে পয়জনের শিশিটা তুলে নিয়ে, একটু কষ্ট করে ছিপিটা খুলে পুরো শিশিটা নিজের গলার মধ্যে ঢেলে দিলেন হিমানী। এবং সঙ্গে সঙ্গে এক আর্ত চেঁচানি বেরিয়ে এল তাঁর গলা দিয়ে।

সেই আর্তনাদে স্মৃতিশেখরের নেশা কেটে গেল। তিনি ধড়পড় করে উঠে বসলেন, দেখতে পেলেন মেঝেতে শূন্য পয়জনের শিশি গড়াগড়ি যাচ্ছে আর মহামূল্য সুরভি হিমানীর ঠোঁটের কষ বেয়ে গড়াচ্ছে। তার মুখ দিয়ে কেমন গ্যাঁজলা বেরচ্ছে।

স্মৃতিশেখর বুদ্ধিমান লোক। একটু সময় লাগল ব্যাপারটা অনুধাবন করতে। তারপর হিমানীর গলায় আঙুল দিয়ে বমি করাতে লাগলেন। হিমানীর মুখ থেকে দরদর করে বেরিয়ে বিশ্ববিখ্যাত সুরভির গন্ধে আমোদিত হয়ে উঠল ফ্ল্যাট গৃহ। সেই মধুযামিনীর ফুলশয্যা কক্ষে যদি আড়ি পাতা যেত তাহলে দেখা যেত আধো ঘুমে আধো জাগরণে মদিরাময় স্মৃতিশেখর আর সুরভিস্নাতা হিমানী পরস্পরের বক্ষলগ্ন হয়ে কি সব অস্ফুট কথা বলছেন। সারা ঘরে ভুরভুর করছে ভুবনমোহিনী সৌরভ।

মাতালের কথা

সেই সব বুদ্ধিমান পাঠক এবং বুদ্ধিমতী পাঠিকারা, যাঁরা আমার 'দুই মাতালের গল্প' নামক গোলমেলে বইটি পড়েছেন তাঁরা অনায়াসেই আশঙ্কা করতে পারেন, 'এই রে, আবার পুরনো গল্প বলতে যাচ্ছে লোকটা।'

আমি প্রথমেই আশ্বস্ত করতে চাই যে এটি একটি আনকোরা গল্প। আসলে একটি নয় আড়াইখানা গল্প, একই ব্যক্তিকে নিয়ে। দুই মাতালের গল্প ছিল দুজন মদ্যপের, আর একটি হল একই মাতালকে নিয়ে দুটি গল্প, সঙ্গে আধখানা ফাউ।

গল্পের নায়কের নাম নিরানন্দ, পদবী নিষ্প্রয়োজন।

নিরানন্দ একজন খারাপ জাতের মাতাল। সময় সময়ে তিনি মদ্যপান করেন এবং প্রায় সদাসর্বদা টইটম্বুর হয়ে থাকেন।

শ্রীযুক্তা নিরানন্দা দেবী, যে কোনও মদ্যপের সতীসাধ্বী স্ত্রী মতোই যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন স্বামীকে মদ্যপান থেকে বিরত করতে, বলা বাহুল্য পারেননি।

গালাগালি, অনশন, শয়নকক্ষে ছিটকিনি দিয়ে স্বামীর মাথায় জল ঢালা এমন কি তাঁকে ঝাঁটাপেটা করা ইত্যাদি যতরকম প্রচলিত অস্ত্র আছে পতিপরায়ণা স্ত্রীদের হাতে, সবই নিরানন্দা দেবী প্রয়োগ করে দেখেছেন, কিন্তু কিছুতেই কোনও ফল হয়নি।

অবশেষে খবরের কাগজে 'মদ খাওয়া ছাড়াইবার প্রকৃত পদ্ধতি' নামক বিজ্ঞাপন দেখে নিরানন্দা দেবী দাড়িওয়ালা রামবাবার এক ডোজ ওষুধ বহুমূল্যে কিনে আনেন।

রামবাবার ওষুধ সকালবেলা সূর্য ওঠার আগে ঘুম থেকে উঠে খালি পেটে খেতে হয়। এদিকে নেশা করে বেশি রাতে বাড়ি ফিরে নিরানন্দের ঘুম থেকে উঠতে সাড়ে আটটা হয়ে যায়।

একদিন বহুকষ্টে ভোরবেলা নিরানন্দকে ঘুম থেকে তুলে, কিছু বোঝার আগে জোর করে হাঁ করিয়ে নিরানন্দা দেবী সেই মন্ত্রপুতঃ ওষুধ বড় এক চামচে খাওয়ালেন।

কিছু অনুমান করে নিরানন্দ প্রশ্ন করলেন, 'কী ব্যাপার?'

সত্যের খাতিরে এবং খাওয়ানো যখন হয়েই গেছে এই ভেবে নিরানন্দা দেবী রামবাবার কথাটা বললেন। নিরানন্দের তখনও আগের রাতের খোয়ারি ভাঙেনি। তিনি বললেন, 'আমি খাই হুইস্কি, রামবাবার ওষুধে আমার কী হবে। হুইস্কি বাবা কেউ থাকলে তার কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে এস।'

কথা শেষ করার আগেই কিন্তু নিরানন্দবাবু কপালে চোখ তুলে গোঁ-গোঁ করতে করতে বিছানার ওপরে লুটিয়ে পড়ে কাটা পাঁঠার মতো ছটফট করতে লাগলেন আর স্ত্রীকে বললেন, 'ওগো, একটা কাগজে লিখে নিয়ে এস, 'আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়,' আমি তার নিচে সই করে দিচ্ছি, না হলে তুমি কিন্তু ঘোর বিপদে পড়বে।'

সে এক কেলেঙ্কারি!

নিরানন্দা দেবী ওরকম বিপদে আর কখনও পড়েননি। সেই সাত সকালে পাড়ার লোক দিয়ে ডাক্তার ডাকিয়ে আনতে হল।

ইতিমধ্যে নিরানন্দবাবু অজ্ঞানের মতো হয়ে গেছেন। তাতে ছটফটানিটা কমেছে কিন্তু স্ত্রীর দুশ্চিন্তা বহুগুণ বেড়ে গেছে।

সাড়ে সাতটা নাগাদ ডাক্তার এসে দেখলেন নিরানন্দ নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন। কপালে হাত দিয়ে, নাড়ি পরীক্ষা করে ডাক্তারবাবু বললেন, 'ওঁর কিছু হয়নি। উনি পরম আরামে ঘুমোচ্ছেন। আমাকে ডাকতে গেলেন কেন? মর্নিং ওয়াক করা হল না।' গজগজ করতে করতে চল্লিশ টাকা ফিজ নিয়ে ডাক্তারবাবু চলে গেলেন।

নিরানন্দা দেবীর মনে এখনও সন্দেহ আছে যে সেদিন সকালে তাঁর স্বামী পুরোটা অভিনয় করেছিলেন। কিন্তু নিরানন্দবাবুর একটা উপকার হয়েছে। নিরানন্দা দেবী তাঁর স্বামীর মদ খাওয়া ছাড়ানোর আর চেষ্টা করেননি।

অতঃপর দ্বিতীয় অথচ অদ্বিতীয় গল্পটি বলা যায়। অবশ্য একে গল্প না বলে একটি শোকগাথা বলা যেতে পারে। অন্য এক নিরানন্দবাবুর কাহিনী।

গল্পটি সরাসরি বলি, একদম ভনিতা না করে।

ভরদুপুরে শ্রীযুক্ত নিরানন্দবাবু সাতিশয় নিরানন্দ বদনে একটি বারে প্রবেশ করেছেন। বারটি তাঁর বহু পরিচিত, এখানকার গেটম্যান থেকে বেয়ারা, বেয়ারা থেকে ম্যানেজার এমনকি স্থায়ী মাতালেরা তাঁকে ভালো চেনে।

কিন্তু আজ এই মধ্য সপ্তাহের দুপুরবেলায় বার প্রায় খালি। বড় বড় শ্বেত পাথরের গোল টেবিলে আক্ষরিক অর্থে মাছি ঘুরছে। চর্বিত এবং নিক্ষিপ্ত চাটের অভাবে বিড়ালকুল মেজে ছেড়ে উঠে বারের জানলায় 'মিউ মিউ' করছে।

বারের শেষ প্রান্তে একটি ফাঁকা টেবিলে গিয়ে নিরানন্দবাবু বসলেন। কিছুক্ষণ পরে বেয়ারা এল। এসে যথারীতি জিজ্ঞাসা করল, 'কী দেব স্যার।'

নিরানন্দবাবু শুকনো মুখে বললেন, 'তুমিই বল।'

বেয়ারা একটু ভেবেচিন্তে বলল, 'যা গরম পড়েছে। লম্বা, ঠাণ্ডা গলা পর্যন্ত ভদকাভোর্তি'...

বেয়ারা কথা শেষ করার আগেই নিরানন্দবাবু তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'সর্বনাশ! তুমি কী আমার মিসেসের কথা বলছ? তিনিও এসেছেন নাকি?'

বেয়ারা কি বুঝল কে জানে? সে গিয়ে এক বোতল বিয়ার নিয়ে এল।

নিরানন্দবাবু বারের চারদিকে ইতিউতি তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে বিয়ার পান করতে লাগলেন।

বলা বাহুল্য, এ গল্পের এখানেই শেষ করা ছাড়া কোনও গতি নেই।

কারণ এসব গল্পের কোনও মাথামুণ্ডু নেই। পুনশ্চ :

সন্ধ্যাবেলা নিরানন্দবাবুর বাড়িতে একদল সমাজসেবী এসেছেন। নিরানন্দবাবু বাড়ি নেই। নিরানন্দবাবুর স্ত্রী ভদ্রলোকদের বাইরের ঘরে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা কী জন্যে এসেছেন?'

সমাজসেবীদের মুখপতি বললেন, 'মাতালদের পুনর্বাসনের জন্যে আমরা একটা আশ্রম করেছি। যদি কিছু সাহায্য করতেন।'

শ্রীযুক্ত নিরানন্দা দেবী বললেন, 'একটু বেশি রাতের দিকে আসুন। নিরানন্দ ফিরলে তাকে নিয়ে যাবেন।'

আজ রাতে

আজকাল একটু ঘন ঘন হয়ে যাচ্ছে। আজ রাতে সর্বানন্দবাবু আবার মদ্যপান করে এসেছেন।

গভীর রাত। রাস্তাঘাট ফাঁকা, নিঝুম। একজন বন্ধু সর্বানন্দবাবুকে তাঁর বাড়ির গলির মোড়ে নামিয়ে দিয়ে গেছেন। সর্বানন্দবাবু টলতে টলতে বাড়ির দরজায় এসে গেছেন।

মাঝেমধ্যে রাত হয়ে যাচ্ছে বলে স্ত্রী সর্বাণীকে যাতে বিরক্ত না করতে হয় সে জন্যে সর্বানন্দবাবু বাড়ির সদর দরজায় একটা তালা লাগিয়েছেন। এসব তালা ভেতর

থেকে এমনিতেই খোলা যায়, বাইরে থেকে খুলতে গেলে চাবি লাগে।

একটা ডুপ্লিকেট চাবি সর্বানন্দবাবু পকেটে রাখেন। বাড়িতে ফেরার সময় নিজেই বাইরে থেকে দরজা খুলে ভেতরে ঢোকেন। সর্বাণীকে কিংবা কাজের মেয়েকে বিরক্ত করতে হয় না।

আজ সর্বানন্দ টলতে টলটে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে কম্পিত হস্তে পকেট থেকে চাবিটা বার করলেন। কিন্তু দরজায় আর চাবিটা লাগাতে পারেন না, যতবার চাবিটা সটকিয়ে যায় তালার মধ্যে আর ঢোকাতে পারেন না।

বাড়ির ফুটপাতে একটা কুকুর থাকে। তাকে কখনও সখনও জানালা দিয়ে এক টুকরো বিস্কুট বা রুটি সর্বানন্দবাবু ছুঁড়ে দেন। সেও কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সর্বানন্দবাবুকে দেখলে লেজ নাড়ে।

আজকে কুকুরটা গভীর অভিনিবেশ সহকারে সর্বানন্দবাবুর তালা খোলা পর্যবেক্ষণ করছিল লেজ নাড়তে নাড়তে। কিন্তু তিনি আর তালা খুলতে পারেন না। তালা কি খুলবেন, তালার মধ্যে চাবিই দিতে পারছেন না। কুকুরটা ক্লান্ত হয়ে লেজ নাড়া বন্ধ করে দুবার হাই তুলে তারপর ঘুমোতে চলে গেল।

গলির মোড়ে একটা পানের দোকান আছে। সর্বানন্দবাবু সেই পানওয়ালার পুরনো খদ্দের। পানওয়ালা দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে তখন বাড়ি ফিরছিল। সে তালা খোলায় সচেষ্ট সর্বানন্দবাবুর অবস্থা দেখে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর সর্বানন্দবাবুর অক্ষমতা দেখে বলল, দিন দত্তবাবু, চাবিটা আমাকে দিন আমি দরজা খুলে দিচ্ছি।'

পানওয়ালার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে তারপর সর্বানন্দ বললেন, তালা আমি খুলতে পারব। দৈনিকই নিজের হাতে খুলি। কিন্তু আজ বাড়িটা বড় দুলছে। একেবারে একেকদিকে কাত হয়ে যাচ্ছে। তুমি বাড়িটা একটু শক্ত করে ধরে রাখো। আমি তারপর তালা খুলছি।

অবশ্য পানওয়ালাকে বাড়িটা শক্ত করে ধরতে হল না, তার আগেই বাড়ির ভিতর থেকে সর্বাণী স্বামীর কণ্ঠস্বর শুনে দরজা খুলে দিয়েছেন।

দরজা খুলে সর্বানন্দবাবু পানওয়ালাকে বললেন, দেখলে তো তালাটা আগেই খুলে ফেলেছিলাম। বাড়িটা কাত হয়ে ছিল দরজাটা খুলছিল না। তুমি শক্ত করে ধরতেই দরজাটা খুলে গেল।

সর্বানন্দের কথা শুনে একটু হেসে পানওয়ালা সর্বাণীকে সামনে দেখে বলল, বৌদি দাদাকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে যান। মাতাল বিষয়ে পানওয়ালাদের বিস্তর অভিজ্ঞতা, সে জানে অনেক মাতাল বাড়ির দরজা পর্যন্ত এসে আর বাড়ির মধ্যে ঢুকতে চায় না।

কিন্তু সর্বানন্দ সে জাতের মাতাল নয়। সর্বাণীর সঙ্গে তিনি বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেলেন। সদর দরজা বন্ধ করে সর্বাণী বললেন, 'তোমার কিন্তু আজকাল একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। এত রাত করলে?'

সর্বানন্দ স্ত্রীর কাঁধে ভর দিয়ে দু পা দিয়ে কোনও রকমে সামনের সোফাটায় বসলেন। তারপর হাত পা এগিয়ে দিয়ে বললেন, সেই সল্টলেক থেকে আসছি।

সল্টলেক থেকে এই কালীঘাট, অন্তত তিরিশ মাইল রাস্তা।'

সর্বাণী বললেন, 'বাজে কথা। আমাদের এই হাজরা মোড়ের এখান থেকে সল্টলেকের শেষ মাথা জোর পনের মাইল হবে।'

সর্বানন্দ ঘাড় কাত করে স্বীকার করলেন তা হবে। কিন্তু সল্টলেক থেকে হাজরার মোড় কতটা হবে? সে তো তিরিশ মাইলের কম হবে না।

সর্বাণী হেসে ফেললেন। আজকাল নেশা করে এসে সর্বানন্দ এই রকম কিছু কিছু ঘোলাটে কথাবার্তা বলেন। সর্বাণী তবু প্রতিবাদ করে বলেন, 'তা হবে কেন? হাজরা থেকে সল্টলেক যতটা সল্টলেক থেকে হাজরাও পনের মাইল হবে।'

সর্বাণীর কথা শুনে সর্বানন্দ কথা ঘোরালেন। প্রশ্ন করলেন, আজ কি বার? সর্বাণী বললেন, শুক্রবার। তবে রাত বারোটা অনেকক্ষণ বেজে গেছে। এখন শনিবার হয়ে গেছে।

সর্বানন্দ বললেন, সে যা হোক শুক্রবার থেকে সোমবার কয় দিন? মাতালের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া কঠিন। সর্বাণী বললেন, তিন দিন। সর্বানন্দ বললেন, সোমবার থেকে শুক্রবার কয়দিন? তারপর বিজ্ঞের মত হেসে স্ত্রীকে বললেন, এদিক থেকে ওদিক আর ওদিক থেকে এদিক সব সময়ে ঠিক হয় না।

জয় বাবা শান্তিনাথ

সর্বানন্দের অফিসে তাঁর সঙ্গেই কাজ করেন শান্তিবাবু, শান্তিলাল চৌধুরী। বছর দুয়েক আগে পাটনা থেকে বদলি হয়ে এসেছেন।

শান্তিবাবু বাংলা ভালভাবেই বলতে পারেন। কিন্তু তাঁর উচ্চারণে কেমন একটা দেহাতি, হিন্দি ঘেঁষা টান। শান্তিবাবু অবশ্য বলেন তিনি বিহারী নন, তবে কয়েক পুরুষ ধরে তাঁরা পাটনার বাসিন্দা।

সর্বানন্দ এবং শান্তিবাবু একই বিভাগে কাজ করেন। প্রায় কাছাকাছিই দুজনে বসেন।

অফিসে কাজকর্ম করতে করতে টুকটাক কথাবার্তা হয়, গল্পগুজব হয়। কখনও দুজনে টিফিন একসঙ্গে ভাগ করে খান। এই দু বছরে দু জনের মধ্যে একটা হালকা বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে।

শান্তিলালের একটা বড় গুণ এই যে তিনি মদ খান না। মদের প্রসঙ্গ উঠলে এড়িয়ে চলেন। সর্বানন্দ কখনও সখনও শান্তিবাবুকে তাঁর সঙ্গে নৈশ বিহারে যেতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। কিন্তু শান্তিবাবু সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেননি এবং সরাসরি বলেছেন, আমি ড্রিঙ্ক করা হেট করি।

ফলে আজকাল সর্বানন্দ শান্তিলালের কাছে মদ্যপানের প্রসঙ্গ এড়িয়ে যান। এই অফিসে আরও সাঙ্গোপাঙ্গ আছেন, তাঁরাই তার সঙ্গী হন।

সে যা হোক, এর মধ্যে একদিন শান্তিবাবু সর্বানন্দকে বললেন, আজ আমাব বাড়িতে সন্ধেবেলা চলুন। এমন জিনিস খাওয়াব, মদের নেশা ভুলে যাবেন।

সর্বানন্দ অবাক। এ কি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে গোছের মনের অবস্থা হল তাঁর। শান্তিবাবুকে প্রশ্ন করলেন, 'কী ব্যাপার? আপনার বাড়িতে কি পার্টি টার্টি আছে না কি আজকে?

শান্তিলাল বললেন, 'ও সব জিনিস আমাদের ঘরে চলে না। আজ আমাদের বাড়িতে শান্তিনাথের পুজো। চলুন মজা পাবেন।'

'শান্তিনাথের পুজো?' নিজের মতোই প্রশ্নটা করে ফেললেন সর্বানন্দ, 'আপনার নামে গৃহদেবতা প্রতিষ্ঠা করেছেন নাকি নিজের বাড়িতে? আমি গিয়ে কী করব? ওসব পুজোটুজো আমার সয় না।'

শান্তিবাবু বললেন, 'আরে বাবা, আমার নাম তো শান্তিলাল আছে, আমাদের ঠাকুরের নাম আছে শান্তিনাথ। দেবাদিদেব মহাদেব আছেন উনি। চলুন, মজা পাবেন।'

সর্বানন্দকে শান্তিলালের সঙ্গে তাঁর বাড়িতে শান্তিনাথের পুজোয় যেতে হল। গিয়ে দেখলেন, পুজোর ছলে সেটা একটা গাঁজার আখড়া। শান্তিলালের বাড়ির লোকজন পাটনায়, তিনি জোড়াবাগানের একটা গলিতে একটা ঘরে একাই থাকেন। সেই ঘরে আরও পাঁচ-সাতজন দেশোয়ালি ভাই একত্র হয়েছে। তার মধ্যে একজন, কাঁধে পৈতে, কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা, ব্যোম ব্যোম করে পুজো করছেন, মাঝেমধ্যে জয় বাবা শান্তিনাথ' বলে হাঁক ছাড়ছেন, বাকিরা সবাই তখন তাঁর সঙ্গে কোরাসে ধুয়ো ধরছেন।

হাতে হাতে গাঁজার ছোট ছোট কলকে ঘুরছে। একজনের টান দেওয়া হয়ে গেলে সে পাশের লোকের হাতে ছিলিম এগিয়ে দিচ্ছে। গাঁজার ধোঁয়ায় ঘর পরিপূর্ণ। কটু ও মাদক গন্ধ থই থই করছে।

ধাপে ধাপে একটা ছিলিম সর্বানন্দের হাতেও এসে গেল। ভদ্রতার খাতিরে সর্বানন্দকে টান দিতে হল। প্রথমে একটু ঝাঁঝ লেগেছিল, গলা থেকে বুক পর্যন্ত একটা ধাক্কা। ক্রমে সয়ে গেল। তখন সর্বানন্দ বুঝতে পারলেন, এঁরা শুধু গাঁজাই টানছেন না, নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব করছেন।

সেই গল্পগুজব সর্বানন্দ বুঝতে পারলেন গঞ্জিকা সেবনের মাহাত্ম্য। মদ খেয়ে

চুরচুর হয়েও ও ধরনের আলাপ-আলোচনা সম্ভব নয়।

সর্বানন্দের বাঁ পাশের কালোয়ার ভদ্রলোক বললেন, 'কি সাংঘাতিক গরম পড়েছে এবার।'

ডানপাশের হিন্দি হাই স্কুলের মাস্টারমশাই বললেন, 'এ আর কি গরম। বাহাত্তর সালের গর্মিতে আমাদের ভাগলপুরের বাড়িতে হাঁসগুলো পেট থেকে সেদ্ধ ডিম পাড়ত।'

এই কথা শুনে সামনের দশাসই ভদ্রলোক বজরঙ্গবলী ব্যায়ামাগারের কুস্তির শিক্ষক হো-হো করে হেসে উঠলেন বললেন, আরে মুঙ্গেরে আমার মামার বাড়িতে গরমের দিনে গরুর বাঁটে একা একাই দুধ জ্বাল হয়ে ঘন হয়ে যায়, গরুর বাঁট ধরে দুইলে ঘন ক্ষীর বেরিয়ে আসে।'

ঝিম মেরে বসেছিলেন শান্তিলাল, তিনি চোখ বোজা অবস্থাতেই বললেন, আমি তো আজকাল আর চায়ের জল গরম করি না। কলের জলে চা পাতা ছেড়ে দিই, তাতেই চা হয়ে যায়।'

সর্বানন্দ ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন। আর নয়। কেউ খেয়াল করছে না। এবার কাটতে হবে। মাথা ঝিম ঝিম করছে। ধোঁয়া ভর্তি ঘর থেকে নিস্ক্রান্ত হতে হতে তিনি শান্তিলালকে বললেন, 'এই গরমে আমি ধোঁয়া হয়ে গেছি।' এই বলে ধোঁয়া কাটিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলেন।
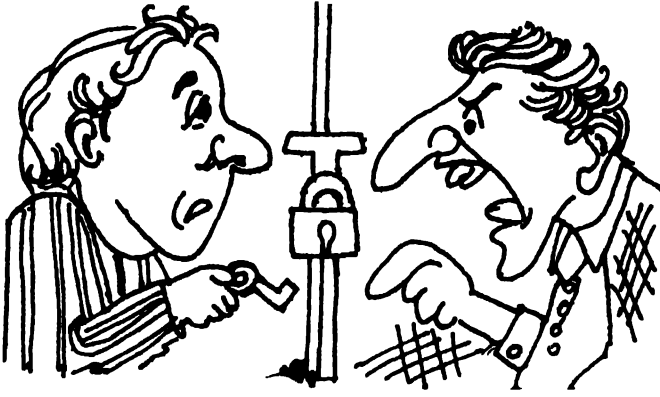
প্রবাসে দৈবের বশে

সর্বাণীকে নিয়ে আর পারা যাচ্ছে না।

বহু কষ্টে অফিস থেকে এক সপ্তাহের ছুটি সংগ্রহ করেছেন সর্বানন্দ। তাঁর প্রাণের ইচ্ছে এই এক সপ্তাহ কলকাতায় শুয়ে-বসে চুটিয়ে আড্ডা দেন, পান-ভোজন করেন।

কিন্তু বাদ সেধেছেন সর্বাণী। তিনি ছুটির মধ্যে কলকাতায় থাকবেন না। একদিনের জন্যেও না।

অনেক দাম্পত্য কলহ, ধস্তাধস্তি, রীতিমত দর কষাকষির পর রফা হল যে ছুটির প্রথম ভাগ কলকাতায় এবং শেষ কয়েকটা দিন বাইরে কাটানো যাবে।

বাইরে মানে খুব একটা বাইরে নয়। চিরনবীন, পরম পবিত্র পুরী। মন্দির. সমুদ্র, বাজারে নিয়ে পুরীর আকর্ষণ আলাদা।

কিন্তু ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি এখন স্বর্গে ধান ভানার খুব ধুম। কারণ পৃথিবীর সব ঢেঁকিই স্বর্গে চলে গেছে।

সে যা হোক, অবান্তর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। সোজা কথা, সর্বানন্দ পুরী গিয়েও প্রাণের আনন্দে মদ্যপান করতে লাগলেন তবে সর্বাণীর পক্ষে এখানে একটা স্বস্তি এই যে সর্বানন্দের মাতাল হয়ে বাড়ি ফেরার সমস্যা নেই। সে হোটেলে তাঁরা আছেন তারই নিচতলায় বার কাম হোটেল।

দুপুরে এবং সন্ধ্যায় ভোজনের ঘণ্টাখানেক আগে সর্বানন্দ নিচে নেমে যান। তাঁরা পাঁচতলায় সমুদ্রের দিকে একটা ঘর পেয়েছেন। লিফটে করে নেমে গিয়ে সর্বানন্দ পান শুরু করেন। এই অবসরে সর্বাণী সাজগোজ, গোছগাছ করেন। জানালায় দাঁড়িয়ে লবণাম্বুরাশি পর্যবেক্ষণ করেন, মধ্য সমুদ্রের ঢেউয়ে দোল খাওয়া নৌকোর দিকে তাকিয়ে রজনীকান্তের গান গুন গুন করেন, 'শালকাঠের এই অক্ষয় বজরা যাবে আপন বলে।' তারপর ধীরেসুস্থে নিচে নেমে যান।

ততক্ষণে সর্বানন্দের রঙের ওপর রঙ চড়েছে। সর্বাণী এসে যাওয়ার পরে আরও এক পাত্র পানীয় নিয়ে খাবারের অর্ডার দেন তিনি। অনেকদিন খাওয়া শেষ হওয়ার বাদে সর্বাণী চলে যাওয়ার পরেও সর্বানন্দ একাই টেবিলে বসে আরও একটু পান করেন।

এই বারেই এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। প্রথম দিন সন্ধ্যাতেই পরিচয় হল। সর্বাণী চলে যাওয়ার পরে পাশের টেবিল থেকে নিজের গেলাস নিয়ে উঠে এসে পরিচয় করেন। নিজের নাম বলেন, হৃদয় নাগ।

হৃদয়বাবুকে সর্বানন্দের ভালই লাগল। হৃদয়বাবু লোক খারাপ নয়, তদুপরি সুরসিক এবং পানরসিক। প্রথম দিনেই নৈশ ভোজনের শেষে দুজনে মুখোমুখি বসে প্রায় ঘণ্টাখানেক আকণ্ঠ পান করলেন। তারপর টলতে টলতে লিফটে উঠে যে যাঁর ঘরে ফিরলেন টইটম্বুর অবস্থায়।

হৃদয়বাবুও সস্ত্রীক এই একই হোটেলে উঠেছেন। সর্বানন্দের তলাতেই আশেপাশে তাঁর ঘর। তবে হৃদয়বাবুর হৃদয়েশ্বরী ঘোরতর মদ্যপান বিরোধী। তিনি সর্বাণীরও এককাঠি ওপরে। তিনি বারে মাতালদের সঙ্গে খাবার খেতে রাজি নন। তাঁর খাবার ঘরে নিয়ে যায় বেয়ারা। তবে হৃদয়েশ্বরীর একটা গুণ আছে, তিনি ব্যক্তি স্বাধীনতার বিশ্বাসী, হৃদয়বাবুর পান করা নিয়ে মাথা ঘামান না।

হৃদয়বাবুর মুখে তাঁর হৃদয়েশ্বরীর কথা শুনে সর্বানন্দের খুব কৌতূহল হল। পরের দিন মধ্যাহ্নভোজনের সময় এই কৌতূহল আরও বেড়ে গেল যখন হৃদয়বাবু বললেন, 'ও মশায়, আমার স্ত্রী কিন্তু আপনাকে বিলক্ষণ চেনেন। আপনাদেরই চেতলার মেয়ে। বলল, আপনি নাকি একবার চোর ভেবে একটা সাদা পোশাকের পুলিশকে বেধড়ক পিটিয়ে ছয়মাস পাড়া থেকে হাওয়া হয়ে গিয়েছিলেন।'

'দশ-বারো বছর আগের কথা, কিন্তু কথাটা পুরো সত্যি। আপনার স্ত্রীর নামটা বলবেন?'

বিকেলে ব্যাপারটা আরও জটিল হল। ইতিমধ্যে সর্বাণীর সঙ্গে হৃদয়েশ্বরীর আলাপ-পরিচয় হয়েছে। সর্বাণী জানালেন, 'ওগো তোমার নতুন বন্ধুর স্ত্রী তো তোমার গুণমুগ্ধ ফ্যান। তোমার সেই ধ্যাড়ধেড়ে চেতলার বাল্যসখী।' সর্বানন্দ বিনীতভাবে জানতে চাইলেন, 'নামটা কী?' সর্বাণী বললে, '—নাম? বিয়েওলা মেয়ের আবার নাম আছে নাকি? মিসেস নাগই যথেষ্ট। দেখো আবার নতুন করে লটঘট করে বোসো না।'

সেদিনই নৈশভোজের পরে পান করতে করতে প্রায় অন্যরূপ ইঙ্গিত দিলেন হৃদয় নাগ, 'আমার স্ত্রী খুব উতলা হয়ে পড়েছেন আপনার জন্যে, আপনিও কি তাই?' কিছুই উত্তর দিতে পারলেন না সর্বানন্দবাবু, তিনি কে, তাঁর কী নাম কিছুই জানা নেই, কী বলবেন।

আসল মজাটা হল গভীর রাতে। প্রচুর পরিমাণ পান করার পরেও হৃদয় মদ খেয়ে যাচ্ছেন, কোনও উপায় না দেখে সর্বানন্দ 'গুড নাইট' বলে বিদায় নিলেন। কিন্তু লিফটে উঠে প্রায়ান্ধকার বারান্দায় নেমে গুলিয়ে ফেললেন কোনটা তাঁর ঘর। কিছুক্ষণ

এলোপাতাড়ি চেষ্টা করার পর তিনি বারান্দার একমাথা থেকে প্রত্যেক ঘরের দরজায় হোটেলের চাবি দিয়ে খোলার চেষ্টা করে যেতে লাগলেন, যেটা খুলবে সেটাই তাঁর ঘর।

এই সময় অঘটন ঘটল। একটা ঘরের দরজায় চাবি দিয়ে খোলার চেষ্টা করছেন, এমন সময় পিঠে একটা চাপড় খেয়ে মুখ ফিরিয়ে দেখেন, টলটলায়মান হৃদয়বাবু দাঁড়িয়ে।

একটু ঢোক গিলে, চিবিয়ে চিবিয়ে হৃদয়বাবু সর্বানন্দকে বললেন, 'আপনার এই চাবি যদি এই দরজায় লাগে তাহলে কিন্তু কেলেঙ্কারি হবে।'

সর্বানন্দ বললেন, 'কী কেলেঙ্কারি?'

হৃদয়বাবু বললেন, 'এটা আমার ঘর। আপনার চাবি দিয়ে যদি আমার ঘর খোলে তবে আমার স্ত্রী এবং আপনাকে অনেক ব্যাখ্যা দিতে হবে আপনার স্ত্রী আর আমার কাছে।'

মারামারি

সর্বানন্দ লোক খারাপ নন। হিংস্র বা গুণ্ডা স্বভাবের লোকও নন। কিন্তু তিনি মারামারি করতে ভালবাসেন।

একান্নবর্তী পরিবারে, সেই পুরনো দিনের না ভাঙা বাংলাদেশের নড়াইল শহরের দত্তবাড়িতে জন্মেছিলেন, বড় হয়েছিলেন সর্বানন্দ।

সেই দত্তবাড়িতে সবারই নামের শেষভাগ ছিল আনন্দ। কর্মানন্দ, সর্বানন্দ, ক্ষমানন্দ, গজানন্দ, ধর্মানন্দ ইত্যাদি। এর মধ্যে গজানন্দ ছিল সাংঘাতিক মারকুটে। বালক সর্বানন্দের প্রায়শ লড়াই লাগত এই গজানন্দের সঙ্গে।

কিন্তু সর্বানন্দ কখনওই পারতেন না গজানন্দের সঙ্গে। তবুও আত্মসম্মানের খাতির লড়ে যেতেন। অবশ্য যথাসময় বড় ভাইয়েরা এসে ছড়িয়ে দিতেন।

এর মধ্যে ক্ষমানন্দ ছিলেন অতি নিষ্ঠুর প্রকৃতির। যখন মারামারি প্রায় থেমে এসেছে তখন এসে তিনি দুজনকে সরিয়ে দিতেন। কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন, তিনি মারামারি, হাতাহাতি দেখতে ভালবাসতেন। তাই কলহ থেমে যাওয়ার উপক্রম হলে দুজনকে ছাড়িয়ে নিয়ে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিতেন যাতে কেটে না পড়ে।

এদিকে পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আবার দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর রাগ চড়তে থাকত ক্রমশ দাঁত খিঁচোতে খিঁচোতে গজরাতে গজরাতে তারা ক্ষমানন্দের বাহুবন্ধন ছিন্ন করে পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। আবার শুরু হয়ে যেত গজকচ্ছপের লড়াই।

অবশ্য সর্বানন্দ চিরকালই বেশ চালাক। যখন তাঁর মেজদা ক্ষমা তাঁকে গজানন্দের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে রাখতেন। তিনি মুখে চেঁচাতেন, 'একেবার ছেড়ে দে সেজদা। আজ গজাকে শেষ করে দিই।'

কিন্তু সর্বানন্দ মনে মনে জানতেন গজার সঙ্গে তিনি পেরে উঠবেন না। তাই চেঁচানির ফাঁকে ফাঁকে নিচু গলায় বিড় বিড় করে ক্ষমানন্দকে বলতেন, 'এই সেজদা, আমাকে ছাড়িস না কিন্তু তাহলে গজা আমাকে মেরেই ফেলবে।'

সে যা হোক, এসব অনেককাল আগের কথা। তবে সর্বানন্দের মারামারি হাতাহাতি আজও চলেছে। এটা ঘটে সাধারণত গভীর যামে নিরবধি মদ্যপানের পরে পানসঙ্গীর সঙ্গে।

কলার ছেঁড়া জামা, ঘুষিতে ফোলা চোখ, থ্যাঁতলানো নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে, এই রকম চেহারা নিয়ে সর্বানন্দ বাড়ি ফেরেন। সর্বাণীর অভ্যেস হয়ে গেছে। তবু স্ত্রীর দায়িত্ব হিসেবে তিনি সর্বানন্দের সংশোধন করার চেষ্টা করেন।

একদিন গভীর রাতে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় সর্বানন্দ বাড়ি ফিরে এলে সর্বাণী তাঁকে দিয়ে সেই অবস্থায় মা কালীর ফটো ছুঁইয়ে কবুল করিয়ে নিলেন, 'কিছুতেই আর কখনও চট করে মাথা গরম করব না। মাথায় রক্ত উঠে গেলেও, মনে মনে এক থেকে একশো পর্যন্ত গুনব।'

সর্বাণীর ধারণা ছিল মনে মনে এক থেকে একশো পর্যন্ত গুনলেই সর্বানন্দের কথা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, মারামারির ইচ্ছে থাকবে না।

কিন্তু তা হয়নি। তখন সর্বানন্দ এক থেকে একশো দ্রুতগতিতে গোনায় অসম্ভব দক্ষতা অর্জন করেছে। পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে গোনা শেষ হয়ে যায়। তারপরেই আস্তিন গুটিয়ে হাতাহাতি, মারামারি।

আজ রাতেও তাই হয়েছে। বারের পাশের টেবিলে বাংলা সিনেমার এক ভিলেন বসে মদ্যপান করছিলেন। ভিলেনদের যেমন হয় গুণ্ডা গুণ্ডা, ষণ্ডামার্কা চেহারা। এমনিতে রূপালিপর্দায় লোকটাকে দেখলেই সর্বানন্দের রাগ হয়। আজ একেবারে রক্তমাংসের শরীর নিয়ে সামনাসামনি।

বারের শেষ ঘণ্টা বেজে আলো নিভে যাওয়ার পর একেবারে বেরনোর সময় সত্যি

সত্যি পা বাধিয়ে গোলমাল বাধালেন সর্বানন্দ।

ভিলেনটি কিন্তু ভদ্রলোক। কিছুই না করে, বিনীতভাবে বললেন, সরি!

এখন সর্বানন্দের মাথায় মারামরির ভুত চেপেছে। তিনি ভিলেনকে এক ধাক্কা দিয়ে বললেন, 'আই অ্যাম নট সরি।'

কয়েক মিনিট এরকম চলার পর ভিলেনটি একটি হালকা ঘুষি মারলেন সর্বানন্দকে। এবার সর্বানন্দ রুখে দাঁড়ালেন, শালা আস্তে ঘুষি মারলি। সাহস থাকে ত একবার জোর ঘুষি মার দেখি।

সঙ্গে সঙ্গে ভিলেনটি সজোরে একটি ঘুষি মারলেন সর্বানন্দের চেয়ালে। সর্বানন্দ চোখে সর্ষেফুল দেখলেন। তারপর সম্বিত ফিরে আসতে দেখলেন ভিলেন তখনও সামনে দাঁড়িয়ে। এবার সর্বানন্দ তাঁকে আহ্বান জানালেন, 'শালা। বুকের পাটা থাকে তো আমাকে লাথি মার দেখি।' এর সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যুত্তর পেলেন একটি শক্তিশালী লাথির মাধ্যমে। বারের মেঝেতে গড়িয়ে পড়লেন সর্বানন্দ।

মেঝে থেকে ওঠার সময় একটা টেবিল থেকে খালি প্লেটে পড়ে থাকা ছুরি তুলে নিলেন সর্বানন্দ। সেই ছুরিটি ভিলেনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'বাপের ব্যাটা হোস তো আমাকে ছুরি মার দেখি।'

ভিলেন নির্বোধ নন। ঘুষি, লাথি এক জিনিস। ছুরি অন্য জিনিস। রক্তারক্তি কাণ্ড হলে থানা-পুলিশ হয়ে যাবে। তিনি পিছু হটলেন।

কিছুক্ষণ তাঁর পিছে পিছে গিয়ে হাততালি দিয়ে সর্বানন্দ বলে গেলেন, 'শালা হেরে গেলি। হেরে গেলি।' তারপর বিজয়ীর গৌরবে সর্বানন্দ বাড়ি ফিরে গেলেন।

অভিজ্ঞতা

যে দু-চারজন আমার সর্বানন্দ কাহিনী পাঠ করেছেন তাঁরা সবাই এতক্ষণে জেনে গেছেন যে সর্বানন্দ মদ খান, মদ খেতে ভালোবাসেন।

সেটা অবশ্য আজকাল খুব দোষের কিছু বলে গণ্য হয় না ; আশেপাশে কত চেনাশোনা লোকই তো মদ্যপান করেন। কিন্তু গোলমালটা অন্য জায়গায়। মদ খাওয়ার ব্যাপারে সর্বানন্দ বহু সময়েই একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেন।

বেশ কয়েকবার এই বাড়াবাড়ির পরিণতি খারাপ হয়েছে। 'সরসী'তে ইতিমধ্যে আমি দুয়েকটা ঘটনার কথা লিখেছি, পাঠক-পাঠিকারা কেউ কেউ হয়তো পড়েওছেন।

সে যা হোক, আজ কিছুদিন হল কিছুটা বিবেকের তাড়নায়, কিছুটা সর্বাণীর গালমন্দে সর্বানন্দ একটু সংযত হয়েছেন। আজকাল আর বেশি রাত করেন না বাড়ি ফিরতে, মারামারি-হাতাহাতিও প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন।

কিন্তু প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা যে পানশালায় মদ খেতে যান সর্বানন্দ সেখানে এক নতুন আপদ জুটেছে।

কলকাতা শহরে বারের অভাব নেই, বিশেষ করে মধ্য কলকাতায়। ইচ্ছে করলেই অন্য যে কোনও দোকানে পান করতে যেতে পারেন সর্বানন্দ। কিন্তু সেটা খুব সহজ নয়।

মাতালরা তাঁদের মদের আড্ডাকে বলেন ঠেক। নানা কারণে পাকা মাতালই সহজে তাঁর ঠেক বদল করতে চান না। পুরনো জায়গা, পুরনো লোকজন, চেনাশোনা বন্ধুবান্ধব কোথাও একটু প্রাণের টান তৈরি হয়ে যায়।

ড্রিমল্যান্ড বার কাম রেস্তোরাঁর ওপরে একটা প্রাণের টান বোধ করেন সর্বানন্দ। সন্ধ্যায় একবার না এলে দিনটা বিফলে গেল বলে মনে করেন তিনি।

কিন্তু আজকাল ড্রিমল্যান্ডের সন্ধ্যাবেলা বিভীষিকাময় হয়ে উঠেছে এ ছিঁচকাঁদুনে

মাতালের অত্যাচারে।

দিন পনেরো হল একটি অচেনা ব্যক্তি কোথা থেকে এসে জুটেছে। সে সারা সন্ধ্যা বারের মধ্যখানের গোলটেবিলটার এক পাশে বসে চুক-চুক করে মদ খায় আর ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে কাঁদে।

নতুন মাতালটির বিশাল চেহারা। রীতিমত কেতাদুরস্ত পোশাক, কোর্ট-প্যান্ট-টাই, আপাতদৃষ্টিতে বেশ বুদ্ধিমান বলেই মনে হয়। কিন্তু সে কেন কাঁদে? আর সে কি কান্না? একেক সময় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। বোধহয় বেয়ারাকে বলা আছে, খুব গুঙিয়ে ফুঁপিয়ে উঠলে বেয়ারা এসে আরেক পেগ পানীয় রেখে যায়। তখন ক্রন্দন কিছুটা প্রশমিত হয়। তারপর আবা ফ্যাঁচফ্যাঁচ থেকে শুরু।

সর্বানন্দ কোনও কারণে এই নতুন খদ্দেরটির বিশেষ বাঞ্ছিত টার্গেট। এই তো গত পরশু দিনই সর্বানন্দ চমৎকার একটা ফুরফুরে নেশা করে রাত দশটা নাগাদ বার করে বেরোচ্ছিলেন। আচমকা এই লোকটা তাঁকে পিছন থেকে জাপটিয়ে ধরে হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকেন।

এর আগে এ রকম একাধিকবাব হয়েছে। সর্বানন্দ বেয়ারার কাছে জানতে চেয়েছেন, 'এই লোকটা কে?' বেয়ারাজনোচিত মুখভঙ্গি জবাব দিয়েছে, 'মালুম নেহি'।

এই জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি সর্বানন্দ একদম পছন্দ করেন না। কিন্তু বারের বন্ধুবান্ধব অন্যান্য খদ্দেররা তাঁকে বুঝিয়েছেন, এতে রাগ করা উচিত নয়। মানুষ কত দুঃখে কাঁদে, কাউকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা চায়—এতে লোকটার ওপরে মায়া হওয়া উচিত।

লোকটির ভয়ে সর্বানন্দ ড্রিমল্যান্ড বারে যাতায়াত কমিয়ে দিলেন। অবশেষে ঠিক করলেন লোকটার রহস্যটা কী জানতে হবে।

একদিন বিকেল-বিকেল সর্বানন্দ বারে গিয়ে বসে রইলেন, লোকটিকে ধরার জন্যে। বেশি পান করার আগেই কথাবার্তা বলতে হবে।

কথাবার্তা যা হল তা মর্মান্তিক। সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি মদ খেয়ে এত কাঁদেন কেন?'

ভদ্রলোক বললেন, 'জানেন আমি মদ খাই কেন?'

সর্বানন্দের জানার কথা নয়. তাই তিনি চুপ করে রইলেন। তখন ভদ্রলোক বললেন, 'আমি মদ খাই একজনকে ভুলবার জন্যে।'

'সর্বানন্দ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তিনি কে?'

এই প্রশ্নে পুরো আধবোতল মদ গলায় ঢেলে ভদ্রলোক ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠলেন, বললেন, 'সেইজন্যেই তো কাঁদি। তিনি যে কে? তাঁর কি যে নাম? কিছুই মনে পড়ে না। সব ভুলে গেছি।'

সর্বানন্দকে জড়িয়ে ধরে তিনি কাঁদতে লাগলেন। কান্নার রেশ দেখে বেয়ারা আরেক গেলাস মদ নিয়ে এল।
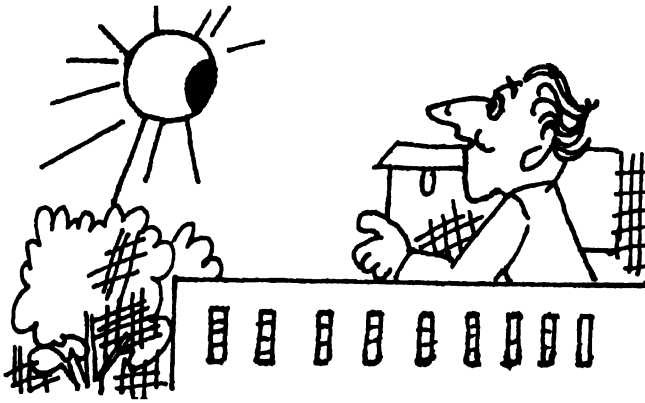
বিপদ

শ্রীযুক্ত সর্বানন্দ দত্ত ঘোরতর বিপদে পড়েছেন। সর্বাণীদেবী বারবার তাঁকে নিষেধ করেছিলেন। রাজ্যমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যদপ্তর সমস্বরে মানা করেছিল, খালি চোখে গ্রহণ দেখার পরিণাম কী হতে পারে সে বিষয়ে যথাবিহিত ভয় দেখিয়েছিল। কিন্তু একগুঁয়ে সর্বানন্দ কারও কথা শোনেননি।

সরাসরি পাঠক-পাঠিকারা নিশ্চয় বুঝে গেছেন যে তরল, সরল সর্বানন্দের চরিত্রের একটা বড় দোষ যে তিনি খুবই একগুঁয়ে। কোনও ব্যাপারে একবার গোঁ ধরলে তিনি ছাড়তে চান না।

সর্বানন্দের মনে আছে উনিশশো আশি সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সেই শেষবার যে কলকাতায় পূর্ণ সূর্যগ্রহণ হয়েছিল, সেবার এত হইচই হয়নি তবে লোকজন খুব বেশি ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। অফিস-আদালত স্কুল-কলেজ সব বন্ধ ছিল, গ্রহণের সময় রাস্তায় যানবাহন চলেছিল, লোকজন ছিল না, দোকানপাট বন্ধ ছিল, এমনকি আকাশে তারা পর্যন্ত দেখা গিয়েছিল।

কিন্তু এ বারের ব্যাপার আলাদা। সর্বানন্দ ভেবে পাননি এই পনেরো বছরে সূর্যরশ্মির এমন কি তারতম্য ঘটে গেছে।

সন্ধ্যায় পানীয়ের আড্ডায় পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক নবতোষ চক্রবর্তীকে সর্বানন্দ প্রশ্ন করলেন, 'সূর্যের বেগুনি রশ্মিতে কি কোনও দূষণ বিপর্যয় দেখা দিয়েছে?'

অধ্যাপক নবতোষ একটু ভালমানুষ গোছের লোক, ব্যাপারটা কিছুটা বুঝে নিয়ে সর্বানন্দকে বললেন, 'তুমি বোধহয় বলতে চাইছ, গতবার খালিচোখে দেখলাম কিছু হল না এবার সূর্যরশ্মি এত বিপজ্জনক কেন?

সর্বানন্দ বললেন, 'হ্যাঁ আমি ঠিক তাই ভাবছি।'

নবতোষ এবার একটা বাজে রসিকতা করলেন, 'জানো না, একজন শতায়ু ব্যক্তিকে

জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল দীর্ঘ জীবনের রহস্য কী। সেই বৃদ্ধ ব্যক্তি বলেছিলেন, বোধহয় আপনাদের ঐ সব জীবাণু, বীজাণু, ভাইরাস, জার্ম এসব আবিষ্কার হওয়ার ঢের আগে আমি জন্মেছিলাম তাই এ যাত্রা বেঁচে গেলাম।'

সর্বানন্দ এ শুনে বলেছিলেন, 'মানে?'

নবতোষ বলেছিলেন, 'বুঝতে পারছো না। তোমার চোখ আর আকাশের সূর্য ঠিকই আছে কিন্তু এই পনেরো বছরে ডাক্তার আর বিজ্ঞানীরা অনেক গোলমেলে ব্যাপার সব আবিষ্কার করে ফেলেছেন।

এই আলোচনার পর সর্বানন্দ খালি চোখে এবারও পূর্ণগ্রহণ দেখার ব্যাপারে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন। কিন্তু খবরের কাগজে নানারকম বিপজ্জনক বিবৃতি পাঠ করে সর্বাণী তাঁকে যথাসাধ্য নিরস্ত করার চেষ্টা করেন।

সর্বাণী নানারকম বিকল্প ব্যবস্থাও করেছিলেন।

পুরনো কাঠের আলমারি খুলে একটা কালো পাথরের থালা বার করে তার মধ্যে জল ভরে ছাদে রেখে দিয়েছিলেন। তার আগে সাড়ে চারঘণ্টা টানা রোদ্দুরে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম থেকে দুজোড়া বিশুদ্ধ গ্রহণ চশমা কিনে এনেছিলেন। একটা পুরনো এক্স-রে প্লেট পর্যন্ত যোগাড় করেছেন, পাশের বাড়িতে টিবি রোগী আছে, সেই বাড়িতে মাসে মাসে এক্স-রে তোলা হয়, সেখান থেকে চেয়ে এনেছেন।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। সর্বানন্দ খালি চোখে খোলা ছাদে দাঁড়িয়ে সূর্যগ্রহণ দর্শন করলেন। আগের বারের মতই চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে চোখ বুজে শুয়ে রইলেন। ভাবলেন এবারের নিশ্চয় কিছু হয়নি তেমন কিছু টেরও পেলেন না।

কিন্তু পরের দিন সকালে খবরের কাগজ পড়ে সর্বানন্দ ঘাবড়িয়ে গেলেন।

বলে কি? এখন নয়, পাঁচ বছর পরে টের পাওয়া যাবে। পূর্ণগ্রহণ দর্শনে নির্ঘাত পূর্ণ অন্ধত্ব। যদিও পাঁচ বছর পরের ব্যাপার, সর্বানন্দ এখনই ঘামতে থাকলেন। তাঁর মনে হতে লাগল চোখে অন্ধকার দেখছেন।

বিকেলে পানীয়র আসরে আবার নবতোষের সঙ্গে দেখা। নবতোষ কিন্তু একটা আশ্বাসের বাণী শোনালেন 'বিষে বিষক্ষয়'। 'এর পরের বার পূর্ণ সূর্যগ্রহণ তুমি খালি চোখে দেখো। এবারের দোষ কেটে যাবে।'

সর্বানন্দ অপেক্ষা করছেন পরের বারের পূর্ণ সূর্যগ্রহণের জন্যে।

তুলনা

সর্বাণী ও সর্বানন্দের মধ্যে কোন তুলনা করা উচিত নয়। ওরকম তুলনা হয় না, চলে না।

বিয়ের আসরে আগেকার দিনে, পিঁড়ি সমেত কনেকে বরের মাথার ওপরে তুলে রঙ্গ করে জিজ্ঞাসা করা হত, 'কে বড়ো। বর বড়ো না কনে বড়ো।'

এসব প্রশ্নের ঠিক কোন উত্তর হয় না। যেমন গঙ্গা নদী বড়ো না নায়গ্রা জলপ্রপাত বড়ো, এরকম প্রশ্নের কোন জবাব হয় না। তুলনা চলে না সাহারা মরুভূমির সঙ্গে হিমালয় পর্বতের।

তবু এতসব গল্পগুজবের পরে এবং বিশেষ করে এই মুহূর্তে হাতের কাছে এই দম্পতিকে নিয়ে লেখার মত কোন ঘটনা নেই তাই এদের দু'জনের একটু তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে।

সরাসরি আরম্ভ করছি। সর্বানন্দ এবং সর্বাণীর উচ্চতা প্রায় সমান সমান। দুজনেই সোয়া পাঁচ ফুট। কিন্তু উচ্চতা সমান হলেও সর্বানন্দকে বেঁটেই বলা যায়। এবং সর্বাণী রীতিমত লম্বা। এর একমাত্র কারণ সর্বানন্দ পুরুষ মানুষ, সর্বাণী স্ত্রীলোক।

সর্বানন্দ সর্বাণী দুজনেরই ওজন প্রায় ষাট কেজি। এর ফলে সর্বানন্দকে দোহারা চেহারার লোক বলা চলে কিন্তু সর্বাণী বেশ মোটা।

সর্বানন্দ সর্বাণী দু'জনার গায়ের রঙও প্রায় একরকম। একটু কালোর দিকেই বলা চলে, মা বাবারা যাকে স্নেহভরে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বলেন। জনসাধারণ কিন্তু সর্বাণীকে কালো বলে, এবং সর্বানন্দকে মোটামুটি ফর্সা।

এতসব দৈহিক বর্ণনার পরে এবার দত্ত দম্পতির আচার-ব্যবহার স্বভাব-চরিত্র নিয়ে তুলনা করছি। সর্বানন্দ ধীরস্থির এবং সর্বাণী চটপটে। তবে আত্মীয়-স্বজন পাড়া-প্রতিবেশী সর্বানন্দ সম্পর্কে বলেন, পুরুষ মানুষের ওরকম গয়ংগচ্ছ ভাব কেন? আবার

সর্বাণী সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্য মেয়েছেলে এমন চঞ্চল হলে চলে।

এদিকে সর্বানন্দ একটা অফিসে বেশ দায়িত্বসম্পন্ন কাজ করেন। তাকে দৌড়ঝাঁপ করে অফিস করতে হয়। তিনি সন্ধ্যাবেলা বন্ধুদের সঙ্গে অনেক রাত পর্যন্ত হইচই করে আড্ডা দেন। কিন্তু লোকে তাঁকে গেঁতো বলে, কারণ তিনি সকালবেলা একটু বেশিক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকেন।

সর্বাণী কোন কাজকর্ম করেন না। সংসার দেখেন রান্নাবান্না, বাজারহাট নিজের হাতে করেন। সবাই বলে, সর্বাণী খুব কাজের মেয়ে। অথচ পরিশ্রমী সর্বানন্দের অলস বলে খ্যাতি।

আগে সর্বানন্দ চায় দু চামচ করে চিনি খেতেন, সর্বাণী খেতেন এক চামচ। এখন দুজনে গড়ে দেড় চামচ করে চিনি নেন প্রতি কাপ চায়ে। সর্বাণী আচার খেতে ভালবাসেন, সর্বানন্দ পাঁপর। সর্বাণী ইলিশ মাছ, সর্বানন্দও ইলিশ মাছ। সর্বাণী মাংস ভালবাসেন না, সর্বানন্দ মাটন বলতে অজ্ঞান। দুজনেই বোঁদে ভালবাসেন এবং চানাচুর।

সর্বাণীর ইচ্ছে মধ্যশহরে প্রাসাদের সর্বোচ্চ তলায় থাকেন। সর্বানন্দের ইচ্ছে গ্রামের দিকে একটা ছোট বাড়ি করেন, অল্প একটু বাগান, জুঁই ফুল।

এইরকম অজস্র মিল আর তারতম্যে ভরা দত্ত দম্পত্তির যুগ্ম জীবন। যাঁদের দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে কম বেশি ধারণা আছে, তাঁরা বুঝতে পারছেন সর্বাণী সর্বানন্দ বেশ মিলমিশ সুখী জীবন কাটাচ্ছেন।

শুধু একটা জায়গায় একটু গোলমাল রয়েছে। সেটা ওই বয়েসের জায়গাটা।

বিয়ের সময় দুজনের বয়েসের ব্যবধান ছিল পাঁচবছর। সর্বাণীর পঁচিশ আর সর্বানন্দের তিরিশ। গত দশবছরে সর্বানন্দের বেড়ে চল্লিশ হয়েছে। তবে সর্বাণীর বয়েস অতটা বাড়েনি। গত দশবছরে বয়স বেড়ে তাঁর এখন হয়েছে তিরিশ। এখন সে সর্বানন্দের চেয়ে দশ বছরের ছোট।
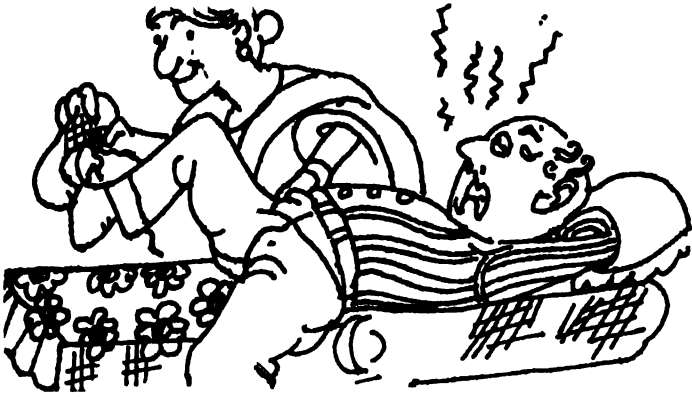
নেশা

গতকাল গভীর রাতে সর্বানন্দবাবু নেশায় চুরচুর হয়ে বাড়ি ফিরেছেন। তাঁর অফিসের এক সহকর্মীর প্রমোশন হয়েছে, সেই খাওয়ালো। সঙ্গে আরও কয়েকজন বন্ধু ছিল। পান-ভোজনের আয়োজন প্রচুর পরিমাণ ছিল। সেই সঙ্গে বিস্তর আড্ডা, হাসি-তামাশা।

সর্বানন্দ দত্ত সুরসিক ভদ্রলোক। মাঝে মধ্যে সঙ্গদোষে পান করেন। একা একা মদ খাওয়ার অভ্যেস নেই। কিন্তু বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে বসলে মাত্রা থাকে না।

কাল রাতে তাই হল। আড্ডা শেষ হতে রাত সাড়ে বারোটা, সর্বানন্দ বাড়ি ফিরলেন একটা নাগাদ।

দত্ত গৃহিণী, সর্বানন্দবাবুর স্ত্রী পতিদেবতার এই সব সাময়িক বৈকল্য নিয়ে বিচলিত নন। তাঁর মাত্র চার বছর বিয়ে হয়েছে, এখনও সন্তানাদি হয়নি। মাসে দু চারদিন রাতে দেরি করে বাড়ি এলেও, শেষ পর্যন্ত যে স্বামী দেবতা বাড়ি ফিরে আসেন, এতেই তিনি সন্তুষ্ট। তিনি জানেন সর্বানন্দবাবুর অন্য কোন দোষ নেই। এবং এই কারণেই তিনি বাড়াবাড়ি করতে চান না।

সর্বানন্দ দত্ত গতকাল রাতে বাড়িতে ঢুকেই জামা শুদ্ধ বিছানায় ধপাস করে শুয়ে পড়েছেন। শোবার আগে শুধু এক গেলাস জল খেয়েছিলেন।

শোয়ামাত্র সর্বানন্দবাবু বেহুঁশ হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। অবশ্য তার মধ্যে ঘুম ঠিক কতটা এবং মদের ঘোর কতটা সেটা বলা কঠিন।

ওই অবস্থাতেই সর্বাণীদেবী স্বামীর জুতো মোজা জামা খুলে বিছানার বালিশে মাথাটা ঠিক করে দিয়ে দিয়েছিলেন। পাশে একটা বড় কোলবালিশও রেখেছিলেন যাতে নেশার ঘোরে খাট থেকে সর্বানন্দ বাবু পড়ে না যান। আগে দুয়েকবার এরকম হয়েছিল, তাই পুর্ব অভিজ্ঞতা থেকে এই সতর্কতা।

আজ সকালবেলায় সর্বানন্দবাবু ঘুম থেকে উঠলেন বেলা দশটা নাগাদ। সাধারণত সকালের দিকে সর্বানন্দবাবুর অনেক কাজ। সাতটা নাগাদ মোড়ের দুধের ডিপোয় সর্বানন্দবাবু দুধ আনতে যান। দুধ রেখে চা খেয়ে বাজার করতে ছোটেন। বাজার নিয়ে এসে আরেক কাপ চা এবং খবরের কাগজ। তারপর দাড়ি কামানো, সাড়ে নটার মধ্যে স্নান খাওয়া সেরে অফিসে বেরিয়ে যান।

কিন্তু আজ ঘুম ভাঙতেই দশটা বেজে গেছে। দুধ, বাজার সবই সর্বাণীকে সামলাতে হয়েছে।

সে যা হোক, এখন অফিস যাওয়ার সময় আর নেই। সর্বানন্দ দত্তের অবস্থাও অফিস যাওয়ার মত নয়। যেমন হয়, সাংঘাতিক মাথাধরা, এদিকে গলা পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ, তিন গেলাস জল খেয়েও তৃষ্ণা মিটলো না। বিছানা থেকে নামতে গিয়ে দেখলেন পা টলছে।

এদিকে মনে পড়ছে, আজ অফিসে জরুরি কাজ আছে। সাড়ে দশটায় বড় সাহেবের ঘরে মিটিং আছে। এর পরের প্রমোশনটা তাঁরই প্রাপ্য। এ সময় অফিস কামাই ভাল নয়।

কিন্তু এখন আর কিছু করার নেই।

বিছানার পাশ থেকে কোলবলিশটা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলেন, সর্বানন্দ। তাঁর সব রাগ গিয়ে পড়ল সর্বাণীর ওপর। সর্বাণীকে সামনে দেখে সর্বানন্দ বললেন, আজ তোমার জন্যে আমার এই অবস্থা।

সর্বাণী অবাক, মেঝে থেকে কোলবালিশটা তুলে বললেন, 'আমি আবার কী দোষ করলাম। গাণ্ডেপিণ্ডে মদ খেয়ে এলে, এখন মজা বোঝ'।

সর্বানন্দ বললেন, 'মদ খাওয়ার জন্যে আমার এই অবস্থা হয়নি। আমি তো সুস্থ দেহে সুস্থ শরীরে, প্রফুল্ল চিত্তে বাড়ি ফিরলাম। তারপর ঘুমিয়েই শরীরটা খারাপ হয়ে গেল। এরপর থেকে আমি মদ খেয়ে এসে শুয়ে পড়লে তুমি আর আমার পাশে কোলবালিশ দেবে না।'

সর্বাণী বলল, 'তা হলে তো আধঘণ্টার মধ্যে গড়িয়ে ধপাস করে বিছানা থেকে পড়ে যাবে।'

সর্বানন্দ বললেন, 'আমি তাই চাই। বিছানা থেকে পড়লে আমার ঘুম হত না। ঘুম না হলেই এখন কালকে রাতের মত ফুরফুরে থাকতাম। এত কষ্ট হত না। অফিস যাওয়াও হত।'

টমাটো সস্

অনেকে হয়তো বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু কথাটা রীতিমত সত্যি।

আমি প্রথম টমাটো সস দেখি কলকাতা আসার ঢের আগে, কলকাতা থেকে অনেক দূরে এক নিতান্ত পাড়াগেঁয়ে মফঃস্বল শহরে। সে বহুকাল আগে।

ঠিক শহর নয়, বলা উচিত গণ্ডগ্রাম। স্থানীয় লোকেরা মুখে বলতো 'টাউন'। তখন সবে যুদ্ধের শেষ হয়েছে, ডামাডোলের বাজার। আমাদের শহরে তখনো ইলেকট্রিসিটি আসেনি, রেল লাইন নদীর ওপারে। তিরিশ মাইল দূরে, কয়েকটা টিনের লম্বা চারচালার নিচে একটা সিনেমা হল রয়েছে, সেখানে ছবির প্রত্যেক রিলের শেষে একবার ইন্টারভ্যাল, প্রোজেকটরে রিল বদলিয়ে তারপর পরের কিস্তি। একালের দূরদর্শনের ধারাবাহিক তেরো ভাগের বহু আগে সেখানে অনিবার্য কারণে শুরু হয়েছিল সেই কিস্তিমালা।

সেই ১৯৪৫-৪৬, যুদ্ধ শেষ, দুর্ভিক্ষ শেষ। তখনো পার্টিশানের ধাক্কা এসে লাগেনি আমাদের সেই ভাঙা দালানে আর পুরনো আটচালা ঘরে। সেই দালান আর টিনের ঘর দুটো মহাযুদ্ধ, কয়েকটা ঘূর্ণিবাত্যা আর কিছু বন্যা আর খরা আর দুর্ভিক্ষ কোনো রকমে পার হয়ে তখনো টিকে ছিলো।

সেই সময়ে আমাদের রাঙামামা ফিরলেন বিলেত থেকে। রাঙামামা আমাদের নিজের মামা নন, আমাদের নিজেদের কোন মামা ছিল না কস্মিনকালে, অর্থাৎ আমার মার কোনও ভাই ছিলো না। আমার বাবা প্রকৃত শালা বলতে কী বোঝায় তা জানতেন না।

রাঙামামা ছিলেন আমার সোনাকাকিমার আপন দাদা, সোনাকাকিমা বলতেন 'ফুলদা'। সেই সোনা আর ফুল দুইয়ে মিলেমিশে কী করে রাঙা হয়েছিলো, সে এক কঠিন সমস্যা, এখন আর সমাধান করা সম্ভব নয়, কিন্তু সেকালে এমন হতো।

পৃথিবী থেকে রাঙাদা আর সোনাদা কিংবা ফুলদা-রা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার মুহূর্তে, 'হাম দো হামারা দো' সভ্যতার এই মর্মান্তিক সঙ্কটে গল্পের দরজায় দাঁড়িয়ে সোনা, ফুল আর রাঙাদের কথা কিঞ্চিৎ উল্লেখ করে রাখি।

সবচেয়ে যে বড়, সে বড়দা বা বড়কাকা বা বড় মাসিমা। বড়ো-র পর মেজো, তারপর সেজো, তারপরে বা কোথাও কোথাও প্রয়োজনমত রাঙা, সোনা, নোয়া, ফুল এবং সর্বশেষ ছোড়দি বা ছোটপিসি। এর পরেও যদি কেউ থাকে তাকে নাম ধরে সঙ্গে দাদা বা পিসি যোগ করে সম্বোধন করা ছাড়া গতি নেই।

অবশ্য এসব ঝামেলা থেকে এখন আমরা প্রায় মুক্ত হতে চলেছি। রাঙাদা, সোনাদা বহু দিন গেছে, ছোড়দা-বড়দাও যায়-যায়। এর পরে মামা-কাকা, মাসি-পিসি খুঁজে পাওয়া অসম্ভব হবে।

এসব অবান্তর কথা থাক। আমরা আমাদের মূল গল্পে ফিরে যাই। রাঙামামার গল্প।

আমি রাঙামামাকে আগে দেখিনি। আমার খুব ছোটবেলায় তিনি বিলেত গিয়েছিলেন। সেটা সেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের একটু আগে। তাঁকে আমি সেই সময় দেখে থাকলেও, অত অল্প বয়সের কিছু মনে নেই আমার।

খনিবিদ্যার অর্থাৎ মাইনিংয়ের কী একটা উচ্চমানের অধ্যায়নের জন্যে রাঙামামার বিলেতযাত্রা, তিনি গিয়েছিলেন নিউ ক্যাসেলে।

বাংলা কথায় আছে, তেলা মাথায় তেল দেওয়া, তেমনি ইংরেজিতে বলা হয় নিউ ক্যাসেলে কয়লা নিয়ে যাওয়া। ঐ নিউ ক্যাসেলেই রাঙামামা গিয়েছিলেন।

পরে শুনেছি, রাঙামামা যখন বিলেত যাওয়ার পূর্বাহ্নে আমাদের বাড়িতে দেখা করতে আসেন, তখন তাঁর নিজের জামাইবাবু ফুলকাকা একটা খুব ছোট বাক্সে খুব ভালো করে বাঁশ কাগজ দিয়ে প্যাকিং করে মানে রাঙামামাকে কী একটা জিনিস উপহার দেন। ফুলকাকা তাঁর শালাকে বলেছিলেন, 'নিউ ক্যাসেলে গিয়ে খুলে দেখবে, খুব ভালো লাগবে।'

সেই প্যাকেটের মধ্যে নাকি কয়েক টুকরো কয়লা পোরা ছিল। জানি না, নিউ ক্যাসেল পর্যন্ত সেই কয়লা বহন করে নিয়ে রাঙামামা কতটা কৌতুকান্বিত বোধ করেছিলেন সেই মোক্ষম বিদেশে, কিন্তু এই ঘটনাটা আজ এই প্রায় অর্ধেক শতাব্দী পরেও আমাদের বাড়িতে অনেকেরই মনে আছে। এই নিয়ে সেই আমলের আমরা যারা দু'চারজন এখনো আছি, দেখা হলে হাসাহাসি হয়।

মাত্র দু'বছরের জন্যে বিলেত গিয়েছিলেন রাঙামামা। সেখানে গিয়ে যুদ্ধের মধ্যে আটকে পড়েন যুদ্ধ শেষ হলে ফিরলেন, সে প্রায় সাত বছর পরে।

সে ফেরাও খুব সহজ হয়নি। অনেক অপেক্ষা করে তারপর ঘুরপথে দেশে এসেছেন। এডেন এসে জাহাজ বদলিয়ে এবং আরো মাসখানেক আটকিয়ে থেকে তিনি যে-জাহাজে উঠলেন, সেটা যখন বোম্বে পৌঁছাল, তখন সেখানে ধর্মঘট চলছে কিংবা অন্য কি একটা গোলমাল।

রাঙামামার বহুবিধ দুর্দশার বিস্তারিত বিবরণে না গিয়ে বলি, অবশেষে তিনি দেশে

মানে তাঁর নিজের গ্রামে, এসে পৌঁছালেন যাত্রা শুরু করার প্রায় ছয়-সাত মাস পরে।

আমাদের টাউন আর রাঙামামাদের গ্রাম খুব কাছাকাছি ছিলো, মধ্যে মাত্র একটা ছোট নদী। নদীর ওপারের ঘাটে স্নান করতে দেখে আমার ঠাকুমা নিজে পছন্দ করে রাঙামামার বোন সোনাকাকিমাকে নিয়ে এসেছিলেন বাড়ির বউ করে।

সে যা হোক, রাঙামামা যখন গ্রামে ফিরে এলেন তখন তাঁর ঘাড় পর্যন্ত ছড়ানো রুক্ষ আ-তেলা চুল, পরিধানে গরম কোট-প্যান্ট, পোড়ামাটির পুতুলের মত গায়ের কালচে রং। বাড়ির লোকেরা কিন্তু এ সমস্ত দেখেও মোটেই বিচলিত বোধ করেনি। তারা সবাই আশঙ্কা করেছিলো, এতদিন পরে রাঙামামা নিশ্চয় মেমসাহেব বউ নিয়ে ফিরবে।

তখনো মেমসাহেব-বউ ব্যাপারটার খুব চল হয়নি দেশে, বিশেষ করে সেই অজ মফঃস্বলে। মেমসাহেব সম্পর্কে এর কিছুদিন আগেই একটা গোলমেলে ব্যাপার ঘটে গিয়েছিলো আমাদের টাউনেই।

চক্রবর্তীদের বাড়ির বড়ছেলে, শহরের মধ্যে ডাকনামে তাঁর পরিচয় ছিলো বোঁচা ডাক্তার। তিনি ডাক্তারি পাস করে বাজারের পাশে একটা ফার্মেসিতে এসে বসেন এবং বালোই প্র্যাকটিস করছিলেন। এই সময় যুদ্ধ নাম লিখিয়ে তিনি আর্মির ডাক্তার হয়ে চলে যান। তারপর যুদ্ধ শেষ হলে নামের পাশে অবসরপ্রাপ্ত মেজর উপাধি অর্জন করে আবার শহরে ফিরে এলেন।

কিন্তু তিনি একা এলেন না। সঙ্গে নিয়ে এলেন বিবাহিতা স্ত্রী, এক ইঙ্গ-ভারতীয় মেমসাহেব। যুদ্ধের সময় একই হাসপাতালে মহিলা নাকি নার্স ছিলেন, সেখানেই কাজ করতে করতে আলাপ, পরিচয়, প্রণয় ও পরিণয়।

বাড়ির লোক এসব কথা আগে জানাতে পারে নি। সবাই মেমবউ দেখে হতচকিত হয়ে পড়লো। কৌতূহল, উৎকণ্ঠা সব কিছু মিলিয়ে ঐ মফঃস্বলের শহরে সেই মেমকে নিয়ে হাটে-বাজারে, পুকুরঘাটে, বার লাইব্রেরিতে হঠাৎ নানাবিধ গুঞ্জন শুরু হলো।

কিন্তু মেম যখন লালপাড় শাড়ি পরতে আরম্ভ করলো, তারপর অল্প অল্প করে পান-দোকতা খেতে শুরু করলো, অবশেষে একদিন পুকুরের ঘাটে রীতিমত ডুব দিয়ে স্নান করলো, এমন কি বোঁচা ডাক্তারের গরু পর্যন্ত মেম নিজেই দুইতে লাগলো—সকলেই স্বীকার করলো যে, বোঁচা ডাক্তারের স্ত্রীভাগ্য ভালো। মেম সন্ধ্যাবেলা ঘোমটা টেনে সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে শাশুড়ির সঙ্গে এরপর যেদিন কালীবাড়িতে প্রণাম করতে গেলো, সেদিন অতি বড় নিন্দুকেরাও স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু এর পরেই ঘটলো ভয়াবহ মারাত্মক এক ঘটনা এবং সেই সঙ্গে যবনিকাপতন। কী যে সঠিক হয়েছিলো কেউ ভালো করে জানে না, বোঁচা ডাক্তার এবং তাঁর বাড়ির লোকেরাও কখনো কাউকে বলেনি। একদিন শেষরাত্রে বোঁচা ডাক্তারের বাড়ির দিক থেকে প্রচণ্ড হইচই, চিৎকার, চেঁচামেচি শোনা গেলো। বামাকণ্ঠে ইংরেজি গালাগাল রাস্কেল, স্টুপিড, বাস্টার্ড, বিচ, সান অফ এ বিচ...বাইরের উঠোনে দাঁড়িয়ে মেম তার ভাষায় অকল্পনীয় অকথ্য শব্দগুলি চেঁচিয়ে বলে আর থুথু

ফেলে। ডাক্তার-বাড়ির উঠোনটা থুথুতে ভিজিয়ে হাতে হান্টার কাঁধে সুটকেস, ব্রীচেস জাতীয় প্যান্ট পরা রণরঙ্গিনী মূর্তিতে মহিলা পতিগৃহ থেকে বেরিয়ে গট গট করে বাজারের রাস্তায় গিয়ে একটা টমটম গাড়ি ভাড়া করে স্টিমারঘাটের দিকে চলে গেলো। পড়ে রইলো তার শাঁখাসিঁদুর, লালপাড় শাড়ি, পান-দোকতা। সে আর ফেরেনি।

পুরো শহরটা থমকে গিয়েছিলো সেদিন। ঐ ছোট শহরের ইতিহাসে অনুরূপ উত্তেজনাময় প্রভাতকাল এর আগে আর কখনো আসেনি।

সুতরাং রাঙামামা বিলেত থেকে যদি মেম বউ নিয়ে আসে, তবে কী হবে এই আশঙ্কা স্বভাবতই ছিলো। সবাই বলাবলি করতো, যুদ্ধে সব সাহেব তো মরে ভূত হয়ে গিয়েছে, মেমসাহেবেরা বর পাবে কোথায় তারা কি সুপাত্র পেলে ছেড়ে দেবে, ঝুলে পড়বে না!

কিন্তু যে কারণেই হোক মেমসাহেবেরা রাঙামামাকে রেহাই দিয়েছিলো। তাঁর ঘাড়ে ঝুলে পড়েনি। রাঙামামা বিলেত থেকে একাই ফিরেছিলেন। মেম জুটিয়ে আনেননি। ফলে নিঃসঙ্গ রাঙামামা ফিরে আসায় হিতৈষীরা বেশ একটু স্বস্তিই পেলেন।

বিলেত থেকে মেম আনেননি বটে, তবে একটা খারাপ অভ্যেস সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। সেটা নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার, বাথরুম সংক্রান্ত।

ব্যাপারটা সত্যি গোলমেলে। সাত বছরে রাঙামামার অভ্যেস সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিলো। তাঁদের নিজেদের বাড়িতে বাথরুম ইত্যাদির যা বন্দোবস্ত ছিলো তা প্রাগৈতিহাসিক, কোনো রকমে আবরু রক্ষা।

ফিরে এসে এই দিশি ব্যবস্থায় রাঙামামার খুবই অসুবিধে হচ্ছিলো। খবরটা তাঁর দিদি অর্থাৎ আমাদের সোনাকাকিমার কানে ওঠে দু'-একদিনের মধ্যেই।

আমাদের বাড়িতে আমাদের ঠাকুর্দার ঘরের সঙ্গে লাগানো একটু চলনসই গোছের বাথরুম ছিলো, সেটায় আমাদের প্রবেশাধিকার ছিলো না। শুধু ঠাকুর্দা ব্যবহার করতেন সেটা, আর যদি কখনো কোনো অভিজাত অভ্যাগত থাকতেন, তাঁকে ঐ বাথরুমটা ব্যবহার করতে দেওয়া হতো।

ঐ বাথরুমে অবশ্য জলের কল ছিলো না। শুধু ঐ বাথরুমে কেন, আশেপাশে পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে কোথাও জলের কল ছিলো না। সিমেন্ট বাঁধানো টব ছিলো বাথরুমের একপাশে, ইঁদারা থেকে বালতি বালতি জল তুলে সেটা কাজের লোকের ভরে রাখতো।

সোনাকাকিমা ঠাকুর্দাকে বলে তাঁর বিলেত-ফেরত ভাইয়ের জন্যে বাথরুমটার বন্দোবস্ত করলেন।

প্রতিদিন সকালবেলা খেয়া নদী পার হয়ে ছাতা মাথায় দিয়ে রাঙামামা দেড় মাইল হেঁটে আমাদের গাঁয়ে স্নান-প্রাতঃকৃত্যাদি করতে আসতেন। তখনো কাঁধের ঝোলা ব্যাগ চালু হয়নি, একটা বিলিতি পোর্টফোলিয়ো ব্যাগে তোয়ালে, পাজামা ইত্যাদি ভরে

সঙ্গে নিয়ে আসতেন তিনি।

ক্রমে রাস্তাঘাটে, পাড়ার লোকজন সবাই জেনে গিয়েছিলো রাঙামামার এই প্রাত্যহিক আগমনের কারণ। কোনো দিন হয়তো অন্য কাজেই রাঙামামা বিকেল বা সন্ধ্যায় আমাদের বাসায় এসেছেন। কিন্তু আমরা ধরেই নিয়েছিলাম, ইনি বাথরুমে যাবেন বলে এসেছেন। সঙ্গে সঙ্গে চেঁচামেচি শুরু হয়ে যেতো, 'এই, কে আছিস! বিশ্বম্ভর এসেছে, তাড়াতাড়ি দ্যাখ, বাথরুমে জল আছে নাকি?'

বিশ্বম্ভর বলাবাহুল্য, রাঙামামার প্রকৃত নাম। কখনো কাজের লোকের সাড়া না পেলে ঠাকুমা রাঙামামাকে চিন্তিত হবে প্রশ্ন করতেন, 'বাবা বিশ্বম্ভর, তোমার তাড়াতাড়ি নেই তো?'

ব্যাপারটা ক্রমশ অতিশয় হাস্যকর হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। রাঙামামাকে আমাদের বাড়ির দিকে আসতে দেখলেই রাস্তার লোকেরা হাসাহাসি করতো, বলতো, 'বিলেত-ফেরত কাজে যাচ্ছে।'

শুধু রাস্তার লোক কেন, আমাদের বাড়ির লোকেরা, এমন কি গুরুগম্ভীর মুহুরিবাবুরা পর্যন্ত মুখ টিপে হাসতেন। আমাদের রান্নার ঠাকুর ছিলো তেওয়ারি। সে একদিন বলেছিল, 'শালাবাবুর একদম শরম নাহি আছে।' সেকথা শুনে সোনাকাকিমার সে কি রাগ। তেওয়ারি কিন্তু কাউকে পরোয়া করতো না, বিশেষ করে সোনাকাকিমা জাতীয় নতুন বউদের, যারা মাত্র দু'-দশ বছর এ বাড়িতে এসেছে—তাদের ধর্তব্যের মধ্যে আনতো না তেওয়ারি ঠাকুর, তার তখন পঁচিশ বছর পূর্ণ হয়ে গেছে আমাদের বাসায়।

এসব যা হোক, রাঙামামার এই হাস্যকর পর্যায় খুব বেশিদিন চলেনি। সপ্তাহ তিন-চারেকের মধ্যেই তিনি ধানবাদ না আসানসোলে কোথায় যেন কয়লাখনিতে কাজ নিয়ে চলে গেলেন। তখন কয়লাখনিগুলোর অধিকাংশ ম্যানেজারই সাহেব। সেই ম্যানেজার সাহেবদের বাংলোতে আর যাই হোক, বিলিতি প্রিভিওয়ালা বাথরুম অবশ্যই ছিলো। ফুটবল, খেলার মাঠের মতো বিশাল বিশাল সেই সব বাথরুমের বর্ণনা দিয়ে রাঙামামা চাকরিতে জয়েন করে সোনাকাকিমাকে বিশদ চিঠি দিয়েছিলেন।

বাথরুমের ব্যাপারটা ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় অনেকটা গড়িয়ে গেলো।

কিন্তু এ গল্প বাথরুমের নয়। এ গল্প টমাটো সসের। এতক্ষণ শুধুই ভণিতা হলো, এবার আসলে বিষয়ে যেতে হচ্ছে।

টমাটো নামক তরকারি কিংবা ফলটি তখনো জলচল হয়নি, অন্তত আমাদের ঐ অঞ্চলে পূজোপার্বণে টমাটোর চাটনি চলতো না, ঠাকুরদালানে টমাটো ছিলো নিষিদ্ধ। লোকে কাঁচা টমাটো বিশেষ খেতো না, তরকারিতে মাছ-মাংসে টমাটো দেওয়ার রীতিও প্রচলিত হয়নি।

বাজারে সামান্যই উঠতো টমাটো, চাষও হতো কম। যেটুকু টমাটো বাজারে উঠতো, তার সমস্তটাই পাটের সাহেবরা কিনে নিয়ে যেতো। বাকি অল্প কিছু করা কিনতো কে জানে, আমরা তো কখনো কিনিনি। সত্যি কথা বলতে কি, জিনিসটাকে

আমরা টমাটো বলতাম না। আমরা বলতাম বিলিতি বেগুন। রং এবং আকারের পার্থক্য বাদ দিলে, টমাটো গাছের পাতার এবং ফুলের আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে বেগুনের সঙ্গে, তাই হয়তো এই নাম। যেভাবে একদা বিলিতি কুমড়ো কিংবা বিলিতি আমড়ার নামকরণ হয়েছিলো।

এই সামান্য আখ্যানে টমাটো সম্পর্কে এত কথা বলার প্রয়োজনই পড়তো না, যদি না রাঙামামা চাকরি নিয়ে চলে যাওয়ার আগে আমাদের আধ-বোতল টমাটো সস দিয়ে যেতেন।

যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বিলেত থেকে রাঙামামা ফেরার সময় প্রায় কিছুই কারো জন্যে আনতে পারেনি। কোনো রকমে নিজের পৈতৃক প্রাণটি নিয়ে ফিরেছিলেন। তাঁর নিজের দিদি অর্থাৎ আমাদের সোনাকাকিমাকে একটা মাফলার দিয়েছিলেন, আর আমার সাহেবি-ভাবাপন্ন ঠাকুর্দাকে দিয়েছিলেন একজোড়া জারমান সিলভারের কাঁটা-চামচ।

আমাদের সকলেরই ধারণা ছিলো যে, এই দুটো উপহারের জিনিসই পুরনো, আগে ব্যবহার করা। বিশেষ করে জারমান সিলভারের ব্যাপারটায় সবাই ধরে নিয়েছিলো, এ নিশ্চয় যুদ্ধের আগে কেনা। কারণ যুদ্ধের পরে আর জারমান সিলভার আসবে কোথা থেকে? সোনাকাকিমার আশকারাতে এসব নিয়ে যৎকিঞ্চিৎ গুজগাজ, ফিসফাস হয়েছিলো, কিন্তু সোনাকাকিমা মনে আঘাত পেতে পারে এই ভেবে তাঁর সামনে এ নিয়ে বিশেষ উচ্চবাচ্য কেউ করেনি।

যাওয়ার আগের দিন সন্ধ্যাবেলা রাঙামামা এলেন। তাঁকে দেখেই আমার ঠাকুমা যথারীতি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, 'এই বিশ্বম্ভর এসেছে, তাড়াতাড়ি বাথরুমে জল দে, আলো দে!' জনৈক পরিচারিকা নির্দেশ শুনে সঙ্গে সঙ্গে একটা লম্ফ নিয়ে বাথরুমে রাখতে গেলো।

একটু বিব্রত হয়ে রাঙামামা বললেন, 'না, বাথরুমে যাবো না। কাল তো চলে ছি নতুন কাজে, তাই একটু দেখা করতে এলাম।'

সোনাকাকিমা পাশের বাড়িতে আড্ডা দিতে গিয়েছিলেন, তাড়াতাড়ি ভাইয়ের গলা শুনে ছুটে এলেন। কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে রাঙামামা উঠবার সময় তাঁর হাতের ব্যাগ থেকে একটা আধভর্তি বোতলে—যার মধ্যে একটা লাল রঙের ঘন তরল জিনিস রয়েছে, সেই বোতলটা সোনাকাকিমাকে দিয়ে গেলেন। বললেন, 'এটা জামাইবাবুকে দিস, মাছ ভাজার সঙ্গে খাবে, খুব ভালো জিনিস। আমারটা থেকে অর্ধেক দিয়ে গেলাম।'

আমরা কাছেই এসে বসেছিলাম। রাঙামামা উঠে যাওয়ার আগেই লণ্ঠনের আলোয় আমরা বোতলটা নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিলাম, ভেতরে লঙ্কাবাটার মত ঘন লাল কি একটা জিনিস, আর বোতলটার গায়ে ইংরেজিতে কী সব লেখা, সুপক্ক দ্রাক্ষাগুচ্ছের ছবি আঁকা বোতলের গায়ে লাগানো রয়েছে। দেখলেই কেমন লোভ হয়, বোঝা যায় মহার্ঘ্য সুস্বাদু পানীয়।

আসলে একটা খালি বিলিতি ব্র্যান্ডির বোতলে কৃপণ রাঙামামা নিজের টমাটো সসের বোতল থেকে কিছুটা উপহার দিয়েছিলেন।

টমাটো সস সম্পর্কে আমাদের তখন কোনো রকম ধারণাই ছিলো না। আমরা শিশুরা কেন, বড়রাও ধরতে পারলো না জিনিসটা কী?

সন্ধ্যার পরে বাজারের চায়ের স্টল থেকে আড্ডা দিয়ে সোনাকাকা ফিরলেন, বোতলটাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, তারপর লেবেলটা পড়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়লেন, বললেন, 'শালা তো খাঁটি বিলিতি জিনিস দিয়ে গেছে। যাই জিনিসটা দাদাকে দেখিয়ে আনি।'

তখনো পর্যন্ত মদ জিনিসটা আমাদের বাড়িতে প্রবেশাধিকার পায়নি। মদ ব্যাপারটা খুব চালু ছিলো না। শহরে সিনেমা হলের সামনে প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা চক্রবর্তী বাড়ির বোঁচা ডাক্তারের এক কাকা শূন্য বোতল হাতে লাফালাফি দাপাদাপি করে খুব মাতলামি করতেন। এতদিন পরে মনে হয়, ব্যাপারটা সম্পূর্ণ মদমত্ততা ছিলো না, ওর মধ্যে অনেকটা অভিনয় ছিলো।

এছাড়া আগের বছর লক্ষ্মীপূর্ণিমার রাতে দুজন পাটের সাহেব মাতাল অবস্থায় পাটগুদামের মাঠে মল্লযুদ্ধ করেছিলো। শহরসুদ্ধ লোক পরিষ্কার ঝকঝকে জ্যোৎস্নার আলোয় সে লড়াই উপভোগ করেছে।

আমার বাবাকে বোতলটা নিয়ে সোনাকাকা দেখালেন আদালত থেকে ফিরে একটু বেড়িয়ে এসে তখন বাবা বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়ে বিশ্রাম করেছিলেন। বোতলটা দেখে বাবা খুশিই হলেন, হ্যারিকেনের ফিতেটা একটু উসকিয়ে দিয়ে ভালো করে বোতলটা দেখলেন, তারপর বললেন, 'কলকাতাব হার্ডিঞ্জ হোস্টেলে আমার পাশের ঘরে রংপুরের একটা ছেলে, কী রায়চৌধুরী যেন নাম ছিলো, সে প্রত্যেকদিন সন্ধ্যাবেলা সোডা আর বরফ কিনে এনে সেগুলো মিশিয়ে এই সব জিনিস খেতো। আমাকে বেশ কয়েকবার খাওয়ার জন্যে সেধেছে। সাহস পাইনি। এর পরে বোতলটা খুব যত্ন নিয়ে দেখে বললেন, 'তবে রায়চৌধুরী যে জিনিসটা খেতো, সেটা লাল ছিলো না আর এত ঘনও ছিলো না।'

সেনাকাকা বললেন, 'তোমার বন্ধু সস্তার জিনিস খেতো, তাই অত হাল্কা। এটা হলো আসল জিনিস, সলিড অ্যালকোহল। বিশ্বম্ভর সোজা বিলেত থেকে নিয়ে এসেছে, কম কথা নাকি!'

বিশ্বম্ভরের কথা শুনে বাবা একটু উদাস হলেন, বললেন, 'বিশ্বম্ভর এই সব অভ্যেস করেছে? বিলেত গেলে লোকের এই একটা ক্ষতি হয়!'

এমন সময় কাছারিঘর থেকে দুজন মক্কেলকে সঙ্গে করে কিছু নথিপত্র নিয়ে আমাদের নতুন মুহুরিবাবু বারান্দায় বাবার কাছে এলেন। বাবা সাধারণত সন্ধ্যার পরে কাছারিঘরে বসেন না। দু'-চারজন মক্কেল এলে বা জরুরী কোনো ব্যাপার থাকলে বাইরের বারান্দায় ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়েই সেটা করেন।

আমাদের এই নতুন মুহুরিবাবু সেকালের তুলনায় বেশ স্মার্ট। হাইকোর্টে

মক্কেলদের মামলার তদ্বির-তদারক থাকলে তিনিই সেরেস্তার তরফ থেকে কলকাতায় যান। কলকাতায় গিয়ে তিনি এদিক-সেদিক যাতায়াত করেন, মক্কেলের পয়সায় এটা-সেটা চাখেন। এসব খবরও মক্কেলদের মারফতই বাবার কানে আসে। বাবা অবশ্য কিছু বলেন না। এই তো কয়েকমাস আগে চৌরঙ্গীর একটা মদ খাওয়ার দোকান থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় একটা গোরা মাতাল নতুন মুহুরিবাবু অর্থাৎ রামকমলবাবুকে হঠাৎ পেছন থেকে লাথি মেরে ফেলে দেয়। ফলে রামকলমবাবুর সামনের একটা দাঁত ভেঙে যায়। তা নিয়েও প্রকাশ্যে তাঁকে কেউ কিছু বলেনি, সব কথাই যদিও কানে এসেছে।

আজ কিন্তু রামকমলবাবুর আসবীয় অভিজ্ঞতার সাহায্য চাইলেন বাবা। মক্কেলদের ব্যাপারটা মিটে গেলে তারা চলে গেলো, রামকমলবাবুও কাগজপত্র গুছিয়ে উঠছিলেন, বাবা ইজিচেয়ারের ওপাশে মেঝে থেকে তুলে বোতলটা রামকমলবাবুর হাতে দিয়ে বললেন, 'রামকমল, দ্যাখো তো এটা কি জিনিস? কী রকম জিনিস?'

রামকমলবাবু সন্তর্পণে বোতলটা একটু কাত করে এক ফোঁটা তর্জনীতে ছুঁইয়ে সেটা বাঁ হাতের কব্জির উপরে খুব ঘষলেন এবং যেভাবে লোকে বাজারে ঘি কেনার সময় ঘিয়ের খাঁটিত্ব শুঁকে শুঁকে যাচাই করে, তিনি ঠিক সেই রকম ভাবে ঘন ঘন শুঁকতে লাগলেন। তারপর বোতলটা হাতে নিয়ে ঘুরিযে ফিরিয়ে দেখে খুব গম্ভীর হয়ে রামকমলবাবু বললেন, 'এ তো একেবারে খাঁটি। খুব দামী। বিলিতি মদ। পাকা আঙুর জমিয়ে তৈরি।'

লোভাতুর দৃষ্টিতে বেশ কিছুক্ষণ বোতলটার দিকে তাকিয়ে থেকে তারপর সেটা বাবার হাতে দিয়ে কেমন একটু দুঃখিতভাবে রামকমলবাবু কাছারিঘরে ফিরে গেলেন। তাঁর জানা ছিলো যে, মদ ব্যাপারটা আমাদের বাড়িতে চলে না। তিনি বোধহয় আশা করেছিলেন যে, এই দুর্লভ সাহেবভোগ্য পানীয় তাঁরই প্রাপ্য হবে।

বাবা কিন্তু ইতিমধ্যে মনে মনে অন্য মতলব এঁটেছেন। তিনি তাঁর কনিষ্ঠ দুই [illegible]া, আমাদের সোনাকাকা এবং ছোটকাকাকে ডেকে পাঠালেন। বিনা ভনিতায় [illegible] বললেন, 'বিশ্বম্ভর এত ভালো জিনিসটা দিয়ে গেছে, সেটা নষ্ট করা উচিত হবে না।

ছোটকাকা কিছুক্ষণ আগেই বাড়ির মধ্যে এসে জিনিসটার কথা জানতে পেরেছেন। তাঁর তখন বয়স চব্বিশ-পঁচিশ, সব বিষয়েই যথেষ্ট উৎসাহ, রীতিমত আধুনিক। তি[illegible] সোৎসাহে তাল দিলেন, 'সব জিনিসই টেস্ট করে দেখা উচিত, আর একদিন [illegible]খেলে তো নেশা হবে না!'

সোনাকাকা বাবাকে বললেন, 'বিশ্বম্ভর বলেছে তোমার বউমাকে মাছ[illegible]জার সঙ্গে খেতে।'

বাবা বললেন, 'আজ তো বাজার থেকে অনেক চাঁদা মাছ[illegible] এনেছিলাম। তার কয়েকটা রান্নাঘর থেকে ভাজিয়ে আনতে হবে। বলবি ঝোল খা[illegible]বো না, কেউ আপত্তি করলে আমাকে বলবি।'

আপত্তি আর কে করবে? ঠাকুমা আপত্তি করবেন না, একমাত্র আমার মা আপত্তি

করতে পারেন, সেই জন্যে বাবা এই কথা বললেন, তারপর ছোটকাকাকে নির্দেশ দিলেন, তুই নদীর ধারে পাটের গুদামের সাহেববাংলোয় গিয়ে বাবুর্চিকে একটা টাকা দিয়ে কিছু বরফ নিয়ে আয়। ওদের বরফের মেসিন আছে। আর ফেরার পথে লুকিয়ে সিনেমা হলের সামনে থেকে কয়েক বোতল সোডা নিয়ে আসবি। কেউ দেখতে পেলে বলবি, হজমের গোলমাল হয়েছে দাদার, ডাক্তার খেতে বলেছে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বাবা বললেন, 'কোনো তাড়াতাড়ি করিস নে।' বাবা সাড়ে সাতটা আটটার মধ্যে খেয়ে শুয়ে পড়বেন, তারপরে আমরা বসবো।'

সেদিন ঠাকুর্দা সাড়ে সাতটার মধ্যে শুয়ে পড়েছিলেন। তার আগে ছোটকাকা বাজার থেকে ফিরে এসেছিলেন, বরফ সংগ্রহ করতে পারেননি। সাহেবদের কী পার্টি আছে, সব বরফ লাগবে, বাবুর্চি দিতে সাহস পায়নি। তবে চার বোতল সোডা এনেছেন।

রাত আটটা নাগাদ বাইরের বারান্দায় লণ্ঠনের ফিতে খুব কমিয়ে শীতলপাটিতে আসর বসলো। সারা বাড়িতে একটা চাপা উত্তেজনা। সেই আমাদের পরিবারে প্রথম মদের আসর। বাবা নিজেই উদ্যোগ করে এনেছেন, তাই কেউ কিছু বলতে পারছে না।

আমরা ভেতরের একটা ঘরে বসে জানলা দিয়ে এসব দেখছিলাম। একবার ঠাকুমা এসে উঁকি দিয়ে দেখে গেলেন, তাঁর সোনার টুকরো তিন ছেলে একত্রে মদ খেতে বসেছে। সবচেয়ে দুঃসাহস সোনাকাকিমার, এর মধ্যে আলগোছে এসে একথালা মাছ ভাজা দিয়ে গেলেন।

ছোটকাকা তিনটে গেলাসে অল্প অল্প করে জমাট রঙিন পানীয় ঢেলে তার সঙ্গে এক বোতল সোডা সমানভাবে মেশালেন। বাবা বোধহয় ক্রমশ একটু ভয় পাচ্ছিলেন, সম্ভবত ভাবছিলেন যে, একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে, তিনি বললেন, 'দেখিস আমাকে যেন বেশি দিস না!'

চল্লিশ বছর আগের গহন মফঃস্বলের রাত আটটা। বোধহয় ফাল্গুন মাস সেটা। কাঠচাঁপা ফুল আর সজনে ফুলের মেলানো-মেশানো গন্ধের মদিরতা বাতাসে। দূরে মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তা দিয়ে দু'-একটা লণ্ঠন দুলতে দুলতে চলে যাচ্ছে। বাড়ির হ্যামনে পুকুরের জলে আর জলের উপরে জোনাকির আলো আর জোনাকির ছায়া এগোকার হয়ে গেছে। একটা লোক পুকুরের ওপারে চাতালের ওপরে দাঁড়িয়ে বোঁ

বিশ্বের একটা বাঁশের লাঠি ঘোরাচ্ছে, তার মানে বাজার বন্ধ হয়েছে, রাধু পাগলা করেছে? কে ফিরেছে। আবছা আলোয় তাকে দেখা যাচ্ছে। ক্লান্ত হয়ে শুয়ে না পড়া

এমন সময় একা লাঠি ঘুরিয়ে যাবে, এটা তার দিনের শেষ কাজ।

আমাদের নতুন মুশেয়াল ডাকছিলো, এ খন আর ঘণ্টা তিনেক ডাকবে না। এখন শুধু কাছারিঘরে বসেন । দূরে ইটখোলার এদিকটায় একটা তক্ষক সারা সন্ধ্যা ডাকছিলো, বাইরের বারান্দায় ঈঁ না।

আমাদের এঁর্তে মাত্র দেড় গেলাসের মাথায় ছোটকাকা মাতাল হয়ে গেলেন।

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে পুকুরের ওপারে রাধু পাগলার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, 'আজ রাধুকে আমি ঠাণ্ডা করবো, ওর অত্যাচার আর সহ্য হচ্ছে না!'

বাবা এবং সোনাকাকা বাধা দিলেন, 'রাধু তো প্রত্যেকদিনই এ রকম করে। তোর কী? মাতলামি করিস না। চুপ করে বোস।'

ঠাকুমা অল্প দূরে অন্ধকারে ঘরের মধ্যে বসে তাঁর ছেলেদের অধঃপতনের দৃশ্য অভিনিবেশ সহকারে অবলোকন করছিলেন। মাতলামি শব্দটা শুনে কিংবা ছোটকাকার এই মারমূর্তি দেখে তিনি ডুকরে কেঁদে উঠলেন, 'ওরে বিশ্বম্ভর, তুই আমার এত বড় সর্বনাশ করে গেলি! ছাব্বিশ দিন বাথরুম ব্যবহার করার এই তোর প্রতিদান!'

ঠাকুমার এই আর্ত চিৎকারে চারদিকে শোরগোল পড়ে গেলো। লম্ফ, হ্যারিকেন হাতে আশেপাশের বাড়ি থেকে পাড়া-প্রতিবেশী ছুটে এলো। এমন কি পুকুরের ওপার থেকে লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে রাধু পাগলাও 'আজ তোর একদিন কি আমার একদিন' বলতে বলতে দৌড়ে এলো।

হই-হট্টগোলে ঠাকুর্দা আচমকা কাঁচা ঘুম ভেঙে উঠে ভাবলেন যে, বুনো শুয়োর কিংবা পাগল শেয়াল বাড়িতে ঢুকেছে। তিনি বার বার চেঁচাতে লাগলেন, 'ওটার মুখে টর্চ ফোকাস কর, তা হলেই পালিয়ে যাবে!'

সেদিন সেই পারিবারিক কেলেঙ্কারির তুঙ্গ মুহূর্তে দুজন মাত্র ঠাণ্ডা মাথায় পরিচয় দিয়েছিলেন। একজন আমার মা, তিনি কেউ কিছু দেখবার বা বুঝবার আগে নিষিদ্ধ বোতলটি বারান্দা থেকে সরিয়ে ফেলেছিলেন। আর দ্বিতীয় জন আমার সোনাকাকিমা, তিনি তেওয়ারি ঠাকুরকে চার আনা পয়সা বখশিশ দিয়ে রাঙামামাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

পাড়ার সবাই সন্দেহজনক মুখ করে কিছুক্ষণ পরে চলে গেলো। মা আসল বোতলটা লুকিয়েছিলেন, কিন্তু সোডার বোতল আর গেলাসগুলো তখনো শীতলপাটির ওপরে ছিলো। তা ছাড়া ঠাকুমা যে হঠাৎ বাতের ব্যথায় ওরকম ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠেছিলেন, সেকথা কেউ বিশ্বাস করেনি।

সমস্ত লোকজন চলে যাওয়ার পরে রাঙামামা এলেন। সব শুনে তিনি তো স্তম্ভিত। তিনি যত ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন যে, তাঁর মনে কোনো রকম কুমতলব ছিলো না, ঠাকুমা ডুকরে ডুকরে কেঁদে ওঠেন, 'বিশ্বম্ভর, শেষ পর্যন্ত এই তোমার মনে ছিলো!'

পরের দিন সকাল সাতটায় স্টিমার, বাড়ি থেকে রাঙামামাকে অন্তত পাঁচটা সাড়ে পাঁচটায় বেরোতে হবে ঘোড়ারগাড়িতে স্টিমারঘাটে পৌঁছানোর জন্যে। নতুন কাজে যাবেন, জিনিসপত্র কিছু গোছানো হয়নি তখনো। কিন্তু সেদিন রাঙামামা রাত বারোটার আগে আমাদের বাসা থেকে পরিত্রাণ পেলেন না।

টমাটো সস জিনিসটা কী? মদের সঙ্গে তার তফাত কী? এসব দুরূহ প্রশ্নের উত্তর, সেই সঙ্গে টমাটো সসের ব্যবহার কী, এটা সে সোডা দিয়ে খেতে নেই, এটা যে কাসুন্দির মত ভাজা জাতীয় খাবারের সঙ্গে মাখিয়ে খেতে হয়—সব কথা রাঙামামা গুছিয়ে বললেন। তিনি একথাও বললেন যে, ঐ ব্র্যান্ডির খালি বোতলটা টমাটো সস

ভাগ করে দেওয়ার জন্যে আজ সকালেই সাহেবদের বাবুর্চির কাছ থেকে নগদ এক আনা দিয়ে কিনেছেন। তিনি নিজে ব্র্যান্ডি-ট্যান্ডি কিছুই খান না, বোতল্ পাবেন কোথায়! রাঙামামার কথা কে কী বুঝলো, কে জানে? পরদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে মা প্রথমেই বোতলটা উপুড় করে যা কিছু অবশিষ্ট ছিলো রান্নাঘরের সিঁড়ির পাশে ফেলে দিলেন। ঐ সিঁড়ির পাশে আমরা প্রতিদিন ভাত খেয়ে মুখ ধুয়ে আঁচাতাম।

সেই রান্নাঘরের পাশে আঁচানোর জায়গায় কিছুদিন পরে একটা চনমনে পেঁপেগাছ একা একাই জন্মালো। সেই গাছে কী চমৎকার বড বড় পেঁপে হলো, সংখ্যায় রাশি রাশি। সেগুলো গাছেই পাকলো, গাছেই পাখিরা ঠুকরিয়ে খেতে নিলো, আমাদের ঠাকুমা কোনোদিন বাড়ির কাউকে ঐ মদ্যপ গাছেব একটি পেঁপেও খেতে দেননি। কিছুদিন পরে লোক দিযে কাটিযে ফেলে দি'লেন গাছটা।